মধ্যরাতের আতঙ্ক

অনীশ দাস অপু



হরর কাহিনি

হরর কাহিনি

মধ্যরাতের আতঙ্ক

অনীশ দাস অপু

মারিয়া এবং দীপ যখন ওদের জীবনের দুঃস্বপ্নকে হার মানানো কাহিনিটি বলছিল, বারবারই ভয় আর আতঙ্কে শিউরে উঠছিল। যখন বললাম ওদের এ বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি *মধ্যরাতের আতঙ্ক* নামে একটি উপন্যাস লিখব, দু'জনেই মানা করেছিল। বলেছিল ওদের এ গল্প নাকি কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি করেছি। কারণ আমি ভূত-প্রেত-ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করি বলেই এসব নিয়ে লেখালেখি করি। আমার গল্প আমি বললাম। এখন বিশ্বাস করা না করা আপনাদের অভিরুচি!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

হরর কাহিনি

মধ্যরাতের আতঙ্ক

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0275-X

সূচি

ভূমিকা

এ বইটির ভূমিকা লেখার প্রয়োজন কারণ টাইটেল কাহিনিতে যে শহরটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা কোনও কল্পিত শহর নয়। পাদ্রিশিবপুর সম্পর্কে আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার অগ্রজ ভ্রাতা সাংবাদিক ও চিত্রনাট্যকার বরুণ শংকর যাঁর শৈশব কেটেছে ওই শহরে। তখন অবশ্য পাদ্রিশিবপুর শহর ছিল না, ছিল গ্রাম। বর্তমানের পাদ্রিশিবপুর সম্পর্কে আমি বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি আমার কলেজ জীবনের জানি দোস্ত বরিশাল করিম কুটিরের অ্যাডভোকেট কবিরউদ্দিন আহমেদ খান ফয়সালের কাছ থেকে যে নাকি ওই শহরটিকে তার হাতের তালুর মতই চেনে! তবে গল্পের প্রয়োজনে শহরটির দুই একটি রাস্তাঘাটের বর্ণনায় আমি খানিকটা কল্পনার স্বাধীনতা নিয়েছি বৈকি! এ ছাড়াও কিছু জায়গায় আমার কল্পনার পাখা উড়েছে কাহিনিটি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য। লেখার পরে সত্যি আমার পাদ্রিশিবপুরের ওই ভৌতিক বাড়িটিতে চলে যেতে মন চাইছিল!

মধ্যরাতের আতঙ্ক একটি পিশাচ কাহিনি তবে বাকি গল্পগুলো হরর। বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই গল্পগুলোর একেকটির স্বাদ একেকরকম।

আমি তোমাকে ভালবাসব–সবসময় পুরোপুরি ভূতের গল্প। আমার কাছে দারুণ লেগেছে। আশা করি আপনাদেরও ভাল লাগবে। *বাড়ির চোখে ঘুম নেই* একটি দুর্দান্ত হরর কাহিনি।

আমি খুব মজা পেয়েছি গল্পটি লিখে। *বিকুর* গল্পটিও চমৎকার। এর পদে পদে লুকিয়ে রয়েছে ভয় এবং রোমাঞ্চ। আর *লণ্ড্রি মেশিন* বিশ্বখ্যাত হরর লেখক স্টিফেন কিং-এর একটি গা ছমছমে হরর গল্পের অনুবাদ। একটা সাধারণ লণ্ড্রি মেশিনের ওপর যখন পিশাচ ভর করে তখন সেটা যে কী ভয়ঙ্কর চেহারা ধারণ করতে পারে রোমহর্ষক এ গল্পটি না পড়া পর্যন্ত বুঝবেন না।

মধ্যরাতের আতঙ্ক লিখতে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছেন টিংকু ভাই ওরফে কাজী শাহনূর হোসেন। নিঝুম মধ্যরাতে আমি মাঝে মাঝে তাঁকে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়েছি কোন্ গল্পটি লিখছি এবং পরবর্তীতে কোনও ঝিম মারা দুপুরে তিনি ফোনে আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি জেনে খুশি যে এখন থেকে আমি নিয়মিত তাঁকে প্রতি মাসে একটি করে হরর এবং অনুবাদ গ্রন্থ উপহার দেব। ২০১৬ সালের জন্য আমি মোটামুটি এক ডজন বই নির্বাচন করেও ফেলেছি যার অর্ধেক হবে হরর বাকিগুলো অনুবাদ। আর পাঠক জেনে খুশি হবেন ডেনিস হুইটলির অ্যাডভেঞ্চার নভেল *দ্য ফেবুলাস ভ্যালি*'র অনুবাদ কর্মটি অবশেষে শেষ হয়েছে। আশা করা যায় শীঘ্রি এটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব। এরপরে আপনারা পাবেন এ লেখকের বিশ্বখ্যাত হরর উপন্যাস *দ্য ডেভিল রাইডস আউট*। তারপরে হুইটলির সেরা অ্যাডভেঞ্চার এবং হরর বইগুলো আমি অনুবাদ করতে থাকব। পাশাপাশি বিশ্বখ্যাত অন্যান্য লেখকদের চমৎকার কিছু হরর এবং অনুবাদ গল্পের সংকলনও আপনাদেরকে উপহার দেয়ার ইচ্ছা রাখি। সবাই ভালো থাকুন। সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

অনীশ দাস অপু

আমি তোমাকে ভালোবাসব– সবসময়

ছেলেবেলায় বেটসভিলের মরগান প্ল্যানটেশন হাউসটিকে আমরা ভাবতাম হানাবাড়ি।

তবে ভূতের ভয় আমাকে কখনও কাবু করতে পারেনি। তাই যখন সুযোগ পেলাম, গত শরতে বাড়িটি কিনে ফেললাম।

নিউ ইয়র্ক শহর আমার আর ভাল্লাগছিল না– এর তীব্র দাবদাহ, মাথা খারাপ করে দেয়া চিৎকার চেঁচামেচি আর শব্দ এবং প্যাঁচপেঁচে গরমে প্রায় শূন্য থিয়েটারে হপ্তায় ন'টি করে শো পরিচালনা করে আমি বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

নাটকের আয়ের পাঁচ শতাংশ আমার ভাগে আসে। এ নাটক আরও বছরখানেক চলবে– সে আমি থাকি আর না-ই থাকি– কাজেই বোঁচকা নিয়ে ফিরে এলাম বেটসভিল।

রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যখন আমাকে মরগান প্ল্যানটেশনের কথা বলল তখনই বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা বড়ই সাদাসিধা। বৃক্ষ আচ্ছাদিত একটি রাস্তা দিয়ে আমরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, মাঠ ঘাট পেরিয়ে, নিদ্রিত একটি নদীর ওপরের কাঠের পুরানো সেতু পার হয়ে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে।

গাড়ি থামল। আঙুল তুলে দেখাল এজেন্ট। দীর্ঘদিন অবহেলিত পড়ে থাকা একটি ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় নিতান্তই অসুখী চেহারার প্রকাণ্ড বাড়িটি আমার দৃষ্টিগোচর হলো। বাড়ির লম্বা লম্বা জর্জিয়ান কলাম বা থামগুলো যথেচ্ছ বেড়ে ওঠা

গাছপালার আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়েছে। বৃত্তাকার ড্রাইভওয়েটি আগাছাভরা রাস্তার মাঝ দিয়ে চলে গেছে। দেখে বিশ্বাস করা মুশকিল এখানে একদা পান্না সবুজ রঙের লন ছিল, পায়ের নিচে শোভা পেত মখমল ঘাসের কার্পেট।

ম্যাগনোলিয়া গাছও রয়েছে প্রচুর– মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে, বাড়ির দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফুলভরা পাহারাদারের চেহারা নিয়ে।

আর এসবের মাঝখানে, উঁচু উঁচু ঘাস ছাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে পাথরের এক নিগ্রো, দু'হাত দু'পাশে ছড়ানো তার, যেন দর্শনার্থীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে।

'আমি এ বাড়িটা নেব,' বললাম আমি।

লম্বা, ঢালু কাঁধের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট তার টাক মাথায় খড়ের টুপিটি ঠেলে দিয়ে টেনে টেনে বলল, 'আপনি একবার বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখবেন না?'

'দরকার নেই– অ্যাপ্রেইজার বলেছে বাড়ির অবস্থা ভাল।'

সে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল। 'এ জায়গা ঠিকঠাক করতে কিন্তু কিছু খরচাপাতি হবে।'

আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে হাসলাম। শহুরে রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো ওরা যেভাবেই হোক ক্রেতার কাছে মাল গছিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে, বাড়ির ভালমন্দ দিকগুলোর কথা তারা বলেও না। কিন্তু সরল লোকটি আমার সঙ্গে কোনওরকম ফাঁকিবাজির চেষ্টা করছে না।

বাড়িটির দিকে আবার তাকালাম আমি। শেষ বিকেলের নরম রোদের রেখা পড়েছে ম্যানশনটির ওপর। সিভিল ওঅরের আগে এ বাড়িটির চেহারা কেমন ছিল কল্পনায় দেখতে পেলাম আমি– সাজানো গোছানো হলে একে হয়তো আবার আগের মতই লাগবে। 'আমি এ বাড়ি কিনব,' পুনরাবৃত্তি করলাম।

'ঠিক আছে, মিস্টার স্পেন্সার। আমি আগামী সপ্তাহে

কাগজপত্র রেডি করছি।'

দশদিন পরে বাড়িটির মালিক হয়ে গেলাম আমি। আধ ডজন লোক ভাড়া করলাম এর নানারকম সংস্কার এবং বাগানটি ঠিকঠাক করার জন্য, তিন মহিলা ভেতরের কামরাগুলো পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল। পরবর্তী দুই হপ্তা ঝোপঝাড় এবং বাড়ির পঞ্চাশ বছরের ধুলো আকাশের বুকে ভারী একটি আচ্ছাদন হয়ে ঝুলে রইল।

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য নিউ ইয়র্ক থেকে উড়ে এল পিয়েরে স্যাভর। ছোটখাট ফরাসীটি যখন এ বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি, রিসেপশন হলের শতবর্ষী পারস্য টাইল ফ্লোর ইত্যাদি দেখল ঘনঘন টুসকি বাজাতে শুরু করল। বাড়িটির দশখানা শয্যাকক্ষ, ৩৫ বাই ৩৫ ফুট আয়তনের ভোজন কক্ষ এবং নিউ ইয়র্কে আমার পেন্টহাউস সমান পাঠকক্ষ সাজাতে ভয়ানক ব্যস্ত থাকতে হলো পিয়েরেকে। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকবারই নানান জিনিস কিনতে দোকানে গেল ও।

এসব যখন চলছে, এমন একদিনে আমি হাঁটাহাঁটি করছি বাইরের জমিনে, আমার প্রথম দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখি আমার বাড়ির পুকুর পাড়ে বসে দুটি বাচ্চা ছেলে ভীতচকিত ভঙ্গিতে মাছ ধরছে।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদেরকে আমি হাই বলেছি, ওরা বঁড়শি ফেলে দে ছুট। আমি কত ডাকাডাকি করলাম কিন্তু ওরা আর ফিরলই না। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম ওদের যখন খুশি এখানে এসে মৎস্য অভিযান চালাতে পারে।

ওখানে আরেক লোক ছিল, এক সাংবাদিক, নাম টড জনসন। এ সারাক্ষণ মদ নিয়ে আছে। কৈশোরে আমি *বেটসভিল বিকন* পত্রিকার ডেলিভারি বয় ছিলাম। সে এ পত্রিকায় কাজ করে। মহল্লার ছেলে মরগান ম্যানশন কিনেছে, এরকম একটি

শিরোনাম দিয়ে সে আমাকে নিয়ে একটি আর্টিকেল লিখতে চাইছিল।

সামনের বারান্দায় বসে, তিন গ্লাস মদ পেটে যাওয়ার পরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল টড জনসন। আমি যাদেরকে প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম তাদেরকে নিয়ে শুরু করল গল্প।

জো ডর যুদ্ধে মারা গেছে শুনে আমি মর্মাহত হওয়ার ভান করলাম– যদিও এ লোক কিংবা তার নাম কোনওটিই আমার স্মরণে আসছিল না।

'তারপর ধরো গে ভারননের কথা– ভারনন মুর যার সঙ্গে তুমি স্কুলে যেতে। সে মন্টোগোমারি কাউন্টিতে টাকার লোভে এক বিধবাকে বিয়ে করে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যায়। ওখানে এখন একটি মোটেল চালাচ্ছে!' সে বকবক করেই যেতে লাগল, শুধু বিরতি দিল জানতে সে আরেকটি ড্রিংক খেতে চাইলে আমি কিছু মনে করব কি না।

টড জনসনের কচকচানি আমার আর ভাল্লাগছিল না। যখন মরগান প্ল্যানটেশন নিয়ে গপ্পো ফেঁদে বসল, ভাবছিলাম কোন্ ছুতোয় ওকে বিদায় করা যায়।

'তুমি ওকে দেখনি, দেখেছ কি?' চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকাল টড। বলিরেখা ভরা মুখে প্রত্যাশা।

'কে?' আমি একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলাম।

'স্যালি– স্যালি মরগান! মনে নেই– ও তো এখানকার ভূত।'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না...।'

'আরি, ঠিকই মনে আছে তোমার,' উদাস গলায় বলল সে। 'ও গৃহযুদ্ধের সময় জনি মরগানকে বিয়ে করেছিল। ও ভালবাসত জনিকে। অবশ্য জনির আরও অনেক কাজিন এবং তার বেশিরভাগ বন্ধুকেই ভালবাসত স্যালি। এমনকী কয়েকটা নিগারের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল ওর। ওরা বলে ওর স্বামী নাকি

জানত না কী ঘটছে। পরে– জনি যখন যুদ্ধ করতে দূরের শহরে চলে যায় এবং ইউনিয়ন সোলজাররা এখানে আসে– স্যালি ইয়াংকি অফিসারদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রায় গোটা ইউনিয়ন আর্মিই তার মধু পান করেছে।' খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসতে গিয়ে শ্বাসনালীতে মদ ঢুকে বিষম খেল টড।

কিছুক্ষণ খকরখকর কেশে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিল সে। 'সে যাকগে, জনির কানে যখন এসব যায় ওইসময় সে উত্তরের হাসপাতালে শয্যাশায়ী। সে ওখান থেকে পালায়, ২৫০ মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি পৌঁছায় এবং স্যালিকে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে গুলি করে। স্যালি গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়।' টড হাত নেড়ে নেড়ে দেখাল কীভাবে স্যালি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। 'সিঁড়ির নিচে এসে চিৎ হয়ে পড়ে যায় ও এবং অভিশাপ দেয় জনিকে। বলে জনি ইহজীবনে আর কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারবে না। তারপর সে মারা যায় এবং ওরা তাকে ওইদিনই কবর দেয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল টড। ঢক ঢক করে মদ গিলছে, কণ্ঠমণিটা ওঠানামা করছে। গ্লাস শেষ করল সে। 'তবে বুড়ো জনি ওসবে মোটেই পাত্তা দেয়নি এবং যুদ্ধের পরে সে বিয়ে করে। হানিমুন শেষে তারা এ বাড়িতে ফিরে আসে। নতুন মনিবনীকে স্বাগত জানাতে ভৃত্যের দল দাঁড়িয়ে ছিল সার বেঁধে। জনি এবং তার বধূ বেডরুমের দিকে পা বাড়িয়েছে, সিঁড়ির মাথায় হাজির হয়ে যায় স্যালি। তাকে দেখে নতুন বউ ভয়ে চিৎকার করে ওঠে এবং সে ও ভৃত্যের দল তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত বাড়ি থেকে ছুটে পালায়। জনি তো একদম হতভম্ব এবং বিবশ– সে নিজের হাতে স্যালিকে কবর দিয়েছে– জানে স্যালি মৃত। জনি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, নড়াচড়া করতে পারছিল না। স্যালি, পরনে পাতলা নাইট গাউন, সিঁড়ি

বেয়ে নেমে এসে তার স্বামীকে আলিঙ্গন করে। জনির বাটলার বব রয় বুকে সাহস এনে বাড়ি ফিরে এসেছিল কী ঘটছে দেখতে। সে বলেছে তার প্রভু নাকি ভূতটাকে বহুবার চলে যেতে বলেছে কিন্তু সে যায়নি। অবশেষে দু'জনে মিলে ওপরতলায় তাদের বেডরুমে চলে যায়। ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে জনি যখন নিচে নেমে আসে ততক্ষণে সে পরিণত হয়েছে বদ্ধ উন্মাদে– কয়েক মুহূর্ত পরে আস্তাবলে ঢুকে সে আত্মহত্যা করে। গুলির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরে চাকরবাকররা শুনতে পাচ্ছিল হাসছে স্যালি। তারপর থেকে সে কুড়ি জনেরও বেশি পুরুষকে শয্যাসঙ্গী করেছে, এদের মধ্যে একজন ধর্মযাজকও ছিল। সে এখানে এসেছিল তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।'

আমরা দু'জনেই কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। এবারে সব কথা মনে পড়ে গেছে। তখন অবশ্য ছোট ছিলাম বলেই হয়তো স্যালির নষ্টামির কেচ্ছাকাহিনি আমার কানে আসেনি। নিউ ইয়র্কে আমার বন্ধুরা এ গল্পটি খুব পছন্দ করবে, ভাবলাম আমি। এক হানাবাড়িতে এক কামুকী প্রেতিনী।

টড আমাকে লক্ষ করছিল। আমার চেহারায় অবিশ্বাস এবং মুখে মুচকি হাসি দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমিও এ গল্প বিশ্বাস করতাম না যদি না সেই ঘটনাগুলো ঘটত।'

'বলতে থাকো,' মজা করে বললাম আমি।

সে আঙুলের কড় গুনতে লাগল। 'এক– স্যালিকে তারপর থেকে বেশ কয়েকবারই দেখা গেছে, অতি সম্প্রতি দেখা মিলেছে বছরখানেক আগে; দুই– গত কুড়ি বছরে তুমি হলে পঞ্চম ব্যক্তি যে এই বাড়িটি কিনলে; তিন– এর আগের মালিকদের সবাই বলেছে এটি একটি ভুতুড়ে বাড়ি, একজন ছাড়া। সে কিছু বলেনি– সে আত্মহত্যা করেছিল!'

টড চলে যাওয়ার পরে স্কচের খালি বোতলটির দিকে ভুরু

কুঁচকে তাকালাম আমি। বুঝতে পারছিলাম সাংবাদিকটা কেন ভূতে বিশ্বাস করে।

মাসের শেষে প্ল্যানটেশন খানিকটা এস্টেটে রূপ নিতে লাগল। পিয়েরে নিউ ইয়র্ক থেকে হাজির হলো ফ্যাব্রিক স্যাম্পল নিয়ে, চেকে সাইন করার জন্য এবং তার সঙ্গী হলো আধ ডজন লোক যারা 'ড্যান স্পেন্সারের নির্বুদ্ধিতা'র গল্প শুনেছে।

সেই রাতে ওদেরকে আমি হোটেলের ডাইনিংরুমে আপ্যায়ন করলাম, কফি খেতে খেতে বললাম স্যালির গল্প। সবাই গল্প শুনে খুশি। জানি আগামী সপ্তাহে এ গল্প নিয়ে নিউ ইয়র্কের পার্টিগুলোয় অনেক হাসাহাসি চলবে। আর্ল উইলসন এবং উইঞ্চেলের কলামেও যে এ গপ্পো স্থান পাবে তা আর বিচিত্র কী!

গৃহসজ্জার কাজ চমৎকার এগোচ্ছিল এবং সপ্তাহখানেক পরেই ওই বাড়িতে উঠে গেলাম আমি।

নতুন বাড়িতে প্রথম রাতে স্টাডিরুমে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আমার এজেন্টের পাঠানো একটি নাটকের পাণ্ডুলিপিতে চোখ বুলাচ্ছিলাম। সন্তুষ্টি এবং শান্তি ঘিরে ছিল আমাকে।

নিজেকে সুখী মনে হচ্ছিল।

বাইরে গাছের ডালে বাতাসের ফিসফিস ভেসে আসছিল, অলস জিভ বের করে অগ্নিশিখা কীভাবে লাকড়িগুলোকে চেটে দিচ্ছে দেখছিলাম মাঝে মাঝে এবং ভাবছিলাম কেন বাড়িঘর নিয়ে এত এত পদ্য লেখা হয়েছে।

জীবনে এই প্রথমবার 'বাড়ি'তে আছি আমি!

এরপরে বিছানায় গেলাম। মস্ত খাটে শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আলো চোখে পড়তে জেগে গেলাম আমি। এক মুহূর্ত সময় লাগল ঠাহর হতে কোথায় আছি। তারপর আমি তাকে দেখতে

পেলাম– এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। তার টসটসে ওষ্ঠদ্বয় ভেজাভেজা, পিঠে চুল নয় যেন স্ট্রবেরী রঙের জলপ্রপাত, ঝকঝকে সবুজ চোখ, আশ্চর্য ভরাট দুই বক্ষ সগৌরবে নিজেদের তেজ এবং যৌবন ঘোষণা করছে।

মহিলাটির পরনের নেগলিজি খুবই পাতলা। রুদ্ধশ্বাস দেহবল্লরীর মাথা নষ্ট করা প্রতিটি খাঁজভাঁজ তাতে দারুণভাবে প্রস্ফুটিত।

আমি উঠে বসলাম, নিতান্তই আহাম্মকের মত প্রশ্ন করলাম। 'কে...এখানে কী করছ?' ঠিক এভাবে বলিনি তবে হঠাৎ শুকিয়ে আসা গলা দিয়ে চিঁচিঁ করে এরকম কোনও কথাই বোধকরি বেরিয়ে এসেছিল।

মোমের আলো প্রতিফলিত ঠোঁট ফাঁক করে দারুণ আবেদনভরা খসখসে গলায় সে বলল, 'তুমি ড্যান স্পেন্সার, পরিচালক– তাই না?'

তখনই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেল। পেশীতে ঢিল পড়ল আমার, মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলাম। ব্যাপারটি এখন বুঝতে পেরেছি। যদিও প্রথম দর্শনে ভয়ের চোটে ভেবেছিলাম ওটা বুঝি স্যালি। এখন সব খাপে খাপে বসে গেছে। মেয়েটা আমার নাম জানে; সন্দেহ নেই নিউ ইয়র্কের ওই দলটাই একে পাঠিয়েছে ফাজলামি করে।

'তোমাকে কে পাঠিয়েছে, হানি,' অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম আমি, সেলোফোনের মত পোশাকটির ওপর থেকে আমার দৃষ্টি সরছেই না।

আমার প্রশ্ন শুনে যেন মেয়েটি থতমত খেয়ে গেল– সরল বিস্ময় ফুটল চোখে, আপত্তির সুরে বলল, 'কে পাঠিয়েছে মানে? আমি নিজেই এলাম।'

উচ্চারণেও কোনও খামতি নেই। হয় সে খুব ভাল কোনও

অভিনেত্রী, যদিও এতে সন্দেহ আছে কারণ একে আমি আগে কখনও দেখিনি; অথবা স্থানীয় কেউ যার স্বপ্ন পাদপ্রদীপের আলোয় আসা এবং এজন্য যোগাযোগের দ্রুততম রাস্তাটিই সে বেছে নিয়েছে।

আমি ওকে দেখতে দেখতে এসব কথাই ভাবছিলাম। ওর দেহ, রূপ, কণ্ঠ...অভিনয়ে সুযোগ পাবার জন্য একে পরিচালকের অংকশায়িনী না হলেও চলে; আমি কোনওকিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই ওর জন্য সপ্তাহের একটি দিন ব্যয় করতে রাজি!

অবশেষে আমি আবার কথা বললাম তবে তাতে আবেগের স্পর্শ থাকল না। 'তুমি ভুল করছ। আমার নাম স্পেন্সার সে ঠিক আছে– এবং আমি একজন পরিচালকই বটে, তবে তোমাকে আমি তো চিনলাম না, মিস...মিস?'

আরি, এক উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী যখন হাঁপাতে শুরু করে তখন আপনি তো বিনয়ের অবতার হয়েই উঠবেন, নাকি?

'...লোল্যাণ্ড– মিস লোল্যাণ্ড! আমার এটাই নাম!' চাদরের নিচে আমার দেহরেখার ওপর তার চোখ ঘুরছে। সে হাসল, তারপর ঝুঁকে এল সামনে এবং ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মোমবাতি। প্রথমে আঁধার গ্রাস করল কামরা তারপর আমার গায়ের ওপর থেকে টান মেরে সরিয়ে ফেলা হলো চাদর এবং মৃদু দুলে উঠল খাট। মেয়েটি আমার পাশে চলে এসেছে– উষ্ণ এবং বাস্তব, মোটেই ভূত-প্রেত কিছু নয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি চলে গেছে 'মিস লোল্যাণ্ড'। কাল রাতে কী ঘটেছিল বিস্তারিত মনে নেই তবে এটুকু স্মরণে আছে সারা রাত আমি যেন খাঁচাবন্ধ কতগুলো নখ ও দাঁতঅলা বাঘিনীর সঙ্গে কুস্তি লড়েছি।

আর সে অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না!

পরের দিন সন্ধ্যায় তার দেখা মিলল না। আমি বড়ই হতাশ

হলাম। কয়েকদিন তার বিরহে নির্ঘুম রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করার পরে ঠিক করলাম ওর ব্যাপারে কিছু খোঁজ খবর নেব। জানার চেষ্টা করব কোথায় থাকে সে।

উঠোনে যারা কাজ করে তারা আমার প্রশ্ন শুনে মাথা চুলকাল, পিচিক করে থুতু ফেলল, তাদেরকে বিমূঢ় দেখাল এবং বলল বেটসভিলে তারা ওই নামের কোনও মহিলাকে চেনে না। বাড়ির ভৃত্যরা কোনও সাহায্য করতে পারল না।

সুখের স্বপ্ন হয়ে পঞ্চম রাতে ফিরে এল মিস লোল্যাণ্ড– ধীরে দরজা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি তখন বিছানায় বসে বই পড়ছি।

'তুমি আমার খোঁজ করছিলে?' প্লেটে গরম দুধ পেয়ে তৃপ্ত বেড়ালের মত গরগর করল সে।

মাথা ঝাঁকালাম আমি। মেয়েটি তার গুরু নিতম্বে হাত রেখে মাথাটি একদিকে কাত করে প্রশ্ন করল, 'আমার মত অচেনা-অজানা একটি মেয়ের কেন তুমি খোঁজ করছিলে? উমম?'

বললাম আমি তাকে।

হাসল সে, তারপর ঝট করে খুলে ফেলল পরনের গাউন, নিভিয়ে দিল বাতি এবং ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে ওঠার আগেই এক লাফে চলে এল আমার পাশে।

তারপর দু'জনে মিলে বিছানায় তুললাম তাণ্ডব।

আমার দর্শনার্থী পরের রাতে এল, তার পরের রাতে এবং তার পরের রাতেও। তার সঙ্গে প্রতিটি মিনিট আমি উপভোগ করছিলাম।

এভাবে বারোটি রাত কাবার হয়ে গেল অথচ আমি মেয়েটি সম্পর্কে এখনও কিছু জানি না। তবে যতবারই আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করেছি প্রতিবারই সে দক্ষিণী টানে টেনে টেনে বলেছে, 'আমার সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ নয়, হানি।'

তারপর হুট করেই একদিন উধাও হয়ে গেল 'মিস লোল্যাণ্ড'। আমি আবার ওর সম্পর্কে নানাজনকে নানান প্রশ্ন করে বেড়াতে লাগলাম– এবং আগের বারের মতই কোনও তথ্য মিলল না। মেয়েটিকে আমার বিভিন্ন কারণে সন্ধান পাবার দরকার ছিল, এবং তার সবগুলোই শারীরিক। তার অনুপস্থিতিতে আমার দু'চোখ থেকে বিদায় নিল ঘুম এবং আশ্চর্যের ব্যাপার আমি খুব একাকী বোধ করছিলাম।

তবে বাড়ির নির্জনতার অবসান ঘটল যখন পিয়েরে এবং তার তিনজন 'হেল্পার' দুটো ভ্যানে চাপিয়ে দরজা জানালার পর্দা, নতুন আসবাব, পেইন্টিং, কার্পেটসহ ঘর সাজানোর আরও টুকিটাকি গৃহস্থালী সামগ্রী নিয়ে এল। ফরাসী মানুষটি নিজের কাজটি ভালই বোঝে। সে গোটা বাড়িতে চক্কর দিতে লাগল, শ্রমিকদের হুকুম করছে, হেল্পারদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে, যেন এক সার্জেন্ট।

এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ির ভোল বদলে গেল। এক বৃহস্পতিবার তার সহকারীদের বিদায় করল পিয়েরে।

আর সেই রাতে মেয়েটি এল– সেই দম বন্ধ করা রূপ নিয়ে, তার চোখে কী এক আলো ঝকমক করছিল, সঙ্গে সাত দিনের জমানো তীব্র কামনা।

'তোমার কিউট চেহারার বন্ধুটি কে?' কোনও ভূমিকা ছাড়াই জানতে চাইল সে।

'কোন্ বন্ধু?'

'বড় বড় বাদামী চোখের ছোটখাট মানুষটি,' মুচকি হাসল সে, ঠোঁটে জিভ বুলাচ্ছে।

'ওকে একা থাকতে দাও, বেবি। তুমি তো আমাকে পেয়েছ,' বললাম আমি।

ঠোঁট ফোলাল ও। 'জানি আমি তোমাকে পেয়েছি।' তার চক্ষু

সরু হয়ে এল। 'কিন্তু সে নিজেকে ধরা দিতে চায় না। আমি এরকমটাই পছন্দ করি...আর তুমি– তুমি বড্ড অধীর।'

'আমি অধীর,' বিস্ফোরিত হলাম আমি। 'মাই গড, উওম্যান, আমার পিঠের নখের খামচিগুলো কি আমি নিজে দিয়েছি!'

মেয়েটিকে যেন এক মুহূর্তের জন্য উদ্বিগ্ন দেখাল, তারপর ঘুরে এল আমার পেছনে ভালবাসার ক্ষত দেখার জন্য। 'পুওর বেবি,' কুঁইকুঁই করল সে, চুমু খেল দাগগুলোর ওপর। তারপর জোরে কামড় বসিয়ে দিল।

সেই রাতে সে চলে যাওয়ার আগে তাকে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে বোস্টনে যেতে। ওখানে আমার নতুন নাটকের উদ্বোধনী হবে। লাল চুলের মাথাটি নেড়ে সে দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, 'ওহ নো, আমি যেতে পারব না।'

'কেন পারবে না?' গোঁ ধরলাম আমি।

'আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব,' কাঁদতে শুরু করল ও। 'প্লিজ তুমি যেয়ো না। আমি জানি না পুরুষ মানুষ ছাড়া আমি কীভাবে চলব...মানে তুমি পাশে না থাকলে...'

বিছানায় উঠে বসল ও, প্রবল আকুলতা নিয়ে তাকাল আমার দিকে। 'বলো তুমি আমাকে ভালবাস। বলো তুমি আমাকে সবসময় ভালবাসবে। প্লিজ...ড্যান। মন থেকে বলার দরকার নেই, মুখে বলো।'

জানালার শাটার দিয়ে ভেসে আসা চাঁদের আলোয় তার চোখের জল চিকচিক করছে। মেয়েটি আক্ষরিক অর্থেই সুন্দরী– এমন রূপবতী আমি জীবনে দেখিনি। আমি চুম্বনে চুম্বনে ওর অশ্রু পান করতে করতে বললাম, 'আমি তোমাকে ভালবাসি...আমি তোমাকে ভালবাসি...ভালবাসব সবসময়।'

কিছুক্ষণ পরে শিহরিত সুখ নিয়ে ও শয্যা ত্যাগ করল।

'আমি এখন যাব। বোস্টনে গিয়ে নিজের প্রতি যত্ন নিয়ো। আর আমার কাছে ফিরে এসো। প্লিজ...আমি জীবনেও কাউকে এতটা ভালবাসিনি, ড্যান। বিশ্বাস করো– এর আগে আমি এমন করে কারও প্রেমে পড়িনি।'

ওর পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। 'আই লাভ য়ু,' ফিসফিস করে বললাম আমি। এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এক সেকেণ্ডের জন্য কথাটি আমি বিশ্বাসও করে ফেলেছিলাম।

পরদিন সকালে পিয়েরে ডাইনিংরুমে ঢুকল ফুঁসতে ফুঁসতে যেন রোঁয়া তোলা মোরগ।

আমি ওকে 'গুড মর্নিং' বলতে যাচ্ছিলাম, সে বাধা দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'অলরাইট, ড্যান। ঠাট্টা ঠাট্টাই কিন্তু তুমি বড় বেশি মশকরা করে ফেলেছ। মেয়েটা কে?'

বেকুব বনে গেলাম আমি– শুধু বিড়বিড় করে বললাম, 'কোন্ মেয়ে?'

'সাধু সেজো না! যে মেয়েটাকে...যে মেয়েটাকে আজ সকালে তুমি আমার বিছানায় পাঠিয়েছ।'

পিয়েরে সিরিয়াস এবং খাপচুরিয়াস মানে খেপে বোম হয়ে আছে। মেয়েটা! ও নিশ্চয় রাতের বেশিরভাগ সময় আমার সঙ্গে কাটিয়ে তারপর পিয়েরের ঘরে যায়নি। এ অসম্ভব! 'মেয়েটার বর্ণনা দাও তো শুনি,' বললাম আমি।

চেপে রাখা রাগে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটির বর্ণনা দিল পিয়েরে....সেই একই নারী।

'কী ঘটেছে?' প্রশ্নটি আমাকে করতেই হলো যদিও এর জবাব আমি চাই না।

'কী ঘটবে? কিছুই ঘটেনি। তোমার কি ধারণা একটা মেয়ে হুট করে আমার বিছানায় উঠে এল আর আমি তাকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করব? আমি কিছু নীতি মেনে চলি! আমার নৈতিকতা

আছে! ওটা তো একটা বেবুশ্যে! সাহস কত বলে কি না আমি কেন ওর কাছে ধরা দিচ্ছি না!'

তা হলে ব্যাপার এই! আমাকে দিয়ে ওর মনের আশ পুরোপুরি মেটেনি তাই গিয়েছিল পিয়েরের কাছে।

'আমি দুঃখিত, পিয়েরে। আন্তরিক দুঃখিত। তবে সত্যি জানি না মেয়েটা কে। জানার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কেউ ওর পরিচয় বলতে পারল না।'

পিয়েরে বুঝল আমি সিরিয়াস। সে এখনও রেগে থাকলেও আমাকে আর ঝাড়ি দিল না। 'কিছু মহিলা হলো জন্তুর মত— কিছুতেই তৃপ্ত হয় না,' ঘোঁতঘোঁত করল ও। 'এদের শরীর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা, সপ্তাহের সাতদিনই গরম হয়ে থাকে।

পিয়েরে শান্ত হলে বললাম আজ রাতেই আমি বোস্টনের উদ্দেশে যাত্রা করছি, ও আমার সঙ্গে যাবে কি না।

'না, ইস্ট উইং-এর কাজ এখনও শেষ করে উঠতে পারিনি। কালকের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে চাই। ভাল কথা *ইস্ট বিউটিফুলের* ক্লারা কেনেট আসছে একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে। সে তোমার এবং এ বাড়ির লে আউটের জন্য কিছু ছবি তুলবে। কাজেই যত জলদি পারো ফিরে এসো।'

বললাম পরদিনই আমি ফিরে আসছি। বেটসভিল শহর ধরে গাড়ি চালাতে গিয়ে ঠিক করলাম একবার খবরের কাগজের অফিসে থামব। দেখি টড মেয়েটা সম্পর্কে কিছু জানে কি না।

'নাহ্,' ধীরে ধীরে বলল টড, তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে, 'লোল্যাণ্ড নামে কোনও মেয়ে এ তল্লাটে নেই।' সন্দেহের সুর ফুটল কণ্ঠে। 'তুমি জানতে চাইছ কেন? জরুরি কিছু?'

আমি একটু চিন্তা করে দেখলাম ওকে এ মুহূর্তে আর কিছু বলা ঠিক হবে না।

'না?' সে অনুসন্ধিৎসু টেরিয়ারের মত একদিকে কাত করল মাথা। 'বেশ তো। তবু আমি একবার খোঁজ নিয়ে দেখব। তুমি বোস্টন থেকে ফিরে এলে জানাব।'

বোস্টনে যাওয়াটাই ছিল ভুল– এমন ভুল জীবনে করিনি। নাটক হলো ফ্লপ– এমনই ঢিলা গল্প যে প্রথমবার পর্দা পড়ার আগেই অর্ধেক দর্শক চলে গেল। আর আবহাওয়াটাও ছিল বিশ্রী– হোটেল রুমটা ভয়ানক গরম এবং মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র মত ফুড পয়জনিং-এ আক্রান্ত হলাম আমি।

বেটসভিলে যখন ফিরে এলাম, শহরের আকাশ কালো মেঘে থমথম করছে, ঝড়ের পূর্বাভাস। সোজা গেলাম সংবাদপত্রের অফিসে। আমাকে ঢুকতে দেখে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল টড, ধাক্কা লেগে একটা চেয়ার পড়ে গেল। 'ড্যান,' চেঁচাল সে। 'একটা খবর পেয়েছি।' সে মদ খাচ্ছিল।

'গুড,' বললাম আমি।

'শোনো– ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। তুমি এই মেয়েটাকে কোথায় দেখেছ?'

'সেটা বলা ঠিক হবে না, টড।'

আমার দিকে আড়চোখে তাকাল টড। 'বললে বলবে, না বললে নাই।' ডেস্ক ড্রয়ারে হাত বাড়িয়ে একটি ছবি বের করল। বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, উত্তেজনায় কাঁপছে হাত, 'এই মেয়েটা?' প্রায় আবছা গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

হ্যাঁ, সেই মেয়েটাই...তবে ছবিতে তার পরনে নাটকের সাজসজ্জা! আমি ভাল করে তাকালাম, আরি, একে দেখতে লাগছে যেন স্কারলেট ও'হারার ভূমিকায় অভিনয় করছে।

আমার দিকে এক নজর তাকিয়েই তার জবাব পেয়ে গেল টড। সে একটু নেচে নিল, প্রথমে এক পায়ে, তারপর অন্য পায়ে লাফাতে লাফাতে বলল, 'জানতাম...আমি জানতাম! ওই বাড়িতে

ও এসেছিল, তাই না! মাথায় লাল চুল এবং ফিগারটা এরকম...' শূন্যে হাতের ভঙ্গিমায় সে খাঁজভাঁজগুলোর আকার দেখাল।

আমি ধপাস করে বসে পড়লাম চেয়ারে, সামনে কী আসছে ভাবতে গিয়ে হিম হয়ে গেল বুক। 'ঠিক আছে, টড। তুমি কী জানো, বলো।'

'এ সেই– স্যালি! তার বাবার পদবী ছিল লোল্যাণ্ড। স্যালি লোল্যাণ্ড। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। তুমি ওকে দেখেছ!' সে হাসতে হাসতে চড় মারল নিজের পায়ে। 'তুমি এখন নিশ্চয় বিশ্বাস করবে যে ভূত আছে,' আমার গম্ভীর মুখ দেখে থেমে গেল তার হাসি। বলল, 'আমি দুঃখিত, ড্যান। তোমাকে নিয়ে আমি মজা করতে চাইনি।' আমি কোনও কথা না বলে চলে আসছি, তখনও সে বিড়বিড় করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে চলেছে।

নীলচে কালো মেঘ স্তূপ হয়ে আছে গোটা দিগন্ত জুড়ে, আকাশে কীসের যেন অশুভ সংকেত। যখন আমি বাড়ি পৌঁছেছি ততক্ষণে নদীর দিক থেকে গুড়গুড় মেঘের ডাক ভেসে আসতে শুরু করেছে। পিয়েরেকে কাছে পিঠে কোথাও দেখতে পেলাম না। দোতলায় উঠে এলাম আমি। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শেষ করেছি মাত্র, হাউহাউ করে হামলে পড়ল ঝড়।

শাটারের বাইরে গোঙাতে লাগল বাতাস, অঝোর ধারায় শুরু হয়ে গেছে বর্ষণ, বুনো জন্তুর মত ছাদের ওপর যেন আঁচড়াতে, খামচাতে লাগল। দপদপ করে উঠল বাতিগুলো, নিভু নিভু হয়ে এল, তারপর আবার জ্বলে উঠল পূর্ণশক্তিতে। বাইরে কান ফাটানো শব্দে বাজ পড়ছে...আমি যেন হঠাৎ করেই একটা গোলাগুলির মধ্যে পড়ে গিয়েছি।

কী করব মাথায় আসছিল না তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম এ বাড়ি থেকে এখুনি পালাতে হবে। তারপরের করণীয় সম্পর্কে পরে চিন্তা করা যাবে। চাকরগুলো কাজ শেষে চলে যাওয়ার

আগে স্টাডিরুমে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে বসলাম। ভাবছি কী করা যায়। আমার মাথাটা কেন জানি কাজ করছিল না, ভোঁতা লাগছিল সবকিছু। এমনসময় পিয়েরের গোঙানি শুনতে পেলাম।

দৌড় দিলাম সিঁড়িতে। ফার্স্ট ল্যাণ্ডিং-এ আধখাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে পিয়েরে, রক্তশূন্য মুখ, একেবারেই বিধ্বস্ত চেহারা। পাগলা বাছুরের মত বনবন করে ঘুরছে চোখের মণি। 'ড্যান,' গলা নয় যেন ব্যাঙের ডাক। ভেঙে গেছে স্বর। এক কদম এগোল আমার দিকে, মিস করল সিঁড়ি এবং গড়াতে গড়াতে নেমে এল নিচে।

'পিয়েরে, মাই গড, কী হলো তোমার?'

'মেয়েটা...ওই মেয়েটা,' শিউরে উঠল ও, শরীর এমনভাবে কাঁপছে যেন হাই ভোল্টেজের বিদ্যুতের তার স্পর্শ করেছে।

সিধে হওয়ার চেষ্টা করল ছোটখাট ফরাসী মানুষটা। আমার ট্রাউজার্স খামচে ধরল। 'ওকে দূর করো। ও যেন আর আমার কাছে আসতে না পারে।' ফোঁপাতে লাগল সে।

ওকে ধরে একটা ঝাঁকি দিলাম যাতে হুঁশ ফিরে আসে।

'আসল কথায় এসো। কী হয়েছে?'

'ও...ও গত রাতে আমার বিছানায় এসেছিল...তারপর সারারাত ধরে...ও,' হিস্টিরিয়া রোগীর মত চোখ ঘোরাল পিয়েরে। 'আমার অতটা তাকত নেই, ড্যান। ও আমাকে মেরে ফেলবে! আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো, প্লিজ!'

আমি ওকে টেনে তুললাম। 'ঠিক আছে, চলো যাই। তোমার ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নাও।'

ওর আতঙ্কটা ফিরে এল। 'না, না। ব্যাগ গোছাতে হবে না। এখুনি চলো। ও ওখানে।'

ওর ভয় সংক্রামক। আমিও যেন স্যালির উপস্থিতি অনুভব

করছিলাম; আর কোনও উষ্ণ অনুভূতি নয়, ভীতিকর কিছু একটা, যেন খুলে দেয়া হয়েছে নরকের দুয়ার এবং ওখানকার বাসিন্দারা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে শিকারের সন্ধানে।

আবার তেজ হারাতে লাগল বাতিগুলো– ত্রিশ সেকেণ্ড স্তিমিত হয়ে রইল– তারপর ধীরে ধীরে নিভে গেল। আলো বলতে শুধু ফায়ারপ্লেসের আগুনের আভা।

'ড্যান,' ভয়ে চিৎকার দিল পিয়েরে। 'ও আসছে!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' ওকে কম্পিত গলায় সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। 'আমি ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে গাড়িতে যাচ্ছি।'

কিন্তু পিয়েরে আমার সঙ্গে সেঁটে রইল। বজ্রের আলোয় দেখলাম লন ভেসে যাচ্ছে জলস্রোতে। মুহূর্তেই দু'জনে কাকভেজা। হঠাৎ বাড়ির পাশের ম্যাগনোলিয়া গাছের ওপর তীব্র আলোর একটা ঝলকানি ছুটে এসে ঝলসে দিল আমার চোখ। আঁধারে তখনও সয়ে ওঠেনি চাউনি, পলকে গাছটা বিকট শব্দে হুড়মুড় করে পড়ে গেল আমার গাড়ির ওপর, কয়েক ইঞ্চির জন্য রক্ষা পেলাম দু'জনেই।

অবিশ্বাস্য ভয়ের একটা অনুভূতি আমাকে গ্রাস করল। আমি বড় শহরে বাস করে অভ্যস্ত– সেখানে ভূত-প্রেতের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু স্যালি নামের প্রেতিনীর সত্যি অস্তিত্ব রয়েছে! এখন আর আমার কোনওই সন্দেহ নেই যে ও-ই একটু আগে বজ্রপাতের ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আমার মন আমাকে সাবধান করে দিল যদি আমরা লন পার হওয়ার চেষ্টা করি অশুভ শক্তিটা আবার বাধা দেবে– হয়তো আগেরবারের চেয়েও ভয়ঙ্করভাবে।

পর্চে দাঁড়িয়ে আমার বাড়িটিকে চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেখে অসুস্থবোধ করতে লাগলাম আমি। লন, ফুলগাছ, ঝোপঝাড় কিছুই আস্ত রইল না। ভয়ানক বৃষ্টি আর শিলা পড়ে সবকিছু একেবারে তছনছ হয়ে গেল। কাচ ভাঙার তীব্র ঝনঝন

জানিয়ে দিল আমার নতুন গ্রীনহাউসটিকেও শেষ করেছে স্যালি।

আমি এক ছুটে বাড়িতে ঢুকলাম; গোঙাতে গোঙাতে পিয়েরে আমার পিছু নিল। একা থাকতে ভয় করছে ওর। আমাদের পেছনে এত জোরে বন্ধ হয়ে গেল দরজা যে সেই শব্দে লাফিয়ে উঠল কলজে।

বাতাসে স্যালির শরীরের গন্ধ, ঝড়ের তাণ্ডব ছাড়িয়ে তার যৌনাবেগ যেন দপদপ করছিল। ভয় এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে আমি সিঁড়ি গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশেষে গলা বাড়িয়ে ডাক দিলাম, 'স্যালি! স্যালি লোল্যাণ্ড, কোথায় তুমি?'

জবাবে শুধু জানালার গায়ে আছড়ে পড়া বাতাসের হুংকার আর শাটারের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা গেল।

আবারও ডাকলাম আমি। কাজটা এমন নির্বোধের মত এবং মেলোড্রামাটিক মনে হচ্ছিল যে নিজেকে স্রেফ একটা গবেট লাগছিল। তবে আমার ভয়ে প্রায় অসাড় হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কের একটি অংশ জানত স্যালি আমার কথা শুনছে...কোথাও বসে। আমি ওক কাঠের প্রকাণ্ড দরজাটির দিকে ঘুরলাম। মনে হলো চাপা গলায় যেন হেসে উঠল ও। বাতাসে ভেসে আসা জলের ছাঁট লেগে পুরানো কাঠ খানিকটা ফুলে উঠেছে তবে কপাট খুলবে না- সে আমরা যতই ঠেলাঠেলি কিংবা টানাটানি করি না কেন। অবশ্য চেষ্টা করার আগেই বুঝে গেছি স্যালি আমাদের পালাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে রেখেছে।

আমি সিঁড়ি গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। 'স্যালি, আমাদেরকে যেতে দাও...প্লিজ, আমাদেরকে ছেড়ে দাও।'

আবার ভেসে এল ভৌতিক চাপা হাসি- তবে এবারে আগের চেয়ে জোরে। সেই হাসি যেন আতঙ্কের বিরাট একটা হাত হয়ে আমার নাড়িভুঁড়ি চেপে ধরল।

পিয়েরে অসহায়ের মত সিঁড়ি গোড়ায় পড়ে গেল। সে

ভয়ানক কাঁপছে। ভয়ে বারবার মুঠো খুলছে এবং বন্ধ করছে।

'স্যালি,' হাঁক ছাড়লাম আমি। 'আমার কথা শোনো...প্লিজ।' প্রথমে কিছু শোনা গেল না, তারপর ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে আমি শুনতে পেলাম ওটা।

গুনগুন করছে কেউ– অমানুষিক এবং প্রচণ্ড ভীতিকর একটা গুনগুনানি, যেন একটা ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা তার দুর্ভাগা সঙ্গীকে নিজের জালে আটকে ফেলে তাকে গলাধঃকরণ করতে যাচ্ছে।

এখন একটাই মাত্র কাজ আছে করার।

আমি পিয়েরেকে মেঝেতে ফেলে রেখে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম।

গুনগুনানির সুরটা বদলে গেল...যে গাইছে সে যেন একটু অবাকই হয়েছে। ভয়ে আমার কলজে উড়ে গেছে। কিন্তু স্যালির সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে ওরই নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্রে।

মাস্টার বেডরুমে ঢুকে আমি শুয়ে পড়লাম। বাইরে ম্যানিয়াকের মত দাপাদাপি করছে ঝড়, বাড়ির অপর পাশের ম্যাগনোলিয়া গাছটি এবারে ধরাশায়ী হলো ওয়েস্ট উইং এবং গোটা কিচেনসহ।

আমার ঘরের দরজা খুলে গেল। সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, একপাশে হেলানো মাথা, বিস্মিত।

'হ্যালো, স্যালি লোল্যাণ্ড,' আমি উচ্চস্বরে ডাকলাম ওকে।

এক সেকেণ্ডের জন্য ঝিকিয়ে উঠল সবুজ চোখ, তারপর সরু হয়ে এল। সে বিস্ময় এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি ভয় পাওনি?'

আমি ডানে-বামে মাথা নাড়লাম, তার পাতলা নেগলিজির ওপর আঠা হয়ে লেগে আছে দৃষ্টি। আতঙ্ক সত্ত্বেও আমার ভেতরে জেগে উঠতে লাগল কামনা। আমি বিছানা থেকে নেমে ওর দিকে এক কদম বাড়ালাম। বাইরে চিৎকার দিল বাতাস, ছাদের ওপর

কী যেন পড়ল দুম করে, এতই জোরে যে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল।

স্যালি এক হাত তুলে ইশারা করল আমাকে থামতে। 'ড্যান,' ওর গলার স্বরে এমন অনিশ্চয়তার সুর আগে কখনও শুনিনি। 'তুমি এখানে কেন এসেছ?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'বলো আমাকে,' গর্জন করল স্যালি।

'কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।'

আঘাত পাওয়া, হতভম্ব ছোট্ট মেয়েটির মত স্যালি বলল, 'আমাকে কেউ কোনওদিন ভালবাসেনি...শুধু আমার শরীরটাকে ভালবেসেছে! তুমিও তাদের থেকে আলাদা নও...অন্তত আমি তা মনে করি না।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, স্যালি। আমি তোমার সব কথাই জানি...গত একশ' বছরে কারা তোমার প্রেমিক ছিল তাদের কথা। যদিও তুমি মৃত কিন্তু আমার কাছে তুমি যে কোনও নারীর চেয়েও বেশি জীবিত। আমি সব কথাই জানি– আমি তোমাকে এখনও ভালবাসি।' হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমি যা বলছি তা সত্যি এবং আমার এ উপলব্ধি হয়তো প্রকাশও পেল আমার গলার স্বরে।

স্যালি আমার চোখে গভীরভাবে তাকাল, তার চাউনি যেন ভেদ করে গেল আমার হৃৎপিণ্ড, তারপর সে ঠোঁট কামড়ে ধরে পিটপিট করল চোখে অশ্রু ঠেকাতে।

'আমাকে কেউ কোনওদিন কখনও ভালবাসেনি, ড্যান।'

আমি ওকে আমার বুকে নিতে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সে চট করে একপাশে সরে গিয়ে আমাকে ধাক্কা মারল। 'দাঁড়াও, প্লিজ...আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম। নরম এবং গরম। ও গুটিয়ে

উঠল। 'না...এখন না।'

তারপর হাসল স্যালি, সিরিয়াস গলায় বলল, 'চলো, নিচে যাই, ড্যান।'

আমরা হাত ধরাধরি করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে, পিয়েরে যেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, সেখানে চলে এলাম।

'তুমি এ বেচারাকে ভয়ে আধমরা করে ফেলেছ,' জোর করে মুখে হাসি ফোটালাম আমি। 'আমি তোমাকে যেভাবে সামাল দিতে পারি ও তা পারে না।'

'তুমি সবসময়ই বড্ড অধীর আর ব্যাকুল, ড্যান। কিন্তু ও আমার কাছে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। সবসময় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা।' অন্যমনস্কভাবে বলল স্যালি, ফিরিয়ে দিল না আমার হাসি। বাড়ির পেছন দিকটায় ফিরল। ওখানে মাতামাতি করছে ঝড়। স্যালি যখন কথা বলল, গলার স্বর খসখসে শোনাল, 'আরেকবার বলো আমার জন্য তুমি কতটা ফিল কর, ড্যান।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, স্যালি। ভালবাসব সবসময়।' একদম সত্যি কথা!

স্যালি আবার পিটপিট করল চোখ, তারপর যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, এমন ভঙ্গিতে হাঁটা দিল সদর দরজায়। 'এদিকে এসো,' আদেশ করল ও। আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'খোলো এটা।'

অবাক আমি তবু ওর হুকুম পালন করলাম। দরজাটি সহজেই খুলে গেল। শটগানের গুলির মত বৃষ্টির ধারাল ফোঁটাগুলো আঘাত হানল আমার মুখে, ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলছিলাম। বাইরের ধ্বংসযজ্ঞের দিকে নজর বুলালাম। খুবই ভয়াবহ অবস্থা। স্যালির গলার স্বর ভেসে এল পেছন থেকে, আশ্চর্য করুণ এবং একাকী, 'বিদায়, ড্যান।' তারপরই দরজা বন্ধ করে দিল সে।

'স্যালি, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও,' চেঁচালাম আমি।

জবাবে আর্তনাদ ছাড়ল বাতাস।

'স্যালি, পিয়েরের কী হবে?'

পাগলের মত এক দৌড়ে বাড়ির পেছনে চলে এলাম, ভেতরে ঢুকবার রাস্তা খুঁজছি। কোনও লাভ নেই। এ বাড়ি ফোর্ট নক্সের চেয়েও দুর্ভেদ্য। ঢোকার কিছু উপায় নেই।

আবছা মনে পড়ে জলকাদা, মাটিতে পড়ে থাকা গাছপালা, বেড়া ইত্যাদির মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে অবশেষে হাইওয়েতে উঠে পড়ি আমি। তখন প্রায় মাঝরাত। হোঁচট খেতে খেতে রওনা হই বেটসভিলের দিকে।

টডকে ওর অফিসেই পেয়ে গেলাম; সে অপ্রত্যাশিত হারিকেন ঝড় নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বিস্তারিত একটি লেখা লিখবে ঠিক করেছিল। আমি বললাম আমার এক বন্ধু সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে। ওকে একা সরিয়ে নিতে ভয় পাচ্ছি পাছে ইন্ট্যারনাল কোনও ইনজুরি হয়। টড অবশ্য আমার চোখমুখ দেখেই বুঝে ফেলেছিল মিথ্যা বলছি। আমার মিথ্যাচারিতার সঙ্গে ভৌতিক কোনও বিষয় জড়িত।

টড, একজন ডেপুটি শেরিফ এবং একজন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেনডেন্টকে নিয়ে আমি ফিরে এলাম মরগান ম্যানশনে। চার মাইল রাস্তা পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল।

গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে টড ফিসফিস করে বলল, 'মাই গড!' আমার মুখে তখন কোনও রা নেই। বাড়িটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পাঁচশ' বছর ধরে এর গায়ে কোনও রঙের প্রলেপ পড়েনি। প্রলয়ংকরী বাতাসে জানালা ভেঙে কব্জার সঙ্গে ঝুলে আছে, বাড়ির পশ্চিম অংশের ছাদ পুরোটাই ধসে গেছে, যেখানে লন আর বাগান ছিল সেখানে এক পুকুর কাদাজল থই থই...আর সদর দরজাটা ভেঙে

বাতাসের বাড়িতে ডানে-বামে শুধু মুখ নাড়ছে।

পিয়েরের কোনও চিহ্নই নেই...তখনও পেলাম না, পরেও নয়।

ডেপুটি এবং করোনার বলল তাদের ধারণা পিয়েরে ঝড়ো বাতাসে বেরিয়ে পড়েছিল এবং দুর্ঘটনাবশত ডুবে মরেছে।

কিন্তু আমার ধারণা আসল সত্যটি আমি জানি আসলে কী হয়েছে পিয়েরের– এবং সম্ভবত টডও কিছু সন্দেহ করেছে তবে সে মুখ বুজে রইল।

আমি একটা প্রবাদে খুব বিশ্বাস করি 'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ।' আমি স্যালির ওই ছোট্ট সেক্সি স্বর্গে সুখেই থাকতে পারতাম। ও ছিল দারুণ কামুকী এক নারী– একটু হিংস্র তবে চমৎকার– ওর চাহিদাও ছিল প্রচুর। তবে আমার চাহিদা ছিল আরও বেশি।

বিকৃত কিছু কারণে ও হয়তো আমার প্রেমেও পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্যালি তার কামনার নেশা মেটাতে পিয়েরেকে ধরে নিয়ে গেছে ভূত-প্রেতদের প্রেতলোকে যেখান থেকে বেচারা কোনওদিন ফিরে আসতে পারবে না। ওখানে সে থাকবে ভূতপেত্নীদের খেলার সঙ্গী হয়ে।

ব্যাপারটি আমার কাছে মস্ত একটা ঠাট্টার মত লাগছে। ঠাট্টাটির কথা মনে হলেই আমি হাসতে শুরু করি, উন্মাদের মত হাসতেই থাকি কেবল, সে হাসি আর থামে না। ও আমাকে...নিজেকে এবং পিয়েরেকে নিয়ে দারুণ একটি ঠাট্টা করেছে।

স্যালি– উষ্ণ, যৌনাবেদনময়ী স্যালি– চেয়েছিল কেউ তার সঙ্গে প্রেম করবে...সবসময়! তাই সে দুর্ভাগা পিয়েরেকে বাছাই করেছে। দেখুন, আবারও আমি হাসতে লেগেছি!

স্যালি ভেবেছে পিয়েরে তার খেলার পুতুল হবে কিন্তু ছোট

ফরাসী মানুষটিকে সে কিছুতেই হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারছিল না। সেজন্যই শোধ নিতে হয়তো...

আর স্যালির সর্বসময়ের ভালবাসার খিদে মেটাতে গিয়ে পিয়েরে বেচারার যে কী দশা হবে তা-ই ভাবছি এখন! এবং কেবলই হাসি পেয়ে যাচ্ছে।

বাড়ির চোখে ঘুম নেই

বডমিনের অনাবাদী জমির ধারে এসে জনি জোনস লক্ষ করল তার গাড়িতে অল্প কয়েক মিটার পেট্রল আছে। এ দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না। রাস্তায় বন্ধ হয়ে যাবে গাড়ি। এদিকে সন্ধ্যাও ঘনাচ্ছে, হালকা মেঘের মত নেমে আসছে রাত, বিবর্ণ চরাচর ঢেকে যাচ্ছে ঝাপসা বেগুনি কুয়াশায়। দূরে, আধ কিলোমিটার হবে, বৃহদায়তনের চৌকোনা একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ব্যালকনি এবং বারান্দাসহ কাঠের প্রকাণ্ড একটি কাঠামো, ঢালু ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে জানালা, বিদায়ী সূর্যের লাল আবির মেখেছে কাঠের তক্তাগুলো। বাড়িটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন টুপ করে খসে পড়েছে আকাশ থেকে। সামনে কোনও বাগান কিংবা উঠোন নেই, পতিত জমিন সোজা মিশেছে দেয়ালের পাশে।

বাড়িটির কয়েকশ' মিটার সামনে এসে গাড়ি থামাল জনি, বন্ধ করল ইঞ্জিন।

নীরবতাটা কেমন অদ্ভুত: পাখির কলকাকলি নেই, কোনও জন্তুর ছোটাছুটি লক্ষ করা যাচ্ছে না, এমনকী বাতাসের ফিসফিসানিও অনুপস্থিত। দূর প্রান্তে, বাড়ির পেছন দিকে কতগুলো গাছ নজরে এল ওর। কিন্তু বৃক্ষের ওই সারিও জীবন এবং শব্দশূন্য। একটা নালা ছোট বনটির মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে পতিত জমিকে ঘিরে।

সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাড়িটির দিকে, আশা করছে

মানুষজন দেখতে পাবে।

'কেমন ভুতুড়ে বাড়ি,' বিড়বিড় করে বলল জনি। তার নিজের কণ্ঠস্বর এই অস্বাভাবিক নীরবতার মাঝে নিজের কাছেই কেমন গা ছমছমে শোনাল।

বাড়ির ওপর গাঢ় লাল রঙের ছায়া। সূর্য এখুনি ডুব দেবে। বাড়িটির দিকে একঠায় তাকিয়ে আছে জনি। সত্যি বড্ড রহস্যময় লাগছে ওটাকে। জানালায় আলোর কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ও বাড়িতে কেউ থাকে না। তবে ভাঙাচোরা, পরিত্যক্তও কিন্তু লাগছে না। অবহেলায় পড়ে আছে তাও বলা যাবে না। হয়তো হলিডে হোম জাতীয় কিছু একটা হবে এটা, ভাবছে জনি। কিন্তু পাণ্ডববর্জিত এ জায়গায় কার মনে সাধ জাগে ছুটি কাটানোর?

নাহ্, ওকে একবার একটু দেখতেই হবে বাড়িতে কেউ আছে কি না। গাড়িতে উঠে আবার স্টার্ট দিল জনি, চলে এল বারান্দার সামনে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। পায়ের নিচে কাঠের তক্তাগুলো বেশ আরামদায়ক ঠেকল, যেন নরম কিছু একটার ওপর দিয়ে হাঁটছে সে।

'আশ্চর্য,' বিড়বিড় করল জনি।

আবারও নীরবতার মাঝে শব্দটি যেন ব্যাঘাত ঘটাল।

জনি দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করছে, সাড়া দিল না কেউ। জানালা দিয়ে উঁকি মারল। ভেতরটা অন্ধকার। হঠাৎ প্রবল একটা আলস্য ঘিরে ধরল ওকে। ভয়ানক ক্লান্ত লাগল শরীর। ঘুম আসছে খুব। বারান্দায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলেই হয়। কাঠের বারান্দাটি ওকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জনি বারান্দায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। পিঠের নিচে কাঠের বোর্ডগুলো অদ্ভুত নরম, যেন কার্পেট। শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর দু'চোখে নামল ঘুম।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল জনি জোনসের। পুবাকাশে আলো তখন কেবল ফুটিফুটি করছে। শীত শীত লাগছে ওর। উঠে পড়ল জনি। সদর দরজার হাতলটা চোখে পড়ল। ওটা ধরে মোচড় দিতেই বুঝতে পারল দরজায় তালা মারা নেই। সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল, 'ভেতরে কেউ আছেন?'

নিশ্চল নীরবতা ভেঙে অস্ফুটে সাড়া দিল যেন কেউ। একটু বিব্রত বোধ করল জনি। এই সাতসকালে কারও বাসায় হানা দেয়ার কী ব্যাখ্যা দেবে সে?

'হ্যালো?' আবার ডাকল ও। 'আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। আমি আসলে...পথ হারিয়ে...'

আবার শোনা গেল সেই আবছা, ভোঁতা কণ্ঠস্বর। যেন ঘরের কর্তা ওকে অনুমতি দিল ঘরে ঢুকবার জন্য। ভেতরে পা রাখল জনি। ফ্রন্ট হলওয়েটাকে মনে হলো মোমপালিশ করা, কিন্তু একেবারেই নগ্ন, এমনকী মেঝেতে কোনও কার্পেটও নেই।

'আমি কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল জনি, নিজেকে বড্ড বোকা বোকা লাগছে।

সদর দরজাটি হঠাৎ মৃদু ঠাশ শব্দে ওর পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। লাফিয়ে উঠল জনি। ঘুরল। শব্দে চমকে গেছে। প্রায় এ অন্ধকারে কোনও কারণ ছাড়াই তার ভয় ভয় করছে। ছুটে গেল সদর দরজায়, হাতল খুঁজল। কিন্তু অন্ধকারে দরজার হাতল খুঁজে পেল না। তার বুক ধুকধুক করছে। দরজায় মনে হচ্ছে কোনও হাতলই নেই। দরজা বন্ধ হওয়ার সময় হাতলটা কোথাও ছিটকে পড়ে গেল?

'হেই!' চেঁচাল জনি, কণ্ঠে আতঙ্কের সুর স্পষ্ট। 'কোথায় তুমি?'

এখানে।

'কোথায়?'

এই তো এখানে।

হলওয়ের ওপাশের কোনও কামরা থেকে কণ্ঠটি ভেসে আসছে মনে হলো জনির। সে ওই ঘরে গেল। শার্সিহীন গরাদঅলা জানালা থেকে ঢুকে পড়া ধূসর আলোয় তাকাল চারপাশে। যা দেখল তাতে সে রীতিমত স্তম্ভিত। দেয়ালে কালো ওক কাঠের প্যানেলের অপূর্ব সব কারুকাজ, তাতে সুন্দর সুন্দর কটেজ, বাড়ি, গির্জা এবং বিভিন্ন ধরনের দেয়ালের ছবি খোদাই করা। ঘরে কোনও সিলিং নেই, শুধু লাল রঙের কড়িকাঠ এবং মাথার ওপরে জাহাজের আকৃতির ছাদ। কড়িকাঠগুলোও অলংকৃত, তাতে প্রাচীন আমলের গ্রাম, মন্দির এবং লং হাউসের ছবি। সম্ভবত পলিনেশিয়ান। নাকি ইন্দোনেশীয়?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জনি। ধূসর অনাবাদী জমি, দূর দিগন্তে সমতল বিস্তৃতি নিয়ে ছড়িয়ে আছে। ঘরে কেউ নেই, সামান্য আসবাবও নেই। নেই কোনও পর্দা অথবা কার্পেট। কিছু নেই।

সে হলওয়েতে ফিরে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, মুখের সামনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ভারী কপাট।

'হেই!' আবার চিৎকার দিল ও, ভয়ের শিহরণ জাগছে শরীরে।

'হেই! এসব কী...! অ্যাই!'

এবারও সে দরজায় কোনও হাতল দেখতে পেল না। দরজায় লাথি-ঘুষি মারতে লাগল জনি। তাকে বেরুতে দেয়ার জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কিন্তু দোর খুলল না। বরং কিনারে আঙুল ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে খোলার চেষ্টা করতে গেলে ওটা যেন সামান্য একটু ফুলে উঠে আরও শক্তভাবে এঁটে গেল। এবারে সত্যি ভয় পেল জনি। এক ছুটে চলে গেল জানালার ধারে।

কাঠের গরাদগুলো দেখে মনে হয় খুবই মজবুত। জনি একটা গরাদ ধরে টানাটানি করল বৃথাই। ছোটানো গেল না। লাথি মারল। ভাঙল না। এমন সময় সে আবার শুনতে পেল কণ্ঠটি...

জানালাটাকে ছেড়ে দাও।

'ক্ব-কী?' পাঁই করে ঘুরল জনি কারণ গলার স্বরটি ভেসে এসেছে খুব কাছ থেকে। অথচ ঘরে কেউ নেই।

জানালাটাকে ছেড়ে দিতে বলেছি।

'এই যে তুমি!' রাগে গাঁকগাঁক করছে জনি। 'তুমি কোথায়? আমাকে এখান থেকে যেতে দাও, জাহান্নামে যাও তুমি!'

তোমার হাত গর্তের মধ্যে ঢোকাও, বলল জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

জনি আশপাশে তাকাতেই দেয়ালের গায়ে বড়সড় একটি নটহোল দেখতে পেল, ওর মুষ্টির সমান বড়। অপর পাশে অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই। কী এটা– কোনও ট্রিক? হয়তো গর্তের ওপাশে কোনও চাবিটাবি আছে। স্থির মস্তিষ্কে কিছু চিন্তা করতে পারছে না জনি। সে তার হাত ঢুকিয়ে দিল গর্তে, হাতড়াল। কিন্তু হাতে কিছুই ঠেকল না। গর্ত থেকে হাত বের করে আনতে যাচ্ছে জনি, নটহোল চেপে বসল ওর কব্জিতে। যেন ইঁদুরের ফাঁদে আটকে গেছে।

হাতটা মোচড়ামুচড়ি করে টেনে বের করতে গিয়ে বেহুদা ব্যথাই পেল।

'উফ, লাগছে তো!' কাতরে উঠল জনি।

তা হলে নড়াচড়া কোরো না। স্থির দাঁড়িয়ে থাকো। দ্যাখো, দেয়াল কাঁপছে। কম্পন টের পাচ্ছ? ওটা আমার কণ্ঠ।

'নরকে যাও তুমি!' চেঁচাল জনি। 'শালা উন্মাদ...'

এবারে মেঝে কাঁপতে লাগল। সেই সঙ্গে জনিও কাঁপছে। আর শব্দ হচ্ছে। তীব্র শব্দ। কান ফেটে যায়। জনির দাঁতে দাঁত

লেগে ঠকঠক শুরু হলো। কাঁপুনির চোটে হাড়গোড় পর্যন্ত নড়ে যাচ্ছে যেন। মাথাটা বারবার নাড়া খাচ্ছে। তার পা হড়কে গেল, হাতে প্রচণ্ড টান লাগল। ব্যথায় আগুন ধরে গেল গায়ে।

'স্টপ ইট! স্টপ ইট!' চিৎকার দিল জনি, গোটা কামরাই এবারে ভয়ানক ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে।

একটু পরে থেমে গেল কম্পন।

এখন তোমাকে যা বললাম করো।

'আমি পাগল হয়ে যাব,' কেঁউ কেঁউ করল জনি। 'আমার মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা যদি কোনও ট্রিক হয়ে থাকে, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। তুমি আমাকে উন্মাদ বানিয়ে ফেলছ।'

ছাদের ওপরের কোথাও থেকে যেন ভেসে এল একটি দীর্ঘশ্বাস, *উন্মাদ– অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই মানুষ তাকে উন্মাদ বলে আখ্যা দেয়। বেশ, নিজেকে যদি উন্মাদ ভাবতে ইচ্ছে করে, ভাবতে পারো। আমার কিছু আসে যায় না, অন্তত যতদিন তুমি এখানে আছ...*

'কে...কে তুমি?'

জনিকে জানানো হলো বাড়িটি নিজেই তার সঙ্গে কথা বলছে। বলল জনি এখন তার বন্দি এবং আমৃত্যু তাকে এ বাড়িতে বন্দি হিসেবে থাকতে হবে। বাড়িটি নিজে চলাফেরায় সক্ষম নয় বলে যত্নআত্তিও নিতে পারে না।

এজন্য আমার একজন কাউকে দরকার। তোমার মত কোনও মানুষ যে আমার কাজগুলো করে দেবে। বৈরি আবহাওয়া থেকে রক্ষা করতে আমার শরীর সে ঘষে মেজে রাখবে। আমার দেহের কিছু মেরামতি দরকার, রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। আর সেই কাজগুলো করার জন্য আমি তোমাকে চাই।

'আমি পারব না,' আপত্তি জানাল জনি। 'তুমি আমাকে এভাবে এখানে আটকে রাখতে পার না। আমি কী করছি, একটা

বাড়ির সঙ্গে কথা বলছি? এ শ্রেফ পাগলামি। দেখো, আমি এখানে থাকতে পারব না। তুমি গোলামীর কথা বলছ– একজন ক্রীতদাস চাইছ। আমি কারও কেনা গোলাম নই। আমি এখানে থাকব না।'

তোমাকে এখানেই থাকতে হবে– তোমার কোনও উপায় নেই।

মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করতে লাগল জনি: দেয়ালটা ওর হাত আটকে রেখেছে বলে কোনওকিছুই সে করতে পারছে না। মেইনটেনেন্সের কাজ করতে হলে ওকে সারা বাড়ি ঘুরতে হবে। এবং নটহোল ওকে ছেড়ে দিলে হয়, আর দরজাটা খোলা পেলেই পগারপার হবে জনি।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'আমি তোমার কাজ করে দেব। আমাকে ছেড়ে দাও। দেখিয়ে দাও ঘর পরিষ্কার করার জিনিসপত্র কোথায়...'

প্রশস্ত হলো নটহোল, জনিকে হাত বের করে নেয়ার সুযোগ দিল। সে আহত কব্জি ডলতে লাগল। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগোল দরজায়। খুলে গেল দোর। হলওয়েতে পা রাখল জনি। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। চওড়া এবং কারুকাজ করা সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়াল। ওটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে পরের ফ্লোরের দিকে চলে গেছে। কী বলবে ঠিক করে ফেলল জনি।

'আমি আমার গাড়ির বুট থেকে কিছু যন্ত্রপাতি কি নিয়ে আসতে পারি?' বাড়িটিকে জিজ্ঞেস করল ও।

কয়েক মুহূর্ত বজায় রইল নিস্তব্ধতা, তারপর খুলে গেল সদর দরজা।

জনি জোনস সদর দরজা পার হয়ে গাড়ির কাছে গেল। তারপর গাড়ির দরজা খুলে লাফ মেরে বসল ড্রাইভারের আসনে। চাবি হাতড়াচ্ছে। বাইরে থেকে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে

এল, যেন বাড়ির কাঠের তক্তাগুলো নিজেদেরকে মুক্ত করতে তারস্বরে চিল্লাচ্ছে। গাড়ি স্টার্ট দিল জনি। বিজয় উল্লাসে গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। আড়চোখে একবার তাকাল বাড়িটির দিকে। বারান্দার একটা কোণ নিজে নিজেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করছে তক্তার ওপর।

অকস্মাৎ বারান্দার একটা খুঁটি রাইফেলের গুলির শব্দ তুলে ছুটে গিয়ে উৎক্ষিপ্ত হলো শূন্যে। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল ঠিক একটা বর্শার মত, ইঞ্জিন চুরমার করে দিয়ে ড্যাশবোর্ড ভেঙে, তার-টার ছিড়ে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। খুঁটির ভাঙা, সুচাল মুখটা স্থির হলো জনির কলজে থেকে ঠিক আধ সেন্টিমিটার দূরে।

ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার দিল জনি। আরেকটু হলেই সে বর্শাবিদ্ধ হয়ে যেত। হুইলের পেছন থেকে হাঁচড়ে পাঁচড়ে নামতে গিয়ে ভাঙা খুঁটির খোঁচা খেয়ে বুকের চামড়া ছিলে গেল ওর। খোলা দরজা দিয়ে একটা বস্তার মত ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

থেমে গেছে গাড়ি। ইঞ্জিনের আয়ু শেষ। মাটিতে তেল গড়িয়ে পড়ছে। বাতাসে পেট্রলের গন্ধ। জমিনে চিৎ হয়ে পড়ে রইল জনি। ফোঁপাচ্ছে। জানে পালাতে পারবে না। ও দেশ হাতও যেতে পারবে না, বাড়িটা ওকে খুন করে ফেলবে। যদি বারান্দা থেকে খুঁটি ছুটিয়ে নিয়ে বর্শার মত ছুঁড়তে পারে, তা হলে ওটা স্প্লিন্টারও ছুঁড়ে মারতে পারবে কিংবা ছররা গুলির মত কাঠের ছিলকা যা ওর দফারফা করে দেবে।

আকাশে তাকাল জনি। ঘন কালো মেঘ ছেয়ে আছে। থমথমে চেহারা। নিজেকে আর মুক্ত মানুষ ভাবতে পারছে না ও। ও এখন বন্দি।

তোমার প্রথম কাজ, বলল বাড়িটি, *বারান্দা মেরামত করা।*

দক্ষিণ দিকে একটা চালাঘরে কিছু লাকড়ি এবং কাঠ পাবে। ওগুলো দিয়ে ভবিষ্যতেও কাজ চালাতে পারবে। আমার পেছন দিকে প্রচুর গাছপালা আছে। শুধু পূর্ণবয়স্ক গাছগুলোই কাটবে। তবে যত্ন নিয়ে। ফলের গাছে হাত দিয়ো না। ওগুলো ভবিষ্যতে তোমাকে খাবার জোগাবে।

'কিন্তু আমি যদি তোমার হুকুম তামিল না করি?'

তা হলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনো।

জনি জোনসের কাজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারল না বাড়ি যদিও সে একজন দক্ষ ছুতার বা কাঠমিস্ত্রি।

তোমাকে আরও ভাল কাজ শিখতে হবে, জনিকে সতর্ক করে দিল ওটা।

জনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ গোমড়া রেখে কাজ করে। তবে বাড়িটা যা-ই বলুক নিজের কাজে সে খুশি। কারণ সে দেখতে পাচ্ছে তার কাজের উন্নতি হচ্ছে। বাড়িটি যে-ই তৈরি করুক না কেন অত্যন্ত দক্ষ হাতে বানানো হয়েছে। দোতলার ঘরগুলোতেও কারুকাজ করা কামরা রয়েছে।

এ বাড়ির বেশিরভাগ ঘরের চেহারাই সাদামাটা তবে কামরাগুলোর কাঠের মধ্যে কীরকম যেন একটা অনুভূতি মিশে আছে। সে বাড়িটির গায়ে হাত বুলায়, রেইলিং কিংবা পিলার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। কোনটিতেই রং করা নেই, নগ্ন কাঠ আগাগোড়া মোমপালিশ দেয়া।

বাড়িটি সারাক্ষণই নড়াচড়া করছে। বেশিরভাগ সময় মৃদুভাবে কম্পন তুললেও হঠাৎ হঠাৎ ক্যাচকোঁচ শব্দ করে ওঠে, তিমির মত পিঠ দোলায়। তখন জনির মনে হয় এটি কোনও জন্তু, জড় পদার্থ নয়। মাঝে মধ্যে এটার কথা বলার খায়েশ হয় এবং জলদগম্ভীর স্বরে জনির সঙ্গে বাতচিত করে। কথা

বলার সময় বাড়ির দরজা, ওক প্যানেলগুলোয় ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয়। এগুলো বাড়িটির ভোকাল কর্ড, প্রতিটি কামরা তার মুখ।

বাড়ির আটটি বেডরুমের চারটি বোঝাই মানুষের ব্যবহার উপযোগী নানান জিনিসপত্রে। সন্দেহ নেই বাড়ির মূল নির্মাতা এ ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ক্যানভর্তি প্রচুর খাবারদাবার আছে যা দিয়ে আগামী কয়েক বছর স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। বাড়ির পেছনের বাগানে আপেল, নাশপাতি এবং আলুবোখারার গাছ আছে। বৈঁচি এবং জাম গাছেরও কমতি নেই। এক চিলতে জমি রয়েছে যেখানে জনিকে আলু, বাঁধাকপি ইত্যাদি সব্জি ফলাতে নির্দেশ দিয়েছে বাড়ি। খালের মত যে নালাটা আছে ওটার পানি দিয়েই সে সব্জি খেতে পানি দিতে পারবে। বাড়িটি তাকে অনাহারে থাকতে দিতে চায় না আবার জনি বেশি খাওয়া দাওয়া করলেও আপত্তি জানায়।

এ বাড়ির চোখে ঘুম নেই। সারাক্ষণই বন্দির ওপর নজর রেখে চলেছে।

বাড়িতে কাবার্ড রয়েছে প্রচুর তবে একটির দরজা কখনও খুলে দেখা হয়নি। জনি চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, বাড়িটি তাকে জিজ্ঞেস করেছে সে কী করবে।

'ভেতরে কী আছে দেখতে চাই।'

কেন?

'কারণ...কারণ এই কাবার্ডটাই কেবল খোলা যায় না। মনে হয় তালা মারা। আমার দেখতে আগ্রহ হচ্ছে।'

ঠিক আছে। দেখো।

খুলে গেল কার্বাডের দরজা। ভেতরে একবার তাকিয়েই আঁতকে উঠে পিছু হঠল জনি। ভয়ে নিজের গলা চেপে ধরল। সরু কাবার্ডটির ভেতরে পড়ে আছে একটি মানুষের কংকাল–

বুকে কাঠের গোঁজ ঢোকানো। চক্ষুহীন কোটর তাকিয়ে আছে শূন্যে। দড়াম করে কার্বাডের দরজা বন্ধ করল জনি, চিৎকার দিল বাড়িটিকে উদ্দেশ্য করে।

'কী ওটা? আমাকে বলো!'

বাড়িটি বলল ওই কংকালটা তার শেষ গোলাম ছিল। বাড়ির নির্মাতা চলে যাওয়ার পরে ওই লোকটি এখানে ছিল। সে ছিল একজন হাইকার, ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে আসে এবং বাড়ির থাবায় আটকা পড়ে।

ও খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়। আমি ওকে আমার অনেকগুলো পকেটের একটিতে কবর দিই।

'তার মানে তুমি ওকে মেরে ফেলেছিলে!'

বাড়িটি কোনও জবাব দিল না।

'কী ভয়ঙ্কর...' চেঁচাল জনি।

ও তো একটা মরা মানুষ মাত্র। বলল বাড়ি। *ওকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।*

জনি বুঝতে পারছে একসময়ে ওই কাবার্ডের লোকটির নিয়তি তাকেও মেনে নিতে হবে।

পরদিন সে সব্জির বাগানে গেছে কাজ করতে, হাতের আঁকশিটা ফেলে দিয়ে দিল দৌড়। দুই মিটারও যেতে পারেনি, লম্বা, সাদা একটা শিকড় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে সাঁপের মত ধাওয়া করল ওকে, চট করে পেঁচিয়ে ধরল গোড়ালি। টান মারল। মাটিতে চিৎপাত হলো জনি। শিকড়টা ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল বাড়িতে। শাস্তি হিসেবে একটা ঘরে বন্দি থাকতে হলো ওকে দুটো দিন দানাপানি ছাড়া। বাড়িটি মনিব হিসেবে খুবই কঠোর, কোনও নয়ছয় সহ্য করে না।

তোমাকে যা বলা হয়েছে সে কাজই করবে, হুকুম দিল বাড়ি।

দুইদিন পরে বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেল জনি। সোজা গেল ভাঁড়ার ঘরে। ফেরার পথে হুট করে একটি কাবার্ডের দরজা খুলে যেতে কৌতূহলী হয়ে ভেতরে উঁকি দিল ও। কিন্তু ভেতরটা খালি।

'তুমি কাবার্ডের দরজা খুললে কেন?' জনি জিজ্ঞেস করল বাড়িটিকে।

আমি তোমাকে দেখাতে চেয়েছি, জবাব দিল বাড়ি।

'কিন্তু ওখানে তো কিছু নেই।'

এখন নেই বটে। তবে ওটা তোমার জন্য– যদি তুমিও তাড়াতাড়ি মরে যাও।

এ হুমকি গেঁথে রইল জনি জোনসের মস্তিষ্কে।

একদিন সন্ধ্যায়, বারান্দায় বসে আছে জনি, বাড়িটিকে জিজ্ঞেস করল তার ফাউণ্ডেশন বা ভিতটা কোথায়। বাড়ি বলল ওর ভিত হলো শিকড়, অনেকটা গাছের মত, মাটির গভীরে গেঁথে আছে। ওইরকম একটা শিকড়ই সেদিন জনির পা পেঁচিয়ে ধরেছিল যখন ও পালাবার মতলব করেছিল।

দৃশ্যটি মনে পড়তে শিউরে উঠল জনি। তবে ভাবটি গোপন রাখল চেহারায়। যে জিনিসটা ওকে আটকে রেখেছে সেটাকে ওর মনে হচ্ছে অক্টোপাসের মত কোনও দানব প্রাণী যার রয়েছে বিরাট বিরাট শুঁড়। এ শুঁড়ের অবস্থান মাটির নিচে। এখানকার গাছগুলোও বাড়িটির অংশ, এর শিকড় থেকে জন্মায়। বাড়িটি যেন স্বয়ম্ভু, নিজে থেকেই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজিয়ে বাস্তু তবে আকার-আকৃতি ঠিক রাখতে মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তার ক্ষৌরকর্ম করাতে হয়, স্যাণ্ড পেপার দিয়ে মসৃণ রাখতে হয় সুরত, সবশেষে মোমপালিশ লাগে। বাড়ি কোনও দর্শনার্থীকে ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেয় না। তাই তো তার ছাদে কৌনও পাখি

বসতে পারে না, রান্নাঘর কিংবা অন্য কোথাও ইঁদুরের উৎপাত নেই। এমনকী একটা পিঁপড়া কিংবা তেলাপোকাও চোখে পড়েনি দেয়ালের ফাঁক ফোকরে। কীট পতঙ্গ চোখে পড়লেই সেগুলোকে পিষে মারে এ ভয়ঙ্কর বাড়ি।

অনেকদিন বাড়িটিতে থেকে জনি জোনসেরও যে খানিকটা উপকার হয়নি তা নয়। আগে সে স্থূলকায় ছিল। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম তার অতিরিক্ত মেদ চর্বি ঝরিয়ে তাকে সুঠাম একটি শরীর উপহার দিয়েছে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তার কোনও বন্ধন নেই। বাবা মাকে হারিয়েছে গাড়ি দুর্ঘটনায়, তার গার্লফ্রেণ্ড তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কাজেই আপনার বলে জনির কেউ নেই। কেউ তাকে মিসও করে না। সে একটি ক্যারাভান সাইটে কাজ করতে কর্নিশ কোস্টে যাচ্ছিল, মাঝপথে এ বাড়ির কবলে পড়তে হলো।

'তোমাকে কে বানিয়েছে?' বাড়িকে জিজ্ঞেস করল জনি।

কিছু একটা।

'কে সে? কী তার নাম?'

তার কোনও নাম নেই।

'সে– সে কি কোনও মানুষ?' জানতে চায় জনি।

প্রায় মানুষ।

শীতল একটি জলধারা যেন নেমে যায় জনির শিরদাঁড়া বেয়ে। একটা কথা মনে হতে সে প্রশ্ন করে, এ বাড়িটি কি কোনও ফাঁদ– ইঁদুরের ফাঁদের মত এটা কি প্রায় মানুষের মত প্রাণীর জন্য মানুষ ধরে?'

এ প্রশ্নের জবাব মিলল না। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল জনি। সে এতদিনে বুঝতে পেরেছে বাড়িটির সঙ্গে চাতুরী করে তার দুর্বলতা জানতে চেয়ে লাভ নেই, তাই সে সবসময় সরাসরি প্রশ্ন করে। বাড়িটিও সরল এবং সোজাসুজি জবাব দেয়। যেমন

এখন দিচ্ছে।

'তুমি কি কিছুতে ভয় পাও?' জানতে চাইল জনি।

আগুন, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল বাড়ি। *আমি আগুন খুব ভয় পাই।*

এ তথ্য জনির কাজে লাগত যদি এখানে আগুন জ্বালানোর কোনও উপায় থাকত, কিন্তু নেই।

দুই বছর পার হলো। এই দুই বছরে বহুবারই পালাবার পথ খুঁজেছে জনি জোনস। উপায় খুঁজে পায়নি। শীতকালে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছিল, যদিও দেয়ালে কম্পন তুলে বাড়িটি উষ্ণ রাখার চেষ্টা করেছে ঘর। কোনওমতে টিকে গেছে জনি। তবে শীতে ভয়ানক কষ্ট হয়েছে ওর।

বাড়িটির কিছু কিছু জিনিস জনির নজর কেড়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যাগুলো খুঁজতে গিয়ে সে সলিড কাঠের তৈরি হলওয়ের মসৃণ, কাষ্ঠ নির্মিত ব্যানিস্টারে হাত বুলাতে গিয়ে লক্ষ করেছে দেয়ালের গায়ে কাঠের আঁশ বিন্যাস বাদামী নদীর মত প্রবাহিত হয়ে সিলিং-এর খিলানে গিয়ে মিশেছে। কাঠের নট এবং বলয়গুলো স্রোত ও কুণ্ডলীর রূপ নিয়েছে। এখানে রয়েছে শক্ত স্ট্যানশন, খাড়া জাহাজের মাস্তুল এবং কিছু অপূর্ব সুন্দর কারুকাজ করা বাট্রেস বা দেয়ালের ঠেকনা, যা ভেতরের দেয়ালগুলোর সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে।

গোটা বাড়িই তৈরি হয়েছে একজন অত্যন্ত দক্ষ কারিগরের হাতে। এর দরজা এবং ফ্রেমগুলো একটি অপরটির সঙ্গে সমতলবর্তী, কাঠের গোঁজ ঠেক দিয়ে রেখেছে কাঠের কব্জা, তাতে উদ্ভিজ্জ তেল মাখানো। টুকরো করে কাটা বীমগুলো ঠেকিয়ে রেখেছে ছাদ। দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। এ বাড়ির সবকিছুর মধ্যেই ভারসাম্য রক্ষার একটি প্রচেষ্টা রয়েছে।

বাড়িটির এ নির্মাণশৈলী জনিকে মুগ্ধ করে কিন্তু যখনই মনে পড়ে সে এখানে বন্দি, ভাল লাগা পরিণত হয় নিরানন্দে।

অবশেষে সে একদিন পালাবার একটা বুদ্ধি বের করে ফেলল।

সে প্রতিদিন একটু একটু করে, বেশ সময় নিয়ে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে প্রবহমান খাল বা নালাটিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। সে যখন গাছ থেকে ফল পাড়তে যায়, কিংবা সব্জি খেতে কাজ করে, টুপ করে একখণ্ড পাথর ফেলে দেয় নালায়। ধীরে ধীরে নালা যখন বাড়ির বদলে নতুন আরেকটি গতিপথ দেখতে পেল, সেদিকে প্রবাহিত হতে শুরু করল। আর পানির অভাবে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল বাড়ি। এর বেঁচে থাকার জন্য প্রচুর তরল পদার্থের প্রয়োজন হয়। আর ওদিকে বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নালাটি অন্য দিকে ঘুরে যেতে এদিকের পানি ক্রমে কমে আসছিল।

কী ঘটছে? বলল বাড়িটি। *বুঝতে পারছি না কেন এমন ক্লান্ত লাগছে শরীর।*

জনি মিথ্যা কথা বলে ধরা খাওয়ার ঝুঁকিতে গেল না। 'মনে হয় তুমি যথেষ্ট পরিমাণ পানি পাচ্ছ না,' বলল সে। 'ওই নালায় আজকাল বেশি পানিও নেই। গরমে বোধহয় শুকিয়ে যাচ্ছে নালা।'

আমাকে আরও পানি এনে দাও।

'তুমি বললেই তো আমি পানি এনে দিতে পারব না,' বলল জনি। 'নালায় পানিই যদি না থাকে তবে কোত্থেকে এনে দেব? তুমি বর্ষাকালের জন্য অপেক্ষা করো।'

অসন্তোষ নিয়ে গজগজ করল বাড়ি। তবে সেই রাতে খানিক বৃষ্টিপাত হলে সে আর কোনও অভিযোগ করল না।

মাসখানেক পরে দীর্ঘ একটা সময় ধরে দেখা দিল খরা।

বৃষ্টির একদমই দেখা নেই। জনি বাড়িকে বলল, 'অনাবাদী জমিটার ওদিকে নালাটার পানি প্রবাহ কোথাও আটকে গেছে কি না দেখে আসব একবার?'

বিড়বিড় করে বাড়ি বলল জনিকে কিছু একটা করতেই হবে, নইলে সে আর টিকতে পারবে না।

ধুকপুক বুকে জনি একটা কোদাল নিয়ে হাঁটা দিল পতিত জমির দিকে, নালার শুকিয়ে যাওয়া গতিপথ ধরে এগোচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে সে তার মনিবের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, শিকড়ের নাগাল ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অবশেষে বাড়ি ডাকল ওকে, *অনেক দূরে চলে গেছ তুমি– আর যেয়ো না।*

ঠিক তখন হাতের কোদাল ফেলে দিয়ে জনি দে ছুট। কয়েক মুহূর্ত পরে কাঠের বিরাট একটা চাকলা ওর কানের পাশ দিয়ে শিস তুলে সামনের ঘাসের চাপড়ায় ছিটকে পড়ল।

ফিরে এসো নইলে তোমাকে আমি খুন করব, হুংকার ছাড়ল বাড়ি।

জনি এখন সুদেহী এবং চমৎকার ফিট তার শরীর, সে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। স্বাভাবিক অবস্থায় হলে বাড়ির ছোঁড়া মিসাইল মোটেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না কিন্তু অনেকদিন ধরে পানির অভাবে সে বেজায় দুর্বল হয়ে পড়েছে তাই নিখুঁত লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না।

আরও কয়েকটি কাঠের টুকরো জনির প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল। সে এক মুহূর্তের জন্যও দৌড়ে ঢিলে দিল না, বাড়ির হুমকি কানে তুলল না, প্রার্থনা করছে গায়ে যেন মিসাইলগুলো না লাগে। অবশেষে সে উড়ন্ত অস্ত্রগুলোর নাগালের বাইরে চলে গেল এবং দাঁড়িয়ে পড়ে বেদম হাঁপাতে লাগল। ঘুরল জনি। বাড়িটির উদ্দেশে মুঠি পাকাল। 'কেমন কাঁচকলা! অভিশাপ দিই তুমি পানির অভাবে শুকিয়ে মরো। আর কোনওদিন আমার

টিকিটিও দেখতে পাবে না তুমি জেনে রাখো!'

তারপর সে খুশি মনে হাঁটা দিল। হাঁটতে হাঁটতে একটি রাস্তা পেয়ে গেল। ওই রাস্তা ধরে পৌঁছে গেল শহরে।

ওই বাড়িতে আর কোনওদিনই ফিরে যাবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জনি জোনস। যেতও না যদি না সেদিন সন্ধ্যায় একটি পাবে কতগুলো লোকের সঙ্গে সে ঝগড়ায় জড়িয়ে না পড়ত। সে ভুতুড়ে বাড়িটিতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিল লোকগুলোকে। কিন্তু তারা কেউ তার কথা বিশ্বাস করছিল না। একজন তো তাকে মিথ্যাবাদী বলে চ্যালেঞ্জ করেই বসল।

'ঠিক আছে,' বলল মাতাল জনি। 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কোনওদিন ওই বাড়িতে ফিরে যাব না কিন্তু তোমরা দু'একজন যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজি থাক তা হলে আমি আরেকবার ওখানে ঢুঁ মারতে পারি। তবে সঙ্গে অস্ত্র নিতে হবে নইলে বাড়িটি আমাদেরকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে।'

'কী ধরনের অস্ত্র?' যে লোকটি ওকে মিথ্যাবাদী বলেছিল সে নাক কুঁচকে জানতে চাইল।

'পেট্রল,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল জনি। 'এবং দেশলাই।'

ছোট দলটি একটি গাড়ি নিয়ে বডমিন মুরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। ড্রাইভার জনির দিক নির্দেশনায় গাড়ি চালাচ্ছে। নেশা কেটে গেছে বলে জনির এখন উৎকণ্ঠা জাগছে। মনের মাঝে ফিরে আসছে সেই পুরানো ভয়। বাড়িটি খুবই শক্তিশালী কোনও প্রাণী বা সৃষ্টি। হয়তো আগুন দিয়েও ওকে কব্জা করা যাবে না। সঙ্গে লোকজন থাকলেও ভয় পাচ্ছে জনি। বাড়িটি যদি ওকে আবার থাবায় পুরতে পারে তা হলে জনির যে কী দশা হবে! না, জনি তা কিছুতেই হতে দেবে না।

বাড়ি থেকে বেশ কয়েকশ' মিটার দূরে থাকতেই ড্রাইভারকে

গাড়ি থামাতে বলল ও। এতদূর থেকে চাঁদের আলোয় ওটাকে তেমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

'যাও তোমরা গিয়ে দেখে আসো,' বলল জনি। 'আমি এখানেই আছি।'

'তুমি কীসের ভয় পাচ্ছ?' দলের একজন ভর্ৎসনা করল ওকে। 'ওটা তো স্রেফ কাঠের একটা বাড়ি ছাড়া কিছু নয়।'

'বললাম তো তোমরা গিয়ে দেখে আসো,' পুনরাবৃত্তি করল জনি।

লোকগুলো গাড়ি থেকে নামল। জনিকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে করতে এগোল বাড়ির দিকে। ওদেরকে যেতে দেখছে জনি, গাড়ির ইঞ্জিন চালুই রইল, অবস্থা বেগতিক দেখলেই চম্পট দেবে। তবে ওকে অবাক করে দিয়ে বহাল তবিয়তে ফিরে এল দলটি। বেশ হাসাহাসিও চলছে। তারা গাড়িতে এসে বসল।

'ওটা স্রেফ খালি এবং পুরানো কুটির ছাড়া কিছু নয়,' বলল একজন। 'তুমি বেহুদাই ওখানে আমাদেরকে পাঠালে...অথচ তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম...'

'আমি করিনি,' বলল সেই লোকটি যে জনিকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। 'জানতাম ও আমাদেরকে খোঁচাচ্ছে।'

জনি ওদের ঠাট্টা-তামাশা সহ্য করতে না পেরে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ধীর পায়ে এগোল বাড়িটির দিকে। লোকগুলোর কথা শুনে ধন্ধে পড়ে গেছে। কাছে আসতেই মনে হলো বাড়িটি খালি এবং ফাঁকা। এ যেন বাড়ি নয়, বাড়ির একটা খোলস, যাতে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। শুকনো এবং শক্তিহীন, নির্বীর্য।

'ওটা মরে গেছে,' আপন মনে বলল জনি। 'পানির অভাবেই বাড়িটির মৃত্যু হয়েছে।'

ওইসময় গাড়িটি সগর্জনে চলে গেল, লোকগুলো

শেষমুহূর্তেও জনিকে লক্ষ্য করে অপমান আর বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়ে দিল।

জনির একবার ইচ্ছে করল গাড়ির পেছন পেছন ছুটে যায়, বলে ওকে তুলে নিতে। কিন্তু দশ মিটারও যেতে পারেনি, তার আগেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল দলটা।

'যত্তসব বাজে লোক!' গালি দিল জনি।

বাড়ির দিকে ফিরল জনি। ওটাকে ভাল করে লক্ষ্য করছে। এই প্রথম একটি চিন্তা মাথায় খেলল। এ বাড়িটা বিক্রি করলে ভাল পয়সা পাওয়া যেতে পারে। এর মালিক কেউ নয়– এখানে কেউ থাকেও না। কাজেই এটিকে সে নিজের বাড়ি বলে দাবি করলে ক্ষতি কী? কেউ তাকে বাধা দিতে আসবে না। এ বাড়ি এখন মরা কাঠ মাত্র, পুষ্টির অভাবে এর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, এটাকে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়া যাবে সহজেই।

'ওরকম একটা বাড়ি বিক্রি করে যা পয়সা পাব,' বিড়বিড় করল জনি, 'তাতে আগামী কয়েক বছর খাওয়াপরার আর ধান্ধা না করলেও চলবে।'

সে মন্থর পদক্ষেপে চলে এল সদর দরজার সামনে। দরজাটার একটি কব্জা খুলে পড়ে ঝুলে আছে। এ বাড়ি বিক্রি করার আগে বেশ কিছু মেরামতি না করলেই চলবে না দেখছি, ভাবছে জনি।

সে কাঠের সিঁড়িতে পা রাখল। এ সিঁড়ি চলে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। তবে পায়ের নিচে কাঠ আর আগের মত মোলায়েম কিংবা মোটা কার্পেটের মত ঠেকল না। শক্ত এবং নিরেট। মৃত কাষ্ঠ। বারান্দা ধরে এগিয়ে গেল জনি। এটা সেটা দেখছে, নিশ্চিত হতে চাইছে কোথাও শুকনো, কিংবা ভিজে পচা কাঠ রয়েছে কি না। অবশেষে সে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করল ভেতরে।

হলওয়েতে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জনি। চাঁদের আলোয় চারপাশে তাকাতে তাকাতে সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেল যেদিন সে প্রথম এসেছিল এখানে। জোছনায় কড়িকাঠের লাল কাঠ যেন জ্বলজ্বল করছে। খোলা দরজা এবং জানালা দিয়ে ঢুকছে চাঁদের আলো। মেঘের ছায়া পড়ছে বাড়িটির ওপর। সবকিছু স্থির এবং মৃত্যুর মত শান্তিময়।

তারপর হঠাৎ, একটা আওয়াজ, অস্পষ্ট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ভেঙে গেল নৈঃশব্দ।

লাফিয়ে উঠল জনির কলজে, নিজেকে বোঝাল এই বলে সমস্ত বাড়িতেই এরকম নানান্ শব্দ হয়, এমনকী মৃত বাড়িতেও।

ওখানে দাঁড়িয়ে একটা কামরার খোলা দরজায় তাকাল ও। ঘরের জানালা দিয়ে ওপাশে অনাবাদী জমিটা দেখা যাচ্ছে, সেই সঙ্গে চকচকে রুপোলি কী একটা ঝিলিক দিল অমল ধবল জোছনায়। সাপের মত আঁকাবাঁকা ওই রুপোলি ফিতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জনি, অকস্মাৎ বুঝতে পারল কী দেখছে। নালা– সেই নালা! কেউ নালার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং ওটা আবার তার পুরানো গতিপথে ফিরে গেছে। তার মানে কী বাড়িটা আবার পানি পান করতে পারছে? যখন পানি আছে ওটা কি এখন নিজে নিজেই বেঁচে উঠবে? কে জনির তৈরি পাথরের বাঁধটি সরাল?

জনি চট করে ঘুরল। খোলা দরজা দিয়ে তাকাল রাস্তায়। ওর সহজাত প্রবৃত্তি বলছে ছুটে পালাতে, এ জায়গা থেকে কেটে পড়তে। ভাগো, ভাগো, ভাগো।

হলওয়ের পেছনের ছায়া থেকে খড়মড় আওয়াজ ভেসে এল। পেট ঠেলে আসা চিৎকারটাকে কোনওমতে ঠেকিয়ে রাখল জনি। সে ছুটতে চাইছে কিন্তু পা জোড়া নাড়াতে পারছে না।

তুমি তা হলে ফিরে এলে? বলল কেউ বা কিছু।

না, এটা বাড়ির কণ্ঠস্বর নয়। সেই গভীর গলা নয়, ওক প্যানেলও কাঁপল না এ স্বর শুনে। এটি উচ্চ নিনাদের অস্থির একটি গলা। চোখ কুঁচকে তাকাল জনি। ওখানে কিছু একটা আছে, পুরানো শিকড়ের রঙ– তেমন লম্বা নয়, খুব একটা মসৃণ নয়, কিছু একটা...তবে মানুষ নয়। ওটা আবার চিৎকার দিল। কান ফাটানো, কুৎসিত একটা নিনাদ, তাতে অভিযোগের হিংস্রতার মিশেল।

তুমি আমার বাড়ির কী করেছ?

পড়িমরি করে ছুট দিল জনি জোনস।

বিকুর

বিকুরগুলো সব খেয়ে ফেলেছে, শুধু ঠোঁট, চ্যাপ্টা পা এবং কিছু সাদা পালক ছাড়া। এমি রহমানের নজরেই প্রথম পড়ল হাঁসটির শরীরের অবশিষ্টাংশ।

ও রয়েছে কিচেন গার্ডেনে, বিশাল দেয়াল ঘেরা এলাকার মধ্যে সবজির খেত এবং নুড়ি বিছানো রাস্তা। ও লাথি মেরে পালকগুলো সরিয়ে ফেলল যাতে কারও চোখে না পড়ে। তারপর তুলে নিল ঠোঁট এবং পা। উঁচু ইটের দেয়ালের অপর পাশে, বাগানের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটি মোটরওয়ে। ও আবর্জনাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল দেয়ালের ওপাশে। মোটরওয়ের কিনারায় পড়বে টুকরো ঠোঁট এবং পা, কেউ লক্ষ করবে না। কাপড়ে হাত মুছে ফেলার ইচ্ছে দমন করে কিচেনে ছুটল এমি পরিষ্কার হতে।

ও জানে হাঁসটাকে হত্যার জন্য বিকুররাই দায়ী। রহমান পরিবারের প্রহরী অ্যালসেশিয়ান টমিকে খুব ভালভাবে শেখানো হয়েছে হাঁস মুরগির ধারে কাছেও না ঘেঁষতে। আর ফার্মের বেড়ালগুলোর বহু আগে থেকেই জানা খামারবাড়ির রাজহাঁস, হাঁস, মুরগি এবং টার্কিগুলোর সঙ্গে শক্তিতে তারা পেরে উঠবে না। বিকুরদের এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য অপরাধ বোধে ভুগছে এমি। কারণ সে-ই জন্তুগুলোকে ওদের ফার্মে নিয়ে এসেছিল। তবে ওর বাবা এজন্য ওকে কখনও বকাঝকা করেননি, কিন্তু যখনই বিকুরগুলো কোনও হাঁস অথবা মুরগি হত্যা করেছে,

ধাওয়া করে কামড়ে দিয়েছে ভেড়ার গায়ে অথবা মেরে ফেলেছে কোনও ভেড়ার বাচ্চা কিংবা তাড়া দিয়ে নাকাল করেছে গরুগুলোকে, প্রতিবারই এমির মনে হয়েছে এসবের জন্য ও-ই দায়ী।

বছরখানেক আগে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিকুরদের রাস্তায় দেখতে পায় এমি। মেইন রোড থেকে বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটছিল ও পথ শর্টকাট করার জন্য। রাস্তাটি চলে গেছে কারখানার মাঝ দিয়ে, তারপর অকস্মাৎ মোড় নিয়েছে একটা মেঠো পথে। এর একপাশে জঙ্গল, অপর পাশে একটি প্রাকৃতিক পার্ক যেটি বিস্তৃত হয়েছে মোটরওয়ে ছাড়িয়ে শহর অভিমুখে। এখানে, পার্কের মধ্যে জনৈক আর্লের প্রকাণ্ড একটি বাড়ি ছিল। এখন ওটার মালিক কাউন্সিল। বাড়িটিকে তারা নেচার রিজার্ভ হিসেবে ব্যবহার করছে। আর্লের হোমফার্ম বা গার্হস্থ্য খামারটি হয়ে ওঠে ট্যুরিস্ট আকর্ষণ এবং জঙ্গলটি রূপ নেয় স্থানীয় ছেলেমেয়ে ও সারমেয়দের খেলার জায়গা হিসেবে। ভিক্টোরিয়ান সময়ে গড়ে ওঠা ফার্মটি তারা সংস্কার করেছে, সেকালের একটা আবহ ধরে রাখার চেষ্টাও আছে তবে দিন-রাত মোটরওয়ে ধরে চলাচল করা গাড়ি ঘোড়ার শব্দ বন্ধে কোনও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

এমি সিঁড়ি বেয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল তবে তারপর ঘোড়া চলাচলের (এদিক দিয়ে মোটর গাড়ি চলা নিষেধ) মূল রাস্তায় মোড় নেয়। এটি তাকে সোজা নিয়ে যাবে উডল্যাণ্ডের ভেতরে, ধ্বংসপ্রাপ্ত মঠ এবং হলি ওয়েল বা পবিত্র কুয়া ছাড়িয়ে তাদের খামার বাড়িতে। এ রাস্তাটি শুধু ঘোড়সওয়ার আর পথচারীরাই ব্যবহার করে। তবে এদিক দিয়ে এমির হাঁটতে ভাল লাগছিল না বলে সে অপেক্ষাকৃত সরু এবং আঁকাবাঁকা একটি পথ বেছে নেয় যেটি জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে গিয়ে লেকের ধারে মিশেছে।

ওখানে খুদে, বালুময় একটি বেলাভূমি আছে গাঢ় সবুজ রঙের ঝোপঝাড়ের নিচে। ওখানে এমি ওই বস্তাটি দেখতে পায়। পানিতে পড়ে আছে, বস্তার ভেতর থেকে কুঁইকুঁই আওয়াজ আসছিল। সে বেলাভূমিতে নেমে পড়ে বস্তাটি উদ্ধার করার জন্য।

এমি ভেবেছিল বস্তার মধ্যে বিড়ালের বাচ্চা আছে। তবে ওগুলোর সঙ্গে বিড়াল বাচ্চার মিল থাকলেও চেহারা কেমন অদ্ভুত–গায়ের রং লালচে হলুদ, ডোরা কাটা এবং ভোঁতা নাক। তবে ওইসময় জানোয়ারের বাচ্চাগুলোর বিদঘুটে চেহারা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি এমি। এদেরকে কেউ বস্তায় পুরে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিল, এ ভাবনাটি তাকে সবিশেষ ক্রুদ্ধ করে তোলে। এমি হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ে ঢাল বেয়ে এবং অত্যন্ত সাবধানে বাচ্চাগুলোকে বাড়ি বয়ে আনে। বাড়ির আস্তাবলে একটা মা বিড়াল আছে, বাচ্চাসহ। ওদের সঙ্গে এগুলোকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা এমির। মা বিড়াল নিশ্চয় তার সন্তানদের সঙ্গে এদের যত্ন নেবে।

ফার্ম ইয়ার্ডে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এমির। সে নুড়ির ওপর বস্তা রেখে একে একে বের করে আনে বাচ্চাগুলোকে। খবরটা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। স্থানীয় চায়ের দোকানে চা খেতে আসা মহিলারা দল বেঁধে আসে এমির আবিষ্কার দেখতে। তার বাবাও আসেন সঙ্গে একজন মালিকে নিয়ে, দৌড়ে আসে গিফটশপের দোকানী মেয়েটাও। বছরের ওই সময়ে ফার্মে দর্শনার্থীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না– একটি জাপানী ট্যুরিস্ট পরিবার এবং মহল্লার কয়েকজন মা এসেছিল তাদের ছানাপোনা নিয়ে– তারা সবাই বাচ্চাগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চোখ বড়বড় করে দেখছিল। সবাই এ বিষয়ে একমত হয় যে এগুলো নিশ্চয় বিড়ালজাতীয় কোনও প্রাণী হবে।

'বনবেড়ালও হতে পারে,' মন্তব্য করে একজন।

'ধূসর,' এমির বাবা সিরাজ রহমান বলেন, তিনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন বনবিড়ালের গায়ের রঙ ধূসর হয়, এরকম লালচে হলুদ হয় না।

এমির বাবা প্রথমে জন্তুগুলোকে তাঁর আস্তাবলে জায়গা দিতে চাননি কিন্তু মেয়ের জেদের কাছে তাঁকে শেষতক পরাস্ত হতেই হয়। তাঁদের বড় আদরের মেয়ে এমি। একমাত্র ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর পরে আর কোনও সন্তানের আশা যখন ছেড়েই দিয়েছিলেন রহমান দম্পতি, দশ বছর বাদে তাঁদের কোল আলো করে জন্ম নেয় ফুটফুটে এমি। এমির জন্ম লণ্ডনে, তবে দুই-তিন বছর অন্তর তাঁরা মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে এমির দাদা-দাদীর বাড়ি ঘুরে আসেন যাতে মেয়ে তার শিকড় ভুলে না যায়। এমিকে তাঁরা বাঙালি সংস্কৃতিতেই মানুষ করছেন। রহমান সাহেব বহুদিন ধরে এ দেশে। তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এমির পড়াশোনা শেষ হলে এখানকার পাট চুকিয়ে চিরতরে দেশে চলে যাবেন এবং সাভারে একটি খামার বাড়ি গড়ে তুলবেন। সেজন্য তিনি ওখানে জমিও কিনে রেখেছেন।

এমির জেদের কারণে অদ্ভুত জন্তুগুলোকে বিড়াল মায়ের তত্ত্বাবধানে রাখতে গিয়ে পরদিন সকালে দেখা যায় বিড়াল বাচ্চাগুলো সব মরে পড়ে আছে, তাদের গায়ে অসংখ্য কামড়ের দাগ, লোমে শুকিয়ে আছে রক্ত। ওগুলো কীভাবে মারা গেল তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত থাকলেও এমি নিশ্চিত ইঁদুর ওদের প্রাণসংহার করেছে। রহমান সাহেব মেয়ের সঙ্গে তর্কে না গেলেও তাঁর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি এ যুক্তি মেনে নেননি। আর বিড়াল বাচ্চা কীভাবে অক্কা পেল তা নিয়ে এমির মা এমিলি রহমানের মোটেই আগ্রহ ছিল না। তিনি ফার্ম দেখাশোনা এবং সংসারের যাবতীয় কাজ করতে গিয়েই হাঁপিয়ে যান, এসব ফালতু

বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় তাঁর?

এমির উদ্ধার করা জন্তুগুলো নিজেদের মত করে বেড়ে উঠছিল। তবে ওগুলো যে কী ধরনের জন্তু তা-ই ঠাহর করতে পারছিল না কেউ। 'ওগুলো মোটেই বিড়াল নয়,' চায়ের দোকানের বেটি বলল একদিন। 'বিড়ালের চেহারা এরকম হয় না।'

সিরাজ রহমান ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওগুলোকে পরখ করেন। সন্ধ্যার পরে ফার্ম বন্ধ করে তাঁর কর্মচারীরা চলে যায় এবং দর্শনার্থীরাও আর আসে না। একটি নিচু দেয়াল আলাদা করে রেখেছে চায়ের দোকান এবং রহমান সাহেবদের বাড়িটিকে। সেদিন তিনি দেয়ালের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে, হাতে ধূমায়িত চায়ের মগে চুমুক এবং মাঝে মাঝে বউয়ের বানানো আলুর চপে কামড় দিতে দিতে অদ্ভুত চেহারার প্রাণীগুলোকে দেখছিলেন। সঙ্গে ছিল এমি। বাচ্চাগুলো মা বিড়াল এবং কুকুর টমির সঙ্গে খেলা করছে।

'ওদের দাঁতগুলো বিড়ালের মত নয়,' বললেন তিনি। 'বরং কুকুরের দাঁতের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় এমি। 'ওদের নাকগুলোও অনেক খাড়া খাড়া। কুকুরের মত।'

এমিলি রহমানও বাপ-মেয়ের সঙ্গী হয়েছেন আরেক কাপ চা নিয়ে। তিনি মন্তব্য করেন, 'তবে ওদের গায়ের পশম ডোরা কাটা বিড়ালের মতই কিন্তু।'

ওরা দেখে পাঁচটা বাচ্চা টমির সঙ্গে হাঁটছে। একটা কুকুরটার পেছন পেছন পা টিপে টিপে আসছে, দুটো চলে এল সামনে, বাকি দুটো দুইপাশে পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে। টমি নাক নামিয়ে, লেজ নাড়তে নাড়তে ওদের গায়ের গন্ধ শুঁকল। একটা বাচ্চা ওর পেছনের পায়ে কামড় বসাতেই কেউ করে উঠল টমি।

'ওরা বিড়ালের চেয়েও ফাজিল,' বললেন রহমান সাহেব।

এমি বলল, 'ওরা কিন্তু সিয়ামিজ বিড়ালের মত দেখতে। কালো কান, কালো পা, লেজের ডগায় কালো ফুটকি।'

'সিয়ামিজদের অমন ঝোপের মত লেজ থাকে না।'

'না, তবে কুকুরদের চোখও তো সবুজ হয় না।' বাচ্চাগুলোর সবার চোখ ঝকঝকে সবুজ অথবা হলদে।

'আর থাবাগুলোও কীভাবে গুটিয়ে নিতে পারে দেখেছিস,' বললেন এমির বাবা। 'বিড়াল ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর পক্ষে এভাবে থাবা গোটানো সম্ভব নয়।'

'আর ওরা কিন্তু বিড়ালের মতই মিউ মিউ করে,' বললেন মিসেস রহমান।

মাথা নাড়লেন সিরাজ রহমান। 'কিন্তু ওরা ঘেউ ঘেউ করেও ডাকে তবে ঠিক কুকুরে-ডাক নয়। অনেকটা শেয়ালের মত। আর শিকার ধরে– শিকার ধরে নেকড়ের ক্ষিপ্রতায়। দ্যাখো!'

বাচ্চাগুলো উঠোনে একদল রাজহাঁসকে ঘিরে ফেলেছে। বিরাট বিরাট রাজহাঁস যারা ক্যাঁক ক্যাঁক ডাক ছেড়ে মানুষের দিকে দল বেঁধে ছুটে গেলে লোকে পালাবার পথ পায় না, এরা বিড়াল বা কুকুর কাউকেই পাত্তা দেয় না, সেই অকুতোভয় প্রকাণ্ড পাখিগুলো এই কিম্ভূত চেহারার খুদেগুলোর ভয়ে ডানা ঝাপটে, প্যাক প্যাক শব্দে নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর না বিড়াল না কুকুর প্রাণীগুলো মাটির সঙ্গে প্রায় পেট মিশিয়ে তাড়া করল পলায়নপর দলটাকে। ওদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শরীরটা শিরশির করে উঠল এমির: ওগুলোর নড়াচড়ার মধ্যে অশুভ, ভয়ানক কিছু একটা আছে।

দুটো রাজহাঁস এবং একটা হাঁস মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন, পাঁচটা বাচ্চা একযোগে তাদের মনোযোগ ফেরাল এই ছোট দলটির দিকে। দুটো এগিয়ে গেল একদিক থেকে, তৃতীয়টা অন্য

পাশ দিয়ে, এদিকে বাকি দুটো পেছনে থাকল। যেন তাদের হামলা করার ইচ্ছা নেই। আসলে এটা ছিল ওদের একটা কৌশল। তিনটা ভীতিকর চেহারার প্রাণীকে এগিয়ে আসতে দেখে ভীত হাঁস তার সঙ্গীদের কাছ থেকে দলছুট হয়ে দিশাহারার মত দৌড় দিল। আর এ সুযোগটাই কাজে লাগাল পেছনে পড়ে থাকা বাচ্চা দুটো। তারা তাড়া করল হাঁসটিকে, খোঁয়াড়ের দিকের কিনারে কোণঠাসা করে নিয়ে যাচ্ছে।

'আরি, করে কী! করে কী!' দেয়াল থেকে লাফিয়ে নামলেন সিরাজ রহমান, চায়ের মগ আর চপের প্লেট এমির হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছুটে গেলেন উঠোনে, হাতে জোর চাপড় মারছেন, নুড়ি বিছানো জমিনে পা ঠুকছেন। চমকে গিয়ে সৃষ্টিছাড়া চেহারার বাচ্চাগুলো দ্রুত একত্রিত হলো এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তিনি ওদেরকে তাড়িয়ে আর্চওয়েতে নিয়ে গেলেন। খিলানঢাকা এ পথটি দেয়াল ঘেরা ফার্ম ইয়ার্ড থেকে বিশাল কিচেন গার্ডেনের দিকে চলে গেছে। ওগুলোকে তাড়িয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে কয়েক মিনিট বাদে ফিরে এলেন সিরাজ সাহেব।

'আমার হাঁস মুরগির ওপর ওদেরকে হামলার সুযোগ দেয়া যাবে না কিছুতেই,' এমির কাছ থেকে চায়ের মগটি নিয়ে বললেন তিনি।

'তবে ওদেরকে কিন্তু আমার ভারী পছন্দ হয়েছে,' বলল এমি। 'হাউ কিউট!'

'কিউট না ছাই! কতগুলো কিম্ভূত।' মুখ বাঁকালেন এমিলি। 'আচ্ছা ওগুলোর কোনও নাম নেই?'

'ওরা না কুকুর না বিড়াল।' চায়ের মগে চুমুক দিলেন সিরাজ সাহেব। 'এদেরকে কী নাম দেয়া যায় ভাবছি।'

'আমি কিন্তু একটা নাম ঠিক করে রেখেছি,' হাসল এমি। 'বিকুর।'

'বিকুর?!' সমস্বরে অবাক হয়ে প্রশ্নটা করলেন রহমান দম্পতি।

'বিড়ালের বি আর কুকুরের কুর- বিকুর,' বলল এমি। 'আইডিয়াটা আমি সুকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়াটি থেকে পেয়েছি- হাঁস ছিল সজারু ব্যাকরণ মানি না...'

'হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না,' সুর মেলালেন এমিলি।

'বাহ্, মন্দ হয়নি নামটা- বিকুর।' মাথা দোলাচ্ছেন রহমান। 'ওদের চেহারার সঙ্গে একদম খাপ খেয়ে গেছে। বেড়ে নাম দিয়েছিস, মা।'

'থ্যাংকস, বাপি,' কেতাদুরস্ত কায়দায় বো করল এমি।

তবে এই বিকুরগুলো, এমির কাছে যারা 'কিউট' এবং 'বিউটিফুল', যত বড় হতে লাগল ততই ওদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা ফার্ম ইয়ার্ড ছেড়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গল এবং মাঠে। তাদের সুরত ইদানীং খুব কমই দেখা যায় তবে তারা নিজেদের উপস্থিতি বেশ ভালভাবেই জানান দেয়- যেমন আজ একটা টুকরো করা হাঁস দেখতে পেল এমি। খামারের ছোট আকারের জার্সি গরুগুলোকে মাঝে মাঝে দেখা যায় বেদম হাঁপাচ্ছে, যেন কিছুর তাড়া খেয়েছে। একদিন একটি সদ্যোজাত ভেড়ার বাচ্চাকে পাওয়া গেল আধখাওয়া অবস্থায়। মৃত বাচ্চাটির এহেন দশা দেখে আশপাশের মানুষজন অতিশয় ক্ষুব্ধ হলো- বিশেষ করে সেই খামারি যার খামারের বাচ্চা এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এসব কার কাজ এমি এবং তার বাবা ঠিকই বুঝতে পারছে।

সিরাজ সাহেব বিকুরগুলোকে মেরে ফেলতে চান। খাবারে বিষ মিশিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তবে একটি শো ফার্মে তা

সম্ভব নয়। কারণ এখানে ট্যুরিস্টরা আসে তাদের কুকুর এবং বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেলতে। রাতের বেলা শটগান দিয়ে বিকুরদের গুলি করাও ঝুঁকি– শব্দে লোকে আপত্তি করতে পারে। জানোয়ারগুলোর ভয়ে এখন প্রতিরাতে খোঁয়াড়ে হাঁস-মুরগি-ভেড়াদেরকে তালা মেরে রাখতে হয়।

'তোমার আজ হিথ্রো যাওয়ার কথা, মনে আছে?' স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মিসেস রহমান।

মনে আছে মি. রহমানের। তিনি তাঁর খামারে দুর্লভ সব গরু-বাছুর-ভেড়ার সংকর জাত উৎপাদন করেন। তার এক বন্ধু আছে আইসল্যাণ্ডে। সে তিনটা দুর্লভ জাতের আইসল্যাণ্ড ভেড়া নিয়ে আসবে কথা দিয়েছে রহমান সাহেবকে। তিনি তাঁর সেই বন্ধু, সভেন ইভারসেনকে আজ নিয়ে আসতে যাবেন হিথ্রো বিমানবন্দরে। তিনি যে এলাকায় থাকেন সেখান থেকে লণ্ডন শহর অনেক দূর। তাই আজ আর ফিরছেন না রহমান সাহেব।

বাবা লণ্ডন যাবে শুনে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত এমি। মার সঙ্গে রাতে একা থাকতে ওর মজাই লাগে। বাবা যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, লোকজনের ভিড়, হাউ কাউ লেগেই আছে। কিন্তু উনি দূরে কোথাও গেলে বাড়িটা চিৎকার-চেঁচামেচিশূন্য হয়ে কেমন সুনসান একটা চেহারা পায়। চারপাশটা আশ্চর্য নীরব হয়ে যায়। ওই জঙ্গল থেকে যে কেউই ওদের খামার বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়তে পারে। একা একা জঙ্গলের মধ্যে রাতের বেলা শুধু সে আর তার মা, ভয় ভয় লাগলেও একটা রোমাঞ্চিত শিহরণও জাগে এমির দেহ-মনে।

এমি সাধারণত বেশ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। কর্মচারী এবং ভিজিটররা আসার আগেই ফার্ম ঘিরে সে একটা চক্কর দেয়। শুধু ভোরবেলা আর সন্ধ্যার সময় তার মনে হয় এ ফার্মটি তাদের

নিজেদের।

রাতের বেলা সমস্ত ফটক থাকে বন্ধ, প্রকাণ্ড ফার্ম ইয়ার্ডটি চারপাশে উঁচু উঁচু ভবন নিয়ে পরিণত হয় দুর্গে। হাতে চাবি নিয়ে আর্চওয়ে ধরে এমি এগোয়, খুলে ফেলে বড় দরজাটি। এ দরজার ওপাশে ফুলের বাগান যেখানে বসে ভিজিটররা 'খামারবাড়ির চা' পান করে। বাগান ঘেঁষে একটি রাস্তা ফটক ধরে সোজা চলে গেছে অপেক্ষাকৃত বড় কিচেন গার্ডেনের দিকে। এখানে সারারাত পাহারা দেয় টমি। বাগানের দেয়ালে ছোট একটি গেট আছে, খোলা থাকে সবসময় যাতে কুকুরটি কোনও অনাহূত শব্দ বা আওয়াজ পেলে যখন তখন আসা যাওয়া করতে পারে শব্দের উৎস সন্ধানে। কিচেন গার্ডেনে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে টমির নাম ধরে ডাকল এমি।

ওর ডাক শুনে ছুটে এল না টমি। অবাক হলো না এমি। কুকুরটা হয়তো কোথাও আছে, মাঠে কিংবা জঙ্গলে। ও হাঁটতে হাঁটতে চলে এল গেটে, খামারের ভবনগুলোর চারপাশে একটা চক্কর দেবে, নাশতা খেতে ফেরার আগে একবার জঙ্গলও ঘুরে আসতে পারে।

গেটের বাইরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে টমি। দেখামাত্র বুঝে গেল এমি মারা গেছে কুকুরটা; পাগুলো শক্তভাবে ছড়ানো। পেছনের একটা পা কেমন বেখাপ্পা ঠেকল এমির কাছে। ভাল করে তাকাতে বুঝতে পারল ওখানকার মাংস ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে হাড়। ঝট করে ঘুরল এমি, দৌড় দিল। বাগান, আর্চওয়ে, উঠোন পার হয়ে ছুটতে ছুটতে চলে এল বাড়িতে, তারস্বরে ডাকছে মাকে।

এমি দূরত্ব বজায় রাখল, ওর মা উবু হয়ে বসলেন টমির পাশে। লাশটা ওল্টালেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন।

‘তোমার কাছে চাবি আছে?’ জিজ্ঞেস করলেন মিসেস রহমান। ‘চালাঘরের তালাটা খোলো।’

বাগানের গেটের ঠিক পেছনে, দেয়ালের ধারে কাঠের একটি চালাঘর আছে। এমি ওটা খুলল। ঘুরে দেখে ওর মা টমির লাশ টানতে টানতে নিয়ে আসছেন। ও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। প্রিয় কুকুরটির জন্য চোখ ফেটে জল আসছে।

চালাঘরে টমির লাশ ঢোকাল এমিলি। মেয়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে বন্ধ করে দিলেন দরজা। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ‘লাশটাকে তো আর ট্যুরিস্টদের দেখার জন্য রেখে দেয়া যায় না, তাই না?’ চালাঘর থেকে একটা কোদাল নিয়ে টমির লাশ যেখানে পড়েছিল, রক্তমাখা সেই জমিন কুপিয়ে দিলেন। এখন আর বোঝার উপায় নেই এ জায়গার মাটিতে রক্ত লেগে ছিল।

‘ওকে কে মেরেছে?’ কাঁপা, শোকার্ত গলায় প্রশ্ন করল এমি।

এমিলি রহমান মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকালেন, হয়তো একমুহূর্তের জন্য ভাবলেন ওকে সত্যি কথাটা বলবেন কি না। তারপর বললেন, ‘ওই বিকুরগুলো ছাড়া আর কে মারবে? একটা অ্যালসেশিয়ানকে হত্যা করার হিম্মত এখানকার আর কোনও জানোয়ারের আছে? যাক, এ নিয়ে কাউকে কিছু বোলো না। আগে তোমার বাবা আসুক। চলো, এক কাপ হট চকোলেট করে দিই তোমার জন্য।’

এমি গরম চকোলেট খেল এক কাপ। কিন্তু তার খুব একটা স্বাদ লাগল না। মনটা বিষণ্ন। মা বলেছেন ভালো না লাগলে ওকে আজ স্কুলে যেতে হবে না। কিন্তু স্কুল ব্যাগ গুছিয়ে স্কুলে রওনা হয়ে গেল এমি। ঘরে বসে থাকতে ভাল্লাগছে না।

তবে জঙ্গুলে পথ ধরে অর্ধেক পথও যেতে পারল না ও, ছমছম করে উঠল গা। এ জঙ্গলের নাম ইংলিশ উড়স। বনের মাঝ দিয়ে চওড়া পথ চলে গেছে। তবে এত সকালে রাস্তাটা

খুবই নির্জন থাকে। মানুষজনের চলাচল নেই, একজন ঘোড়সওয়ারও চোখে পড়ল না। বহুবার এ পথ ধরে একা গেছে এমি। এমন ভয় কখনও লাগেনি। বারবার মনে পড়ছে বিকুরগুলো জঙ্গলের কোথাও লুকিয়ে আছে। তারা যদি টমির মত অতিকায় একটি কুকুরকে অমনভাবে মেরে ফেলতে পারে যে কি না শক্তিতে এমির চেয়ে অনেক বেশি বলবান ছিল...

ঘুরল এমি। দ্রুত পা চালাল বাড়ি অভিমুখে। ভাগ্যই বলতে হবে ফেরার পথে বিকুরগুলো ওকে ধাওয়া করল না কিংবা তাদের হাঁক চিক্কুরও শুনতে পেল না ও। দিনের অর্ধেকটা সময় ও কাটিয়ে দিল ওদের গ্রোসারি দোকানে। এখানে মনিহারী জিনিসপত্র বিক্রি হয়। ক্রেতা প্রায় সবাই আশপাশের মানুষজন এবং খামারবাড়ির বিচিত্র জাতের সব পশুপাখি দেখতে আসা ট্যুরিস্টরা। এমির বাবা দুর্লভ প্রজাতির হাঁস-মুরগি-ভেড়া-গরু ইত্যাদির হাইব্রিড উৎপাদন করেন তাঁর খামারে। এগুলো এ এলাকা ঘুরতে আসা ট্যুরিস্টদের অন্যতম আকর্ষণ বৈকি। এমি মাঝে মধ্যে দোকানে বসে। দোকানে তাদের কর্মচারী আছে। তবে আজ সে এসেছে শুধুমাত্র টমি এবং বিকুরদের কথা ভুলে থাকতে। যদি কাজের মধ্যে ডুবে থেকে ওদের কথা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়...। ও অপেক্ষা করছে কখন বাবা আসবেন।

এমির বাবা ফিরলেন বেলা তিনটায়। এমি খুব খুশি এবং উত্তেজিত। একটা ভ্যান এসে থামল খামারের সামনে। তা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন সিরাজ রহমান। গেট খুলতে বলছেন। ফার্ম ইয়ার্ডের প্রকাণ্ড ফটক খুলে গেল। ভ্যান ঢুকল ভেতরে। উঠোনের একপাশে সার বাঁধা জানোয়ারের খোলা শেডের ধারে গিয়ে থামল। রহমান সাহেব নতুন কোন্ প্রজাতির প্রাণী নিয়ে এসেছেন দেখার জন্য ওখানে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেল। এদের

মধ্যে এমি এবং তার মা-ও আছে।

ভ্যানের পেছন থেকে নামিয়ে আনা হলো তিনটে ভেড়া। আকারে ছোটখাট, গা ভর্তি ধূসর-বাদামী পশম। পুরুষ ভেড়াটার মাথায় বাঁকানো মস্ত শিং।

তিনি কৌতূহলী দর্শকদের পেছনে সরে যেতে বললেন ভেড়াগুলোকে শেডের মধ্যে রাখার জন্য। তাঁকে এ কাজে সহায়তা করলেন মধ্য পঞ্চাশের এক বিদেশি ভদ্রলোক। ভেড়াগুলোর জন্য দানাপানির ব্যবস্থা করে আগন্তুকের সঙ্গে এমি ও তার মাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সিরাজ রহমান। 'সভেন– এ হলো আমার অতি প্রিয় স্ত্রী এমিলি রহমান এবং এটি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মেয়ে এমি রহমান।'

এমির বাবা বেশ লম্বা। ছ'ফিটের ওপরে। তাঁর চেয়ে একহাত খাটোই হবেন সভেন। মাথার বাদামী চুল পাতলা হয়ে টাক ধরে গেছে। ভদ্রলোকের হাসিটি বেশ মিষ্টি, শিশুর সারল্য মাখানো।

'ভেরি প্লিজড টু মিট ইউ,' এমিলি এবং এমির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে হাসিমুখে বললেন তিনি। তাঁর ইংরেজিতে মার্কিনি টান।

বাবাকে টমির কথা বলার জন্য উসখুস করছে এমি। কখন সুযোগ পাবে বুঝতে পারছে না কারণ তিনি সভেনকে এখনই খামার ঘুরিয়ে দেখার জন্য হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাধা দিলেন এমিলি। 'সভেন সাহেবকে এখন ছাড়ো তো!' মৃদু ভর্ৎসনা করলেন তিনি স্বামীকে। 'কতটা পথ বয়ে এসেছেন। উনি একটু বিশ্রাম করুন। চা-টা দিই। তারপর ওঁকে নিয়ে ঘুরতে যেয়ো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সভেনকে ছেড়ে দিলেন সিরাজ সাহেব। পা বাড়ালেন বাড়িতে।

তাঁদের অতিথি যখন হাতমুখ ধুতে ব্যস্ত, এই ফাঁকে এমিলি এবং তাঁর মেয়ে সিরাজ সাহেবকে বললেন কী ঘটেছে। সভেন বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখেন তাঁর বন্ধুটির মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে, জানালার ফ্রেমে মুষ্ট্যাঘাত করছেন। সিরাজ সাহেবের এহেন চেহারা দেখে ভয়ই পেয়ে গেলেন সভেন। ভাবলেন হিসু করার কথা বলে আবার বাথরুমে সেঁধুবেন কি না।

সভেনের শুকনো চেহারা দেখে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এমিলি। 'আপনি বসুন। আসলে হয়েছে কী আমার স্বামী বাইরে থাকার সময় একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাদের কুকুরটা মারা গেছে।'

সামনে এগিয়ে এলেন সভেন। 'আপনাদের কুকুর। শুনে খুব দুঃখ পেলাম!' তিনি এমির দিকে তাকালেন। সে চেহারায় সাহসী একটা ভাব আনতে চাইছে। 'গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে?'

'না, বিকুররা ওকে খুন করেছে!' বলে উঠলেন সিরাজ রহমান। হতভম্ব দেখাল সভেনকে।

'বিকুর! সে আবার কী?'

'বিড়াল আর কুকুরের সংমিশ্রণের এক উদ্ভট জন্তু,' ব্যাখ্যা দিলেন রহমান। 'তুমি তো পশু চিকিৎসক। এক নজর দেখলেই নিশ্চয় বলে দিতে পারবে আমাদের টমি কীভাবে মারা গেছে।' স্ত্রীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'মিলি, টমিকে কোথায় রেখেছ? শেডে? চলো, সভেন। শেডে যাই।'

বন্ধুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন রহমান সাহেব। তাঁদের সঙ্গী হলেন এমিলি এবং এমি। এমি অবশ্য ক্ষত-বিক্ষত টমির লাশ আবার দেখতে চায় না। কিন্তু একা ঘরে থাকতেও ভয় লাগছে।

শেডের দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন মিসেস রহমান। টমিকে তাঁরও আবার দেখার খায়েশ নেই। মি. রহমান

তাঁর বন্ধুকে নিয়ে চালাঘরে ঢুকলেন। সভেন কুকুরটির লাশের পাশে বসে ওকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এমি দাঁড়িয়ে থাকল খানিকটা তফাতে, ওদের পিঠের দিকে তাকিয়ে। শুনল সভেন বলছেন, 'কুকুরটার গায়ে অসংখ্য কামড়ের দাগ দেখছি।'

দুই পুরুষ সিধে হলেন। বেরিয়ে এলেন শেড থেকে। সভেন শেডের দরজা বন্ধ করে জমিনে চোখ নামালেন।

'তো...তোমার কী মনে হলো?' জিজ্ঞেস করলেন রহমান।

'কুকুরটা কতগুলো জন্তুর হামলার শিকার হয়েছে,' জবাব দিলেন সভেন। 'অন্য কুকুররা তাকে কামড়ে মেরে ফেলেছে।'

মি. এবং মিসেস রহমান পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। 'বললাম না বিকুর,' বললেন রহমান সাহেব।

'এই বিকুরটা আসলে কী জিনিস?' ওদের দিকে তাকালেন সভেন।

'বিড়াল আর কুকুরের একটা সংকর,' পুনরাবৃত্তি করলেন রহমান। 'আমার মেয়ে ওদের নাম দিয়েছে বিকুর।' তিনি এমির দিকে তাকালেন যেন আশা করছেন ও এসে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে।

দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল এমি। 'বিকুর মানে বিড়ালের বি আর কুকুরের কুর– দুই মিলে বিকুর। বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায় নামে খুব বিখ্যাত এক ছড়াকার ছিলেন। তিনি "খিচুড়ি" নামে একটি ছড়া লিখেছিলেন–'

এমি খিচুড়ির প্রথম কয়েকটি লাইন ইংরেজিতে তর্জমা করে শোনাল বিদেশি অতিথিকে। সভেন ছড়া শুনে রীতিমত মুগ্ধ। বারবার বলতে লাগলেন, 'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!'

ওঁকে বাধা দিলেন এমিলি। 'তবে এ জন্তুগুলো কিন্তু সুকুমার রায়ের "হাতিমি" কিংবা "বকচ্ছপ"-এর মত নয়। এদেরকে দেখতে পুরোপুরি কুকুর বা বিড়াল কোনওটাই মনে হয় না।'

'এদের দাঁত কুকুরের মত,' বললেন সিরাজ সাহেব। 'তবে থাবাগুলো বিড়ালের মত।'

হাত তুললেন সভেন। 'এবং ওদের গায়ের রঙ লাল–শেয়ালের মত লাল।'

'জি,' সায় দিলেন এমিলি। 'তবে বিড়ালের মত গায়ে ডোরাকাটা দাগ।'

অদ্ভুত ব্যাপার, বিকুর-এর বর্ণনা শুনে সভেনকে দেখে মনে হলো তিনি যেন বেশ অস্বস্তিতেই পড়ে গেছেন। তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'স্কফিন!'

রহমান দম্পতি সমস্বরে বলে উঠলেন, 'কী?'

'স্কফিন,' আবার বললেন সভেন। 'আপনারা যাদের নাম দিয়েছেন বিকুর।'

স্বামী-স্ত্রী মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। রহমান সাহেব বললেন, 'ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সভেন। 'ঘরে চলো। বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ঘরে ঢুকে ওদের জন্য কফি বানালেন এমিলি, সবাই বসলেন কিচেনে। সভেনের দিকে তাকালেন প্রত্যাশা নিয়ে। তাঁকে বিব্রত লাগছে। 'আপনারা হয়তো আমার কথা শুনে হাসবেন। এমনকী আইসল্যাণ্ডেও লোকে এ বিষয়টি নিয়ে মাঝে মধ্যে হাসাহাসি করে, তবে তারা রেইকযাভিক শহরের শহুরে বাবু, আমাদের মত গ্রাম্য চাষা নয়...'

'আমরা হাসতে পছন্দ করি,' বললেন রহমান সাহেব। 'তুমি বলোই না।'

'তোমাদের কুকুরটা কিন্তু হাসেনি।' গম্ভীর দেখাল সভেনের চেহারা। 'তোমরা একপাল স্কফিন পেলেপুষে বড় করেছ। এবং এরা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রাণী।'

'স্কফিনটা কী?' প্রশ্ন করল এমি।

সভেন এমির দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলেন, 'আইসল্যাণ্ডে প্রচুর নির্জন ফার্ম আছে...আর আছে অসংখ্য শেয়াল। অনেক সময় খেঁকশেয়ালি এসে মিলিত হয় খামারের হুলো বেড়ালের সঙ্গে-'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন রহমান সাহেব। চড়াৎ করে চাপড় বসিয়ে দিলেন টেবিলে। হাসতে হাসতে বললেন, 'এ অসম্ভব!' সভেন আবার এমির দিকে তাকালেন। 'মিলিত হয়ে খেঁকশেয়ালি চলে যায়, জন্ম নেয় বাচ্চা। ওদেরকে বলে স্কাগাবল্ডার। এরা যেমন হিংস্র তেমনই চতুর। খুবই দুর্লভ একটি প্রজাতি তবে তারা বাগে পেলে ভেড়া, কুকুর সব মেরে ফেলে...খুবই বিপজ্জনক প্রাণী। কৃষকরা তখন দল বেঁধে এদেরকে গুলি করে মারে।'

'কিন্তু স্কফিন?' জানতে চায় এমি।

মাথা ঝাঁকালেন সভেন। 'মাঝে মধ্যে খামারের মাদী বিড়াল মিলিত হয় কুকুর-শেয়ালের সঙ্গে। তাদের যে বাচ্চাগুলো হয় ওরাই স্কফিন। তবে আইসল্যাণ্ডে এরা কখনও বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। ওদেরকে দেখলেই কৃষকরা মেরে ফেলে। স্কফিনরা স্কাগাবল্ডারের চেয়েও অনেক চালাক-চতুর এবং দ্বিগুণ হিংস্র। তোমরা নিজেদের অজান্তেই এতদিন একপাল স্কফিন পুষেছ।'

আবার অট্টহাসি দিলেন সিরাজ রহমান। 'ও তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, এমি। সুকুমার রায়ের ছড়া শুনে বানিয়ে বলছে। বিড়াল এবং শেয়াল কখনও মিলিত হতে পারে না। ওরা সমগোত্রীয় পরিবারভুক্ত নয়।'

'আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না,' আপত্তি করলেন সভেন। 'আর এই ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে আমি ঠাট্টা করতে যাব কেন, অ্যাঁ?' তিনি এমির দিকে তাকালেন। 'তোমার ওই সুকোমার-'

'সুকুমার রায়,' শুধরে দিল এমি।

'রাইট। সুকোমার রে। সুকোমার রে,' মুখস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন সভেন। 'দুর্দান্ত একটি ছড়া লিখেছেন। জানি না তিনি স্কফিন দেখেছেন কি না। তবে এখন মনে হচ্ছে তুমি ওদের ঠিক নামই দিয়েছ– বিকুর। সেই হাঁস– হাঁস–'

'হাঁসজারু,' ধৈর্য ধরে বলল এমি।

'এগজ্যাক্টলি। মি. রে'র হাঁসজারুর মতই এই স্কফিনরা মানে তোমার বিকুর– না বিড়াল না কুকুর। এদের কুকুরের মত দাঁত, বিড়ালের মত থাবা।' এমিলির দিকে নজর ফেরালেন তিনি। 'শেয়ালের মত গায়ের রঙ লাল, শরীরে বিড়ালের মত ডোরা কাটা দাগ। নেকড়ের মত দল বেঁধে শিকার করে...এবং মস্ত একটা কুকুরকেও মেরে ফেলে।'

এমিলি সভয়ে বললেন, 'এমি প্রতিদিন জঙ্গলের ওই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায়।'

সিরাজ রহমান এক মুহূর্ত চুপ রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমি কখনও "ল্যাম্পিং"-এর কথা শুনেছ, সভেন?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন আইসল্যাণ্ডার।

'কোনও বাতি বা টর্চ নিয়ে তুমি রাতে বেরুবে। যদি কোনও খরগোশ, শিয়াল অথবা স্কফিন চোখে পড়ে– চট করে জ্বালিয়ে দেবে আলো। চোখে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ওরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে–'

'তারপর ওদেরকে তুমি গুলি করে মারবে, তাই তো?' বললেন সভেন। 'তোমার বন্দুক আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন সিরাজ রহমান।

পুরোপুরি আঁধার ঘনাবার পরে ওঁরা প্রস্তুত হলেন। রহমান সাহেব হাতে নিলেন শটগান এবং পকেট ভর্তি কার্তুজ। সভেনের সঙ্গী

বড়সড় একটি ইলেকট্রিক টর্চ, এবং আলো গোপন করার জন্য কভার।

'তুমি যাবে?' জিজ্ঞেস করলেন রহমান সাহেব।

মাথা দোলাল এমি।

'না, না, ওর যেতে হবে না,' আপত্তি করলেন এমিলি।

'আমরা তো আর বাঘ শিকারে যাচ্ছি না। ওরা ছোট ছোট কতগুলো জন্তু। আকারে শেয়ালের চেয়েও বড় নয়,' বললেন রহমান। তিনি ছোটবেলা থেকে এমিকে নিয়ে বনে বাদাড়ে শিকারে যাচ্ছেন। শিকারের নেশা রহমান সাহেবের রক্তেই মিশে আছে। তাঁর দাদা খান বাহাদুর একরামউল্লাহ শেরে বাংলা ফজলুল হকের সঙ্গে সুন্দরবন এবং আসামের ঘন জঙ্গল দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার পিতা আবদুর রহমান তাঁকে নিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে গিয়ে বন্য বরাহ শিকার করেছেন। সেসব রোমাঞ্চকর দিনগুলো রহমান সাহেবের স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বলে। এই যে জঙ্গলের মধ্যে তিনি খামার বাড়ি দিয়েছেন তা শুধু পয়সা কামাইয়ের জন্য নয়, অ্যাডভেঞ্চারের নেশাও এর সঙ্গে জড়িত। ছেলেকে সাত বছর বয়সেই পাখি শিকারের বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন হাতে। কিন্তু বান্দরবানে একবার অজগর শিকারে গিয়ে ছেলেটা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। ঢাকার সেরা হাসপাতালে ভর্তি করেও তাকে বাঁচানো যায়নি। অন্য কোনও বাবা হলে হয়তো আর শিকারের নামই নিতেন না। কিন্তু অভিযানপ্রিয় সিরাজ রহমান তাঁর একমাত্র মেয়েকে লুতুপুতু করে ঘরে বসিয়ে রাখার পাত্রই নন। তাই স্ত্রীর নিষেধ না মেনে এমিকে নিয়ে তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে হাইকিং করেছেন। তাই চোদ্দ বছর বয়স হলে কী হবে, এমি এখনই বেশ পাহাড় বাইতে পারে, বাপের কাছ থেকে শটগান চালানোও শিখেছে। বিকুরদের ভয় করলেও অমন ডরপুক নয় এমি যে ওদের ডরে দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকবে।

তা ছাড়া টমির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে না? তাই মায়ের আপত্তি শুনে সে দৃঢ় গলায় বলল, 'আমার কোনও সমস্যা হবে না, মা। আমি বাপি আর আংকেলের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব।'

স্ভেনও এমিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বললেন, 'ওরা কিন্তু শেয়ালের চেয়ে বড়, রহমান। ওজনও বেশি।'

'তাতে কী হলো?' বললেন রহমান সাহেব। বাঘ-ভল্লুক তো আর নয়। তা ছাড়া আমাদের এমির বাঘ-ভল্লুকে ভয় নেই, তাই না, মা?'

সোৎসাহে মাথা ঝাঁকায় এমি। তবে ও জানত না ওর এই উৎসাহ একটু পরেই প্রবল নিরুৎসাহে পরিণত হবে। এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে ওর জন্য। তখন ওর মনে হবে এত সাহস না দেখালেই বুঝি ভাল ছিল।

এমি ওর বাবা এবং স্ভেন আংকেলের পেছন পেছন ঘর থেকে বেরুল। ফার্ম ইয়ার্ড পার হয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে।

অন্ধকারে ট্র্যাক অনুসরণ করা প্রথম দিকে খুব একটা কঠিন ছিল না তবে ওরা যখন খালের ওপরের কাঠের সেতুটা পার হয়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়ল, যেখানে দু'পাশে ঘন পাতার দেয়াল, মাথায় বাড়ি খাচ্ছে ডালপালা, ভালভাবে পথও ঠাহর হয় না, যাত্রাটা বেশ কঠিন হয়ে উঠল। অন্ধকারে পায়ের নিচের জমিন দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না বলে প্রতি পদক্ষেপে ওরা হোঁচট খেল, পা জড়িয়ে গেল গাছের শিকড়ে, কাঁটাগাছের ঝোপে আটকে ধরল ওদের পরিধেয়, চলতে দিচ্ছে না। পথ হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ডালের বাড়ি খেল ওরা মুখে, চুলে আটকে গেল পাতা, ওরা চমকে পিছু হঠল। এসব বাধা ওদেরকে সুস্থিরভাবে এগোতে ঝামেলার সৃষ্টি করছে। চারপাশের জঙ্গল নীরব, নিস্তব্ধ হলেও গাছের ডালের বাড়ি খেয়ে কিংবা গর্তে পা হড়কে পড়ে ওদের উঃ আঃ অস্ফুট আর্তনাদে নির্জনতা বারবারই ভেঙে যাচ্ছিল...

ওদের সামনে এমির বাবার শটগান গাছের শাখায় বেধে যেতে তিনি গালি দিলেন। এমি বুঝতে পারছিল ওরা কেউই আসলে উপলব্ধি করতে পারেনি রাতের বেলা জঙ্গলে এভাবে পথ চলাটা এত কঠিন। সে তার বাবার সঙ্গে বনে বাদাড়ে ঘুরেছে বটে তবে দিনের বেলা। এমি টর্চের ওপরের কভারটা সরিয়ে ফেলল। আলোর মৃদু একটি রেখা পড়ল ওদের পায়ের কাছে। আলোকিত হলো শুকনো ডাল-পালা খড়কুটো আর পাতার জড়াজড়ি, কিন্তু কালিগোলা অন্ধকার তাতে দূর না হয়ে যেন ঘনীভূত হলো, সামনের পদক্ষেপগুলো আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আভাস দিল।

'আলো নেভাও!' খেঁকিয়ে উঠলেন এমির বাবা। প্রতিবাদ করল এমি। বাতি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ওর বাবা বললেন, 'আলো দেখলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে।' ওরা মানে বিকুর।

বাধ্য হয়ে টর্চের ওপর আবার কভার চাপিয়ে দিতে হলো এমিকে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসীম আঁধার গ্রাস করল ওকে। এবং নীরবতা প্রায় স্যাঁতসেঁতে বাতাসটার মত ওকে যেন চেপে ধরল। ওর সামনে, যদিও মনে হচ্ছে অনেক দূরে পায়ের চাপে শুকনো ডাল ভাঙা কিংবা পাতা গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার শব্দ হচ্ছে, ওর বাবা সরু রাস্তাটা দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছেন। তবে অন্য শব্দগুলো এমির মনোযোগ আকর্ষণ করল বেশি: মাথার ওপরে, গাছের ডালে বসা কোনও পাখি নড়েচড়ে উঠল, পাতার ফাঁক দিয়ে ফিসফিস করে বইল বাতাস; পথের পাশে ঝোপের ভেতরে কী একটা সরসর করে ছুটে গেল, সমস্ত শব্দই গিলে খেল গভীরতম নৈঃশব্দ।

ওর পেছন থেকে ভেসে এল সভেনের চাপা গলার ডাক 'এমি!' ঘুরল ও। সভেনকে দেখতে পাচ্ছে না। টর্চের ওপর

থেকে ঢাকনি সরিয়ে নিল এমি, নিজের জ্যাকেট দিয়ে ঢেকে দিল আলো যাতে বাবার চোখে না পড়ে। টর্চের সরু আলোকরেখায় জঙ্গলের অতি সামান্য অংশ আলোকিত হলো: একটা সবুজ পাতা দেখা গেল নড়ছে, ওটার চারপাশে শুকনো, ধূসর ডাল। আবার নেমে এল আঁধার। সভেনের গলার স্বর অনুসরণ করে এগোল এমি। নিচু একটা ডাল বাড়ি মারল ওর কপালে।

সভেন রাস্তায় নেই, পড়ে গেছেন হাঁটু সমান গভীর একটা কাঁটাঝোপের গর্তে। অতি অল্পসময়ের জন্য তাঁকে আলো দেখাল এমি যাতে কাঁটাঝোপ থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন নিজেকে।

'আইসল্যাণ্ডে,' কাঁটাঝোপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে, কাঁটার আঘাতে ছড়ে যাওয়া আঙুল মুখে পুরে চুষতে চুষতে বললেন তিনি, 'কোনও জঙ্গল নেই।' তিনি উঠে এলেন রাস্তায়। তাকালেন অন্ধকারে। মাথার ওপরে ডালপালা ছড়িয়ে একটা শামিয়ানা তৈরি করেছে, সভেন বুকে হাত বাঁধলেন। এমির মনে হলো মানুষটা কাঁপছেন। তিনি টর্চের আলোর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'গা ছমছমে,' বললেন সভেন।

মি. রহমানের পেছন পেছন ওরা এগিয়ে চলল বনের পথ ধরে। টর্চের আলো আবার ঢেকে রেখেছে এমি যাতে ওর বাবা বিরক্ত না হন। কিন্তু কোথায় তিনি? সাড়াশব্দ তো মিলছে না। এমি দাঁড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে। কান পাতল ওর বাবার পায়ের শব্দ শোনার জন্য। জঙ্গল আশ্চর্য নীরব। রহমান সাহেবও হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন কোথাও। সভেন মৃদু গলায় ডাকলেন, 'রাহমান!'

ওরা অপেক্ষা করছে কান খাড়া করে। কোনও সাড়া নেই। পেছন ফিরে তাকাল এমি। ভাবল ফার্মে ফিরে যাবে কি না। কিন্তু তাতে খামোকাই নষ্ট হবে সময়। ওর বাবা হয়তো ফিরে আসবেন শীঘ্রি। ওদের কাছে আলো আছে।

এমন সময় রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে ওদের ডান দিকে

গর্জে উঠল শটগান। গুলির আওয়াজে ভীত সন্ত্রস্ত এক ঝাঁক পাখি তীব্র চিৎকার করতে করতে উড়াল দিল আকাশে। ওরা দু'জনেই শব্দ লক্ষ্য করে এগোল। অনেক দূর থেকে যেন এসেছে শব্দটা। গুলির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেলেও পাখিদের প্রতিবাদী চিৎকার-চেঁচামেচি তখুনি থামল না। এরা হুটোপুটি করছে, ঝাপটাচ্ছে ডানা– তারপর আস্তে আস্তে ভীতিকর সমস্ত শব্দ ম্লান হয়ে আবার কায়েম হলো নৈঃশব্দের রাজত্ব। মাটিতে টর্চের আলো ফেলল এমি। আশা করল গুলির আওয়াজ যেদিক থেকে এসেছে ওদিকে কোনও রাস্তা দেখতে পাবে। কিন্তু রাস্তা একটাই এবং সেটা ওইদিকের পথ নয়। এমি রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড় ভেঙে চলতে লাগল। এ মুহূর্তে এটাই তার কাছে সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি মনে হচ্ছে। সভেন ওকে অনুসরণ করলেন। পায়ের নিচে পাতা মাড়িয়ে চললেন।

এ পথে বেঁটে বেঁটে কিছু গাছ আর কয়েকটি ঝোপ ছাড়া তেমন কিছু নেই– তবে অকস্মাৎই জমিন ঢালু হয়ে যাওয়ায় হোঁচট খেল এমি। প্রায় দৌড়ের মত সামনে এগোতে হলো ওকে, পিছলে গেল পা এবং ডিগবাজি খেয়ে পাতায় আচ্ছাদিত ঢাল বেয়ে নিচে পড়তে লাগল। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে মাটির গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। পতন ঠেকাতে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করল এমি, ফলে হাতের টর্চটার মায়া ত্যাগ করতে হলো ওকে। ওটা পেছনে পড়ে রইল।

যখন অবসান ঘটল পতনের, মুখ-হাত-পাসহ নানান জায়গা ছড়ে গেছে এমির, উপুড় হয়ে পড়ে আছে অন্ধকারে। হাত এবং হাঁটুতে ভর করে উঠে বসল ও। বুঝতে পারছে না কোথায় এসেছে। আগের রাস্তায় কীভাবে ফিরে যাবে তা-ও জানে না। জঙ্গল– খেলনার মত ছোট এই জঙ্গল যেখানে শহরের মানুষজন কুকুর নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে আসে– অকস্মাৎই মনে হলো

বিশাল। কণ্ঠ তুলতে ভয় পাচ্ছে বলে চাপা গলায় ও ডাকতে লাগল সভেনকে।

কোথাও থেকে– ভয়ের চোটে দিক তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে এমি– একটা শব্দ ভেসে এল যা ওকে বিদ্ধ করল তীরের মত। ও আতঙ্কিত জন্তুর মত চট করে শুয়ে পড়ল মাটিতে। একটা তীক্ষ্ণ, প্রলম্বিত চিৎকার। এমির নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল।

বাবা এবং সভেন আংকেলকে ডাক দিতে ইচ্ছে করছে এমির, তবে ভয়ে কোনও শব্দ করতে পারছে না। ও শরীর শক্ত করে শুয়ে রইল মাটিতে, জোরেও দম নিচ্ছে না, মিনিট তিনেক এভাবে শুয়ে থাকার পরে ওর মস্তিষ্ক আবার কাজ শুরু করে দিল। এখানে ও সারারাত এভাবে পড়ে থাকতে পারবে না। ও পাশ ফিরতেই ঝোপের মধ্যে আলোর একটি রেখা দেখতে পেল। সেই টর্চটি! হয়তো পতনের সময় সুইচে চাপটাপ খেয়ে জ্বলে উঠেছে। সামনে গাছের ডাল আর কাঁটার আঘাত অগ্রাহ্য করে ওটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল এমি। হাতটা বাড়িয়েছে টর্চের দিকে, আলোর কিনারায় একজোড়া খাড়া কান ধরা পড়ল চোখের কোণে। খপ করে টর্চটি ধরেই ওদিকে আলো ফেলল এমি। কিচ্ছু নেই।

বুকে বাতাস ভরে নিয়ে চেঁচাল ও, 'সভেন আংকেল!'

'এই তো আমি!' এমির বামপাশে সরসর, খড়মড় আওয়াজ তুলে অন্ধকার পাতাগুলোর ওপর দিয়ে ক্রল করে এগিয়ে এলেন সভেন। হোঁচট খেতে খেতে তাঁর কাছে গেল এমি। বসল পাশে। সভেন ওকে দেখে খুবই খুশি।

'আপনি শুনেছেন...ওই শব্দটা?'

স্বল্প আলোয় সভেনকে মাথা দোলাতে দেখল এমি। 'স্কফিন,' অন্ধকারে উঁকি দিলেন তিনি। 'আমাদের এদিকটাতে আসা উচিত

হয়নি। এখন কী করে বেরুব?'

এমি টর্চ ঘোরাল। এদিককার গাছপালা সব একই রকম দেখতে। কোথায় এসে পড়েছে বুঝতে পারছে না ও। 'জানি না আমি,' বলল এমি।

সিধে হলেন সভেন, মুখের সামনে হাত এনে হাঁক ছাড়লেন। 'রাহমান!' বৃক্ষসারি এবং আঁধারের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর ডাক। চমকে গিয়ে কিচমিচ করল কতগুলো পাখি, ঝাপটাল ডানা তারপর আবার নীরব হয়ে গেল। এমি, এখনও বসে আছে, অনুভব করল ওর চারদিকের জঙ্গল যেন কীসের আশঙ্কায় থমথম করছে। বাইরের ওগুলো জানে আমরা কোথায়, ভাবছে ও।

অন্ধকারের চেয়েও কালো কী একটা এমির পাশের ঝোপ দিয়ে দৌড়ে গেল। ও লাফ মেরে খাড়া হলো। টর্চ মারল ওদিকে। কিছু নেই। যদিও পাতাগুলো এখনও কাঁপছে।

'ডোন্ট!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল এমি। 'ডোন্ট শাউট এগেইন।'

সভেন চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললেন, 'ওরা ইতিমধ্যে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, এমি। আমাদের দু'জনকে এখন একত্রিত থাকতে হবে।'

সভেনের কথার মাজেজা উপলব্ধি করে ভয় পেল এমি। 'বাবার কী হবে?'

'ওর কাছে বন্দুক আছে।'

তা আছে কিন্তু শেষ গুলির আওয়াজ শোনার পর থেকে এমির বাবার আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। এ বনভূমি খুব বিস্তৃত বা বিশাল নয় যদিও অন্ধকারে ব্যাপ্তিটা সীমাহীন লাগছে। বাবা কি সভেন আংকেলের ডাক শুনতে পাননি? তা হলে জবাব দিচ্ছেন না কেন?

'চলুন, বাবাকে খুঁজি,' বলল এমি। ধীর গতিতে সামনে কদম

বিশাল। কণ্ঠ তুলতে ভয় পাচ্ছে বলে চাপা গলায় ও ডাকতে লাগল সভেনকে।

কোথাও থেকে– ভয়ের চোটে দিক তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে এমি– একটা শব্দ ভেসে এল যা ওকে বিদ্ধ করল তীরের মত। ও আতঙ্কিত জন্তুর মত চট করে শুয়ে পড়ল মাটিতে। একটা তীক্ষ্ণ, প্রলম্বিত চিৎকার। এমির নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল।

বাবা এবং সভেন আংকেলকে ডাক দিতে ইচ্ছে করছে এমির, তবে ভয়ে কোনও শব্দ করতে পারছে না। ও শরীর শক্ত করে শুয়ে রইল মাটিতে, জোরেও দম নিচ্ছে না, মিনিট তিনেক এভাবে শুয়ে থাকার পরে ওর মস্তিষ্ক আবার কাজ শুরু করে দিল। এখানে ও সারারাত এভাবে পড়ে থাকতে পারবে না। ও পাশ ফিরতেই ঝোপের মধ্যে আলোর একটি রেখা দেখতে পেল। সেই টর্চটি! হয়তো পতনের সময় সুইচে চাপটাপ খেয়ে জ্বলে উঠেছে। সামনে গাছের ডাল আর কাঁটার আঘাত অগ্রাহ্য করে ওটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল এমি। হাতটা বাড়িয়েছে টর্চের দিকে, আলোর কিনারায় একজোড়া খাড়া কান ধরা পড়ল চোখের কোণে। খপ করে টর্চটি ধরেই ওদিকে আলো ফেলল এমি। কিচ্ছু নেই।

বুকে বাতাস ভরে নিয়ে চেঁচাল ও, 'সভেন আংকেল!'

'এই তো আমি!' এমির বামপাশে সরসর, খড়মড় আওয়াজ তুলে অন্ধকার পাতাগুলোর ওপর দিয়ে ক্রল করে এগিয়ে এলেন সভেন। হোঁচট খেতে খেতে তাঁর কাছে গেল এমি। বসল পাশে। সভেন ওকে দেখে খুবই খুশি।

'আপনি শুনেছেন...ওই শব্দটা?'

স্বল্প আলোয় সভেনকে মাথা দোলাতে দেখল এমি। 'স্কফিন,' অন্ধকারে উঁকি দিলেন তিনি। 'আমাদের এদিকটাতে আসা উচিত

হয়নি। এখন কী করে বেরুব?'

এমি টর্চ ঘোরাল। এদিককার গাছপালা সব একই রকম দেখতে। কোথায় এসে পড়েছে বুঝতে পারছে না ও। 'জানি না আমি,' বলল এমি।

সিধে হলেন সভেন, মুখের সামনে হাত এনে হাঁক ছাড়লেন। 'রাহমান!' বৃক্ষসারি এবং আঁধারের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর ডাক। চমকে গিয়ে কিচমিচ করল কতগুলো পাখি, ঝাপটাল ডানা তারপর আবার নীরব হয়ে গেল। এমি, এখনও বসে আছে, অনুভব করল ওর চারদিকের জঙ্গল যেন কীসের আশঙ্কায় থমথম করছে। বাইরের ওগুলো জানে আমরা কোথায়, ভাবছে ও।

অন্ধকারের চেয়েও কালো কী একটা এমির পাশের ঝোপ দিয়ে দৌড়ে গেল। ও লাফ মেরে খাড়া হলো। টর্চ মারল ওদিকে। কিছু নেই। যদিও পাতাগুলো এখনও কাঁপছে।

'ডোন্ট!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল এমি। 'ডোন্ট শাউট এগেইন।'

সভেন চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললেন, 'ওরা ইতিমধ্যে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, এমি। আমাদের দু'জনকে এখন একত্রিত থাকতে হবে।'

সভেনের কথার মাজেজা উপলব্ধি করে ভয় পেল এমি। 'বাবার কী হবে?'

'ওর কাছে বন্দুক আছে।'

তা আছে কিন্তু শেষ গুলির আওয়াজ শোনার পর থেকে এমির বাবার আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। এ বনভূমি খুব বিস্তৃত বা বিশাল নয় যদিও অন্ধকারে ব্যাপ্তিটা সীমাহীন লাগছে। বাবা কি সভেন আংকেলের ডাক শুনতে পাননি? তা হলে জবাব দিচ্ছেন না কেন?

'চলুন, বাবাকে খুঁজি,' বলল এমি। ধীর গতিতে সামনে কদম

বাড়াল। ওর ধারণা ও সঠিক দিকেই যাচ্ছে। যদিও ঠিক নিশ্চিত নয়। পেছনে সভেনের সাড়া পাচ্ছে। ওকে সাবধানে অনুসরণ করছেন। ওরা টর্চের আলোয় পথ দেখে চলছে। তবে যতই এগোচ্ছে ততই মনে হচ্ছে হারিয়ে ফেলছে পথ।

ওদের একদম পেছনে আরেকটা ভয়ঙ্কর চিৎকার ফালাফালা করে দিল রাতের বাতাস– যেন অত্যাচারিত-কোনও শিশু মরণ আর্তনাদ করছে। পাঁই করে ঘুরল এমি। কীসের চিৎকার বোঝার চেষ্টা করল। সভেন ওর হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন। 'ওরা আমাদেরকে আতঙ্কিত করে তুলতে চাইছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি। এমিরও বুক ধড়ফড় ভয়ে। 'চাইছে আমরা ভয় পেয়ে যেন দলছুট হই,' বললেন সভেন। এক কদম বাড়লেন সামনে। ঝোপে একটা বাড়ি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হাহ্!'

ওদের পেছনে কতগুলো ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল এমি, ঝট করে ঘুরল। ফেলল টর্চের আলো। কিছু নেই।

সে এবং সভেন একে অপরের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। ওদের চারপাশের জঙ্গল থেকে কীসব ভৌতিক আওয়াজ ভেসে আসছে, টের পাওয়া যাচ্ছে নানান নড়াচড়া।

'এ জঙ্গল থেকে বেরুনো দরকার,' বললেন সভেন। 'রাস্তা কই?'

'কিন্তু আমার বাপি–'

'তোমার বাবার কাছে বন্দুক আছে।'

এমি একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে বিকুরগুলো সত্যি বিপজ্জনক কি না। পরক্ষণে বুঝল এটা একেবারে নির্বোধের মত প্রশ্ন হয়ে যাবে। ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করতে লাগল জঙ্গলের কোন্ রাস্তা দিয়ে বেরুনো যায় এবং ঠিক কোন্‌দিক থেকে ওরা ফার্ম থেকে এসেছিল। 'আমার মনে হয়...আমরা যদি এদিক দিয়ে যাই তা হলে মূল রাস্তাটি পেয়ে যাব।'

আলো থাকা সত্ত্বেও যাত্রা হলো মন্থর। প্রতিটি পা ফেলতে হচ্ছে হিসেব করে, সাবধান থাকতে হচ্ছে ডালপালার বাড়ি যেন না লাগে মুখে। 'বাপি জবাব কেন দিচ্ছে না বলে আপনার মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল এমি।

'সে...সে...' বললেন সভেন। 'সে সম্ভবত...' আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না তিনি। ওরা হাঁটতে লাগল। পচা পাতায় পা পিছলে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে ছোট খানা খন্দে পড়ে। তবে কেউ কিছু বলছে না। গাছের ডালের বাড়ি আর কাঁটাঝোপের আঁচড়ে বেহাল দশা এমির। খুব রাগ হচ্ছে। কিন্তু মেজাজ করে লাভ নেই। যদিও দমানো যাচ্ছে না ক্রোধ– নাকি এটা আতঙ্ক?

'আমার মনে হয় রাস্তাটা...' বলল ও। কিন্তু রাস্তা কোথায়? পথের তো কোনও চিহ্নই নেই। হঠাৎ ওদের বামদিক থেকে সমস্বরে কিচকিচ আওয়াজ উঠল– ওই ডাকে সাড়া মিলল ডানপাশ থেকে। ওখানে একসঙ্গে কতগুলো জন্তু কুৎসিত গলায় কিচকিচ করছে। এমির আত্মা উড়ে গেল ডরে। দৌড় দিতে যাচ্ছিল, ওকে ধরে ফেললেন সভেন।

'ওরা চাইছেই আমরা যেন লেজ তুলে পালাই,' বললেন তিনি।

প্রায় হেসে ফেলল এমি। 'আমাদের শান্ত থাকতে হবে।'

'অবশ্যই আমাদের শান্ত থাকতে হবে। এখন এই ইংলিশ উড থেকে বেরিয়ে পড়ি চলো।'

জমিন আবার ঢালু হতে শুরু করেছে। পাতার স্তূপে পিছলে যেতে যায় পা। মাঝে মাঝে গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। ওদের পেছনে আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার দিল বিকুরগুলো। ঘামছে এমি। ভাবছে এই ঢালটা কোন্ জায়গার হতে পারে? ঠিক কোথায় জঙ্গলের মধ্যে এরকম ঢাল রয়েছে!

দিনের বেলায় ও কখনওই এসব ঢাল-টাল লক্ষ করেনি।

ওরা থেমে দাঁড়াল। চারপাশে টর্চ ঘোরাল এমি। ওদের পেছনে, টর্চের আলো পড়ে একজোড়া লাল টকটকে চক্ষু জ্বলে উঠল ভীষণভাবে। চিৎকার দিল এমি। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য চোখ জোড়া। টর্চের আলোয় সামনে এক সারি লালচে পাথর দেখা গেল।

এমি আলো ফেলল একটি দেয়াল, প্রান্ত বা কিনারা এবং কতগুলো ভাঙা সিঁড়ির ওপর। 'মঠ!' বলল ও। তাকাল সভেনের দিকে। হাসছে। এখন ও জানে ওরা কোথায় আছে। ওরা জঙ্গল পেছনে ফেলে পরিত্যক্ত ভাঙা মঠটির কাছে এসে পড়েছে। 'শুনুন!' একটা আঙুল তুলল এমি। মঠের অপর পাশ দিয়ে সেইন্ট ব্রেইডের পবিত্র কুয়োর জল পড়ার মৃদু শব্দ আসছে।

'মূল রাস্তাটি চলে গেছে কুয়ো বরাবর– এটা জঙ্গল হয়ে সোজা পৌঁছেছে খামারে।'

'জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে!' আশঙ্কা প্রকাশ পেল সভেনের কণ্ঠে। 'আমি জলা-জঙ্গল মোটেই পছন্দ করি না।'

কীসের একটা শব্দ পেয়ে এমির ওদের পেছনের জঙ্গলে আলো ফেলল। প্রথমে আবছা একটা কুঁইকুঁই ডাক শোনা গেল, তারপর কিছু চলে যাওয়ার শব্দ। 'এদিকে আর কোনও রাস্তা নেই,' বলল ও। 'তবে এটা পরিষ্কার একটা পথ– কোনও ঝামেলা হবে না যেতে।'

ওরা মঠের ভাঙা দেয়াল টপকাল। ঢুকল ভেতরে। ভাঙা মঠের ঘরগুলোতে বড় বড় পাথরখণ্ডের অনেক টুকরো পড়ে আছে। হাঁটার সময় পায়ের তলায় পড়ে খণ্ডগুলো শব্দ তুলল, কদম ফেলতে সমস্যা হচ্ছে।

'দেখুন!' বলল এমি। টর্চের আলোয় আলোকিত আলগা পাথর, কালো কালো দেয়াল। ঝট করে কী যেন একটা ছুটে গেল

সামনে থেকে, আবার ফিরে এল– কুকুরের মত একটা জন্তু, খাড়া খাড়া কান। ওদের দিকে তাকিয়ে জানোয়ারটা তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার দিল। ওটার ডাকে সাড়া দিয়ে জঙ্গল থেকে ভেসে এল আরও অনেকগুলো জানোয়ারের সম্মিলিত চিৎকার। বিকুরগুলো ওদের সামনের জঙ্গলে এসে পড়েছে।

ওরা পিছিয়ে গেল। বিড়াল-কুকুর বা বিকুরগুলো ভাঙা মঠের কিনার ধরে ছুটে আসছে। ওদেরকে দেখে দলছুট হয়ে গেল এমি। বামে মোড় নিল ও, যে জঙ্গল থেকে মাত্রই বেরিয়ে এসেছে, সেদিকে। আর সভেন দৌড়ালেন ডানদিকে। ওরা নিজেদের ভুল বুঝে ওঠার আগেই বিকুরগুলো চলে এল ওদের মাঝখানে। এমি ওদের গায়ে টর্চের আলো ফেলল, জ্বলজ্বল করে উঠল লাল-সবুজ চোখ। তবে ওরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ল না কিংবা ছুটে পালিয়েও গেল না। দুটো ছুটে এল এমিকে লক্ষ্য করে। তবে দৌড়ানোর ভঙ্গিতে কোনও তাড়া নেই, সাদা ঝকঝকে দাঁতের সারির ফাঁকে ঝুলছে লাল জিভ। আকারে তেমন বড় না হলেও এমি জানে এদের গায়ে অনেক শক্তি এবং এরা কামড়ায়।

আলগা পাথরখণ্ডের ওপর পা ফেলে ফেলে সামনের দিকে ছুটল এমি, এক লাফে পার হলো দেয়াল এবং অপর পাশে ভাঙা পাথরের টুকরোর ওপর পা ফেলল। সামনেই সেই পবিত্র কুয়োর জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পেছনে, মঠের ভাঙা বেদির কাছ থেকে পুরুষকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল।

'সভেন আংকেল!' বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল এমি। টর্চের আলো মারল সামনে-পিছনে। একই সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে বিকুরগুলো কাছে পিঠে আছে কি না। নাহ্, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় ওরা ওকে ছেড়ে চলে গেছে। তবে মঠ থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে। মঠের মেঝের ভাঙা পাথর কারও

পায়ে লেগে ঠকাঠক শব্দ তুলল।

'সভেন আংকেল!' এখনও কোনও সাড়া নেই।

ও মঠের ঢালু কিনার দিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে ওপরে উঠে আসতেই কাঙ্ক্ষিত রাস্তাটি পেয়ে গেল। ওই তো হলি ওয়েল বা পবিত্র কুয়ো। পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল ধারা। টর্চের আলোয় দেখল রাস্তাটা চলে গেছে পাতা আর গাছের গুঁড়িতে ঢাকা অন্ধকার একটা টানেলের মধ্য দিয়ে। এ পথ ধরে এগোলেই খামার। ও হাঁটা দিয়েছে– হালুম করে একটা বিকুর এসে হাজির হলো সামনে। ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত মুখ খিঁচাল জন্তুটা। টর্চের আলোয় নাদুসনুদুস একটা কুকুরছানার মত লাগছে। তবে দাঁত আর নাকের ডগা কালো।

দুই কদম পিছিয়ে গেল এমি। ঘুরে জঙ্গলের রাস্তার দিকে ছুট লাগাবে ভেবেছিল তবে একটা মৃদু ঘেউ শুনে সে ফিরল এবং টর্চ মারল। আরেকটা বিকুর ওর পেছনে।

প্রচণ্ড আতঙ্ক সাহস এনে দিল এমির মনে। হাতের টর্চটা সামনে অস্ত্রের মত বাগিয়ে ধরে বাড়ির রাস্তায় দিল ছুট। জানোয়ারটা চট করে সরে গেল এবং পরমুহূর্তে পায়ে নাচের মুদ্রা তুলে এগিয়ে এসে কামড় বসিয়ে দিল এমির বাহুতে।

এরকম কিছু হচ্ছে বিশ্বাসই করতে চাইল না এমি। সে হাতে ঝাঁকি মারল জোরে যেন কিছুই ঘটেনি। তবে হাতে কামড়টা দ্বিগুণ জোরে বসে গেলে ও বুঝতে পারল স্বপ্ন দেখছে না। জন্তুটা ওকে কামড়ে মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে। এমির হাতের মাংস ছিঁড়ে যাচ্ছে। ও হাত থেকে ফেলে দিল টর্চ। আরেক হাতেও অনুভূত হলো ওজন– আরেকটা বিকুর ওর জ্যাকেটের হাতা কামড়ে ধরেছে। ভোজবাজির মতই যেন আরেকটা অমানুষিক চিৎকার ভেসে এল, অন্যরাও মহা উৎসাহে অংশ নিতে এগিয়ে এল এ হামলায়।

দাঁতে দাঁত চাপল এমি, যে বিকুরটা ওর হাত কামড়ে ধরে রেখেছে, মুক্ত বাকি হাতটা দিয়ে ওটাকে পেল্লায় এক ঘুষি মারল। ঘুষিটা পড়ল দাঁত কামড়ে থাকা জায়গাটাতে। বিকুর যেমন ব্যথা পেল তার দ্বিগুণ ব্যথায় কাতরে উঠল এমি। তবে যন্ত্রণা সহ্য করে আবারও ঘুষি মারল ও এবং সাঁড়াশির মত চেপে থাকা দাঁত থেকে অবশেষে মুক্তি মিলল।

দৌড়াচ্ছে এমি। ভাঙা মঠের ইট-কাঠ-পাথর ছড়ানো রাস্তা দিয়ে ছুটছে। ওর জ্যাকেট কামড়ে ধরে রেখেছিল যে জন্তুটা ওটাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে দৌড়াচ্ছে ও।

এমির কাছে এখন আলো নেই। বুঝতে পারছে না কোথায় যাচ্ছে। ও যখন লাফ দিল জানে না কোথায় ল্যাণ্ড করবে। ম্লান চাঁদের আলোয় নিচু দেয়ালগুলোকে কুচকুচে কালো দেখাচ্ছে, পাথরখণ্ডগুলোর রঙ হালকা ধূসর। এমি জানে না বিকুরগুলো এখন ওর পিছু নিয়ে আছে কি না কারণ ওগুলোর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

একটা পাথরে ঘষা খেল এমির থুতনি। গুলতিতে ছোঁড়া ঢিলের মত ও দেয়ালের ওপাশে ছিটকে গেল। দড়াম করে ভাঙা পাথরের টুকরোগুলোর মধ্যে পড়ল। দাঁতে দাঁত বাড়ি খেয়ে ব্যথায় চোখে সর্ষেফুল দেখল এমি, জিভ কেটে পলকে রক্তে ভরে গেল মুখ। এক সেকেণ্ড ও চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল, নিঃশেষিত দম। তবে দ্রুত ধাবমান পায়ের শব্দে ও উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল আবার।

শক্ত কীসের সঙ্গে যেন বাড়ি খেল এমি, ওর ধাক্কায় ওটা একটু গড়িয়েও গেল। আঙুলে সুতি বস্ত্রের স্পর্শ পেল ও এবং সামান্য উষ্ণ। একটা গন্ধ– মাটির সোঁদা গন্ধ নয়। আফটারশেভের ঘ্রাণ। এ তো সভেন আংকেল!

সভেনের শার্ট খামচে ধরল এমি, তাঁকে ধরে ঝাঁকি দিল।

কিন্তু তিনি নড়লেন না কিংবা কোনও সাড়াও দিলেন না। 'আংকেল,' বলল এমি। 'সভেন আংকেল,' সে অন্ধকারে হাতড়ে লোকটির মুখ খুঁজে পেল, নাক, আঙুলগুলো ঢুকে গেল হাঁয়ের মধ্যে। কিন্তু মানুষটা পাথরের মত স্থির। এমি সভেনের থুতনিতে হাত বুলাল। মাথাটা হেলে রয়েছে একপাশে। ওর আঙুলে ভেজা ভেজা কী যেন লাগল। চট করে হাতটা সরিয়ে নিল এমি। আঙুলগুলো চটচট করছে। ভেজা, চটচটে কোনও তরল লেগে গেছে ওর হাতে।

এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল এমি। তারপর কালো দেয়ালের মাথায় কালচে কী একটা জিনিসকে উঠতে দেখল। তারপর সেই বিশ্রী চিৎকার খনখনে হাসির মত শোনাল। হাসছে স্কফিন। বাগে পেয়েছে শিকার। এমির শরীরের সমস্ত রোম দাঁড়িয়ে গেল সেই বীভৎস হাসির শব্দে।

বাবা গেল, ভাবছে ও। সভেন আংকেলও নেই। এখন যা করার আমার একা করতে হবে।

এই বিকুরগুলো, চিন্তা করছে এমি, ছড়িয়ে পড়বে শহরের প্রতিটি রাস্তায়। দেখতে পোষা বিড়ালের মত। কে জানে সংখ্যায় কত এই স্কফিনের দল। এরা শেয়ালের মত ধূর্ত, বিড়ালের মত সাবধানী, ভয়ানক চতুর এবং ভীষণ হিংস্র।

ওর সামনের অন্ধকার নড়ে উঠল, লাফ দিল ওকে লক্ষ্য করে। লাথি চালাল এমি এবং যন্ত্রণায় চিৎকার দিল। বিদ্যুৎগতির কামড়ে ওর বাহু থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে বিকুর। লাথি খেয়ে সরেও গেছে।

লোকে এদের নির্দোষ শেয়াল ঠাওরাবে কিংবা 'কিউট বিড়াল ছানা' ভেবে নিয়ে যাবে নিজেদের বাড়িতে। সুকুমার রায় যদি এখন বেঁচে থাকতেন এবং এই বিকুরগুলোকে দেখতেন তা হলে ওই বিখ্যাত ছড়াটা কি মজা করে লিখতে পারতেন? ইস্, কী

কুক্ষণেই না বিকুর ছানাগুলোকে বাড়ি বয়ে এনেছিল এমি! এখন পস্তাচ্ছে।

রাতের বাগানে শব্দ হচ্ছে। রাস্তার পেছনে কোনও কিছু হালকা পায়ে দৌড়ে যাওয়ার শব্দ। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। হতে পারে ওটা কোনও শেয়াল। কিংবা স্রেফ একটা বিড়াল।

পা জোড়া শরীরের নিচে মুড়ে এনে লাফ মেরে খাড়া হলো এমি। তারপরই দিল দৌড়। পেছন থেকে কিছু একটা ওকে কামড়ে ধরল। গ্রাহ্য করল না এমি। ছুটতে লাগল ফার্মের পথ ধরে। পা কামড়ে ধরা জিনিসটার অস্তিত্ব ভুলে থাকার চেষ্টা করছে, ভীষণ জ্বলতে থাকা হাতের কথা বিস্মৃত হতে চাইছে। সামনেই মঠের লম্বা দেয়ালের একটা অংশ। ও দেয়াল বেয়ে উঠতে গেছে, সজোর কামড় পড়ল গোড়ালিতে। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল এমি। দেয়ালে থাবা মারল ও, ওজনটাকে পাত্তা না দিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, আরেকটা যন্ত্রণাদায়ক কামড় পড়ল অপর পায়ে, ঠিক গোড়ালির ওপর, ওকে টেনে নামিয়ে দিল। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ল এমি। নাক মুখ জোরে বাড়ি খেল শক্ত জমিনে। অসংখ্য লাল নীল তারা জ্বলে উঠল চোখের সামনে। শুনল সেই বীভৎস, খনখনে হাসি। পরমুহূর্তে ঘাড়ের ওপর ধারাল দাঁতের কামড়। জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে এমি ভাবল: শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে এ-ই ছিল...এ-ই...

লণ্ড্রি মেশিন

অ্যাম্বুলেন্স বেরুচ্ছে, ওই ক্ষণে লণ্ড্রিতে ঢুকল অফিসার হানটন। তবে ফ্ল্যাশিং লাইট না জ্বালিয়ে কিংবা সাইরেন না বাজিয়েই মন্থর গতিতে বেরিয়ে এল গাড়িটি। দেখতে কেমন অশুভ লাগল। অফিসের ভেতরে লোকের ভিড়, ঠেলাঠেলি। তবে তাদের মুখে রা নেই। কেউ কেউ অবশ্য কান্নাকাটি করছিল। এছাড়া প্ল্যান্টটি খালি। দূর প্রান্তের প্রকাণ্ড অটোমেটিক ওয়াশারগুলো এখনও বন্ধ করা হয়নি। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল হানটন। লোকজনের থাকা উচিত ছিল দুর্ঘটনার জায়গায়, অফিসে নয়। এমনই হয়– মানুষ নামের প্রাণীগুলোর ভেতরেই আছে শেষ পর্যন্ত কী ঘটে দেখার জন্য ব্যাকুলতা। এ অভ্যাসটা মোটেই ভাল নয়। হানটনের পেটের ভেতরটা কেউ যেন খিমচে ধরল। এমনই হয়। মারাত্মক কোনও অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা তদন্তে এলে তার সবসময় এরকম একটা অনুভূতি জাগে। চোদ্দ বছর ধরে পুলিশে চাকরি করছে হানটন। রাস্তাঘাটে কত কার অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছে, দশ পনেরো তলা থেকে লাফিয়ে পড়া আত্মহত্যাকারীদের লাশের তদন্তে গিয়েছে। প্রতিবারই পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠেছে, টান ধরেছে পেশীতে, যেন ওখানে শয়তানী কিছু ঘোঁট পাকাচ্ছে।

হানটনকে দেখে সাদা শার্টপরা এক লোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে এল। ঘাড়ে গর্দানে মোষের মত চেহারা, কাঁধের ওপর

মাথাটা কেউ যেন কেটে বসিয়ে দিয়েছে, নাক এবং গালের শিরাগুলো ফুটে রয়েছে উৎকটভাবে। উচ্চ রক্তচাপের কারণ নতুবা অতিরিক্ত মদ পানের ফল। সে শব্দগুলো সাজিয়ে কথা বলার চেষ্টা করল কিন্তু বার দুই চেষ্টা করার পরেই তাকে বাধা দিল হানটন।

'আপনি কি এ লণ্ড্রির মালিক? মি. গার্টলি?'

'না...না...আমি স্ট্যানার। ফোরম্যান। গড, এটা–'

নোটবুক বের করল হানটন। 'আমাকে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় নিয়ে চলুন, মি. স্ট্যানার এবং বলুন কী ঘটেছে।'

স্ট্যানারের মুখ আরও ছাইবর্ণ ধারণ করল; নাক এবং গালের ফুটকিগুলোকে দেখাল জন্মদাগের মত। 'ক-কাজটা আমাকেই করতে হবে?'

কপালে ভুরু তুলল হানটন। 'আপনাকেই তো করতে হবে। আমাকে ফোন করে বলা হয়েছে ব্যাপার খুব সিরিয়াস।'

'সিরিয়াস–' এরপর কী বলবে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেল না স্ট্যানার। লাঠির মাথায় বানরের মত তার কণ্ঠমণি বারকয়েক নাচানাচি করল। 'মিসেস ফ্রলি মারা গেছেন। যীশাস। বিল গার্টলি এখানে থাকলেই বরং ভাল হত।'

'হয়েছে কী?'

স্ট্যানার বলল, 'আপনি নিজের চোখেই দেখুন।'

সে হানটনকে নিয়ে হ্যাণ্ড প্রেসের সারি, শার্ট ভাঁজ করার ইউনিটের মাঝ দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। থামল একটি লণ্ড্রিমার্কিং মেশিনের সামনে। কপালের ওপর একটি কম্পিত হাত তুলে বলল, 'আপনাকে এখন একাই যেতে হবে, অফিসার। ও দৃশ্য আমি আবার দেখতে পারব না। ও দেখলে আমি...আমি পারব না। সরি।'

লোকটার ওপর বিরক্তি নিয়ে মার্কিং মেশিনের দিকে এগোল

হানটন। এ ধরনের লোকেরা নিরাপত্তাবিহীন দোকান চালায়, পর্যাপ্ত প্রটেকশন ছাড়াই বিপজ্জনক ক্লিনিং কেমিকেল নিয়ে কাজ করে এবং শেষতক কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করলে অথবা মারা গেলে তার লাশের দিকে তাকাতে ভয় পায়। যত্তসব–

ওটা দেখল হানটন।

এখনও চলছে মেশিন। কেউ ওটা বন্ধ করেনি। পরে ও জেনেছে ওটা হেডলি ওয়াটসন মডেল-৬ স্পিড আয়রনার অ্যাণ্ড ফোল্ডার-এর যন্ত্র। লম্বা, জটপাকানো নাম। তবে এখানে যারা বাষ্প এবং পানির মধ্যে কাজ করে তারা যন্ত্রটির একটি সুবিধেজনক নাম দিয়েছে। ম্যাংগলার।

স্তব্ধ হয়ে, জায়গায় জমে গিয়ে দৃশ্যটা দেখল হানটন। তারপর, চোদ্দ বছর ধরে ল-এনফোর্সমেন্ট অফিসার হিসেবে যার অভিজ্ঞতা, সে এতদিন যে কাণ্ডটি করেনি আজ তা-ই করল: পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল, মুখের কাছে চলে এল হাত এবং ঠেকাতে না পেরে হড়হড় করে বমি করে দিল।

'তুমি তো কিছুই খেলে না,' বলল জ্যাকসন।

মহিলারা ভেতরে, থালাবাসন ধুতে ধুতে গল্প করছে, এদিকে জন হানটন এবং মার্ক জ্যাকসন সুরভিত বারবিকিউ'র পাশে লন চেয়ারে বসে আড্ডা মারছিল। হানটন মৃদু হাসল। আসলেই সে বলতে গেলে খাবার স্পর্শই করেনি।

'আজ খুব বাজে একটা দিন গেছে আমার,' বলল সে। 'ভয়ানক বিশ্রী।'

'কার ক্রাশ?'

'না। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল।'

'তালগোল পাকানো দশা?'

হানটন জবাব দিল না তবে তার মুখটি বিকৃত দেখাল। সে

ওদের মাঝখানে রাখা কুলার থেকে একটা বিয়ার বের করে নিয়ে খুলল। এক চুমুকে অর্ধেক খালি। 'তোমরা কলেজ প্রফেসররা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লণ্ড্রি সম্পর্কে কিছু জান?'

মুখ টিপে হাসল জ্যাকসন। 'একটু আধটু জানি। আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট হিসেবে একবার সামারে এরকম একটা জায়গায় কাজ করেছিলাম।'

'তা হলে বোধহয় স্পিড আয়রনার সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকসন। 'হুঁ। ওগুলো বিছানার চাদর আর লিনেন ইস্ত্রি করে। বড়সড়, লম্বা মেশিন।'

'ঠিক বলেছ,' বলল হানটন। 'অ্যাডেল ফ্রলি নামে এক মহিলা শহরের ব্লু রিবন লণ্ড্রিতে কাজ করত। ওই মেশিনে সে আটকা পড়ে। যন্ত্রটা তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যায়।'

হঠাৎ অসুস্থ দেখাল জ্যাকসনকে। 'কিন্তু...এরকম তো হওয়ার কথা নয়, জনি। ওই মেশিনে সেফটি বার আছে। কেউ যদি দুর্ঘটনাক্রমে মেশিনের নিচে হাত দিয়েও ফেলে বার উঠে যাবে ঝট করে, বন্ধ করে দেবে মেশিন। যদ্দূর মনে পড়ে এমনটাই আমি দেখেছি।'

হানটন মাথা ঝাঁকাল। 'নিয়ম সেটাই। তবে ঘটনাটা ঘটেছে।'

অন্ধকারে চোখ বুজল হানটন। সে যেন হেডলি ওয়াটসন স্পিড আয়রনারটাকে আবার দেখতে পাচ্ছে। আকারে লম্বা, আয়তাকার একটা বাক্সের চেহারা, লম্বায় ত্রিশ ফুট, চওড়ায় ছয় ফুট। ফিডার এণ্ডে, একটা চলমান ক্যানভাস বেল্ট সেফটি বারের নিচে ছোটাছুটি করছে, খানিকটা কোনাকুনিভাবে ওপরের দিকে উঠে আবার নেমে যাচ্ছে নিচে। বেল্টটি বহন করে ভেজা, ভাঁজ পড়া বিছানার চাদর, ক্রমাগত ওগুলো আসতেই থাকে। ষোলোটি

প্রকাণ্ড রিভলভিং সিলিণ্ডার দিয়ে মেশিনের মূল বডি তৈরি। ওপরে আটটি এবং নিচে আটটি সিলিণ্ডারের মাঝখানে, প্রচণ্ড উত্তপ্ত রুটির ভেতরে বসানো পাতলা হ্যামের টুকরোর মতই কাপড়গুলো চাপ খায়। কাপড় শুকানোর জন্য সিলিণ্ডারের স্টিম হিট অ্যাডজাস্ট করা থাকে সর্বোচ্চ ৩০০ ডিগ্রিতে। চলমান ক্যানভাস বেল্টের ওপরে রাখা বিছানার চাদরগুলোকে প্রতি বর্গফুটে ৮০০ পাউণ্ড ওজনের চাপ দিয়ে প্রতিটি ভাঁজ নিখুঁতভাবে সমান করে ফেলা হয়।

এবং মিসেস ফ্রলি, কীভাবে কে জানে, ওই মেশিনে আটকে যান এবং যন্ত্রটি তাঁকে তার ভেতরে টেনে নেয়। ইস্পাতের তৈরি, অ্যাসবেস্টস জ্যাকেট পরানো প্রেসিং সিলিণ্ডারগুলো লাল টকটকে ছিল, যেন গায়ে রং মেখেছে, মেশিন থেকে উদ্গীরণ হওয়া বাষ্পে মিশে ছিল রক্তের গা গোলানো গন্ধ। ভদ্রমহিলার পরনের সাদা ব্লাউজ এবং নীল স্ল্যাকসের ছেঁড়া টুকরো, এমনকী খণ্ডিত ব্রা ও প্যান্টি মেশিনের ত্রিশ ফুট দূরের শেষ প্রান্ত থেকে ছিটকে পড়ে মেঝেতে, কাপড়ের রক্ত মাখা বড় অংশগুলো অটোমেটিক ফোল্ডারে জড়ানো ছিল। তবে ভীতিকর দৃশ্যপটের ওখানেই শেষ নয়।

'ওটা সবকিছুই ভাঁজ করে ফেলতে চেয়েছিল,' হানটন বলল জ্যাকসনকে, গলায় বমি বমি ভাব। 'তবে মানুষ তো আর বিছানার চাদর নয়, মার্ক। আমি যা দেখলাম, মহিলার শরীরের অবশিষ্টাংশ যা পড়ে ছিল...' দুর্ভাগা ফোরম্যান স্ট্যানারের মত সে-ও শেষ করতে পারল না কথা। 'ওরা একটি ঝুড়িতে করে ওকে নিয়ে যায়,' নরম গলায় বলল ও।

শিস দিল জ্যাকসন। 'কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাটি কার ঘাড়ে চাপতে যাচ্ছে? লণ্ড্রিঅলা নাকি স্টেট ইন্সপেক্টর?'

'জানি না এখনও,' বলল হানটন। ওই অশুভ ছবিগুলো

এখনও ভাসছে চোখের সামনে। ম্যাংগলার চলছে, ধুপধাপ, হিসহিস, হুসহুস শব্দ করছে। লম্বা কেবিনেটের সবুজ দিক দিয়ে টপটপ রক্ত ঝরে পড়ছে খোলা নর্দমায়, বাতাসে মহিলার মাংস পোড়ার গন্ধ... 'বিষয়টি নির্ভর করবে কে ওই ছাতার সেফটি বার সম্পর্কে অনুমোদন দিয়েছিল এবং কোন্ পরিস্থিতিতে।'

'যদি ওটা ম্যানেজমেন্টের দোষ হয়ে থাকে, ওরা কি এ থেকে রেহাই পাবে?'

হানটন নিষ্প্রাণ হাসল। 'মহিলাটি মারা গেছে, মার্ক। গার্টলি এবং স্ট্যানার যদি স্পিড আয়রনারের মেইনটেনেন্সে কোনও গাফিলতি করে থাকে ওদের হাজতবাস অনিবার্য। সিটি কাউন্সিলে ধরাধরি করেও কোনও লাভ হবে না।'

'তোমার কি মনে হয় ওদের কোনও গাফিলতি ছিল? মেশিনে কোনও গোলমাল যা ওরা এড়িয়ে গেছে?'

ব্লু রিবন লণ্ড্রির কথা মনে করল হানটন। অপর্যাপ্ত আলো, ভেজা, পিচ্ছিল মেঝে, কয়েকটি যন্ত্র খুবই প্রাচীন এবং চলার সময় অনাবশ্যক ঘটাংঘটাং শব্দ করছিল। 'আমার মনে হয় ওদের কোনও গাফিলতি ছিল,' বলল সে। 'ওরা হয়তো গোলমাল দেখেও না দেখার ভান করেছিল।'

ওরা চেয়ার ছেড়ে উঠল। একসঙ্গে পা বাড়াল বাড়িতে।

'ঘটনা কদ্দূর গড়াল আমাকে জানিয়ো, জনি,' বলল জ্যাকসন। 'আমি শুনতে আগ্রহী।'

ম্যাংগলার সম্পর্কে হানটনের ধারণা ভুল ছিল: যন্ত্রে কোনও গোলমাল নেই।

ইনকোয়েস্ট বা সরকারি অনুসন্ধানের আগে ছয় জন স্টেট ইন্সপেক্টর এসে লণ্ড্রি মেশিনটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখল।

কোনও ত্রুটি ধরা পড়ল না। ইনকোয়েস্টের রায় দেয়া হলো: দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু।

শুনানি শেষে হতভম্ব হানটন স্টেট ইন্সপেক্টরদের একজন, রজার মার্টিনকে চেপে ধরল।

'কিছুই পাওয়া গেল না? মেশিনের কোনও ত্রুটিই নেই?'

'না, নেই,' বলল মার্টিন। 'তবে মাথা ঘামানোর মূল বিষয়টি ছিল সেফটি বার। ওটাতে কোনওই সমস্যা নেই। তুমি তো শুনলেই কোর্টে মিসেস জিলিয়ান কী বললেন। মিসেস ফ্রলির হাত নিশ্চয় মেশিনের অনেক কাছে চলে গিয়েছিল। কেউ অবশ্য তা দেখেনি: যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল। তিনি চিৎকার শুরু করেন। ততক্ষণে তাঁর হাত ঢুকে গেছে মেশিনের মধ্যে, যন্ত্র টেনে নিচ্ছিল হাতখানা। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ওরা মেশিন বন্ধ করার বদলে ভদ্রমহিলাকে টেনে বের করার চেষ্টা করে। আরেক ভদ্রমহিলা, মিসেস কিনি বলছেন তিনি নাকি মেশিন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে অনুমান করা যায় চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে তিনিও খেই হারিয়ে বন্ধ করার বদলে স্টার্ট বাটনে চাপ দিয়ে বসেন। অবশ্য মেশিন যখন বন্ধ করা হয় ততক্ষণে সব শেষ।'

'তা হলে সেফটি বারে কোনও সমস্যা ছিল,' হালকা গলায় বলল হানটন। 'যদি না মহিলা নিচের বদলে ওপরে হাত দিয়ে ফেলেন।'

'ওটি সম্ভব নয়। সেফটি বারের ওপর স্টেইনলেস স্টিলের ফেসিং বা আস্তরণ ছিল। আর বার নিজে নিজে বিগড়ে যেতে পারে না। মেশিনের সঙ্গে ওটা জোড়া লাগানো। বার একটু চোখ পিটপিট করলেও মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তা হলে ঘটনাটা ঘটল কী করে, ফর ক্রাইস্ট'স সেক!'

'জানি না। আমার এবং আমার কলিগের ধারণা শুধু একটিমাত্র উপায়েই স্পিড আয়রনার মিসেস ফ্রলিকে হত্যা করে

থাকতে পারে আর তা হলো যেভাবেই হোক তিনি ওপর থেকে ওটার গায়ে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার সময় তিনি মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডজনখানেক সাক্ষী এ কথা বলেছে।'

'তুমি একটা অসম্ভব দুর্ঘটনার কথা বলছ,' বলল হানটন।

'না। শুধু ব্যাপারটা আমাদের মাথায় ঢুকছে না,' বিরতি দিল সে, একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা বলি, হানটন, যেহেতু কেসটা নিয়ে তুমি অনেক দৌড়ঝাঁপ করছ। তবে কথাটা যদি তুমি কাউকে বলো আমি কিন্তু অস্বীকার যাব। বলব এ ধরনের কোনও কথাই আমি তোমাকে বলিনি। সত্যি বলছি ওই মেশিনটাকে আমার পছন্দ হয়নি। মনে হয়েছে...ওটা আমাদেরকে বিদ্রূপ করছে। গত পাঁচ বছরে নিয়মিতভাবে ডজনখানেকেরও বেশ স্পিড আয়রনার ইন্সপেকশনে গিয়েছি আমি। এদের কিছুর অবস্থা এমনই বাজে ছিল আমি কোনও কুকুরকেও ওই যন্ত্রগুলোর কাছে ঘুরঘুর করতে দিতাম না। তবে ওগুলো ছিল কেবলই যন্ত্র। কিন্তু এটা...এটা কেমন গা ছমছমে। জানি না কেন তবে এরকমই লেগেছিল আমার। যদি ওটার সামান্যতমও টেকনিকাল ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়ত, মেশিনটাকে তক্ষুণি বন্ধ করার অর্ডার দিতাম। শুনতে পাগলের প্রলাপ মনে হচ্ছে, না?'

'না। আমারও তোমার মতই মনে হয়েছে,' বলল হানটন।

'মিলটনে বছর দুই আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল তোমাকে বলি,' বলল ইন্সপেক্টর। চোখ থেকে মোটা কাচের চশমাটি খুলে নিয়ে ভেস্টের সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগল। 'এক লোক তার বাড়ির পেছনের উঠোনে একটা পুরানো আইসবক্স ফেলে রেখেছিল। এক মহিলা আমাদেরকে ফোন দিয়ে জানায় তার কুকুরটা নাকি ওটার মধ্যে আটকে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। আমরা ওই এলাকার স্টেট পুলিশম্যানকে ফোন করে বলি

সে যেন লোকটিকে বলে আইসবক্সটিকে টাউন ডাম্পে ফেলে দিয়ে আসতে। লোকটি ভাল মানুষ ছিল। আর বেচারা কুকুরটার জন্য আমাদের মায়াও লাগছিল। লোকটা আইসবক্স তার পিকআপে তুলে পরদিন সকালে ডাম্পে ফেলে দিয়ে আসে। ওই দিন বিকেলে এক মহিলা পুলিশে জানায় তার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'গড,' বলল হানটন।

'আইসবক্সটা ডাম্পে ছিল এবং ছেলেটি ছিল তার ভেতরে। মৃত। চালাক-চতুর ছেলে, তার মায়ের ভাষ্য অনুযায়ী। মহিলা জানায় তার ছেলে নাকি ভুলেও কোনও খালি আইসবক্স নিয়ে খেলতে যাবে না। কিন্তু ছেলেটি খেলতে গিয়েছিল। আমরা রিপোর্ট দিয়ে দিই। কেস ক্লোজড?'

'আমার তা-ই ধারণা,' বলল হানটন।

'না। পরদিন ডাম্প কেয়ারটেকার এসেছিল জিনিসটার দোর খুলে নিতে। সে ওটার মধ্যে ছয়টা মৃত পাখি পড়ে থাকতে দেখে। সীগাল, চড়ুই, একটা রবিন। সে বলে সে যখন মরা পাখিগুলোকে আইসবক্সের ভেতর থেকে বের করে আনছিল ওই সময় দরজাটা তার হাত চাপা দেয়। সে ভয়ে এবং ব্যথায় লাফিয়ে ওঠে। ব্লু রিবনের ওই ম্যাংগলারটাকে দেখে আমার তেমনই মনে হয়েছে। হানটন, আই ডোন্ট লাইক ইট।'

খালি ইনকোয়েস্ট চেম্বারে বসে ওরা একে অপরের দিকে মুখের রা হারিয়ে তাকিয়ে থাকল। আর ছয় ব্লক দূরে হেডলি ওয়াটসন মডেল-৬ স্পিড আয়রনার অ্যান্ড ফোল্ডার তখন ব্যস্ত লণ্ড্রিতে বিছানার চাদরগুলোর ওপর গরম বাষ্প ফেলতে।

পরের হপ্তায় কাজের প্রচণ্ড চাপে লণ্ড্রি মেশিনের কথা ভুলেই গিয়েছিল হানটন। এক সন্ধ্যায় সে তার স্ত্রীকে নিয়ে মার্ক

জ্যাকসনের বাড়িতে বেড়াতে এলে প্রসঙ্গটি আবার উত্থাপন করে তার বন্ধু।

জ্যাকসন বলে, 'তুমি আমাকে যে লণ্ড্রি মেশিনটির কথা বলেছিলে, জনি, তোমার কি কখনও মনে হয়েছে ওটা ভুতুড়ে? ওটার ওপর শয়তান ভর করেছে?'

বোকার মত চোখ পিটপিট করল হানটন। 'কী?'

'ব্লু রিবন লণ্ড্রির স্পিড আয়রনারের কথা বলছি। এবারের খবরটা বোধহয় তোমার চোখে পড়েনি।'

'কীসের খবর?' জানতে চাইল হানটন।

জ্যাকসন তাকে সান্ধ্য কাগজটি এগিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষের দিকের একটি লেখায় ইঙ্গিত করল। ওতে লিখেছে ব্লু রিবন লণ্ড্রির বিশাল স্পিড আয়রনের একটি স্টিম লাইন হঠাৎ ফেটে গিয়ে ফিডার এণ্ডে কর্মরত ছয়জন নারীর তিনজনকে দগ্ধ করেছে। ঘটনা ঘটেছে বিকেল পৌনে চারটায় এবং এর কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে লণ্ড্রির বয়লারে স্টিম প্রেশার বেড়ে যাওয়াকে। আহত নারীদের একজন, মিসেস অ্যানেট জিলিয়ানকে সেকেণ্ড ডিগ্রি বার্ন নিয়ে সিটি রিসিভিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

'অদ্ভুত একটা কোইনসিডেন্স,' মন্তব্য করল হানটন। তবে তার স্মৃতিতে ফিরে এল ইনকোয়েস্ট চেম্বারে বসে বলা ইন্সপেক্টর মার্টিনের কথাগুলো: *ওটা কেমন গা ছমছমে...* মনে পড়ল বাতিল বলে ফেলে দেয়া রেফ্রিজারেটরে মরে পড়ে থাকা কুকুর, ছেলেটি এবং পাখিগুলোর কথা।

সেই রাতে ও জ্যাকসনের সঙ্গে তাসখেলায় মোটেই মনোযোগ দিতে পারল না।

হানটন চার শয্যার হসপিটাল কক্ষটিতে ঢুকে দেখে মিসেস

জিলিয়ান বিছানায় শুয়ে *স্ক্রিন সিক্রেটস* পড়ছেন। তাঁর হাতে মস্ত একটা ব্যাণ্ডেজ, ঘাড়ের একটা পাশেও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ঘরের অপর বাসিন্দা, ফ্যাকাসে চেহারার এক তরুণী ঘুমাচ্ছে।

নীল ইউনিফর্ম দেখে চোখ মিটমিট করলেন মিসেস জিলিয়ান তারপর হাসলেন। 'আপনি যদি মিসেস চেরিনিকভের সঙ্গে দেখা করতে এসে থাকেন তা হলে আবার পরে আসতে হবে। কারণ ওরা মাত্রই ওনাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে।'

'না, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, মিসেস জিলিয়ান।' ভদ্রমহিলার মুখের হাসি মুছে গেল। 'আমি এখানে এসেছি আনঅফিশিয়ালি– লণ্ড্রির ওই অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়ে একটু খোঁজ খবর নিতে চাই। আমার নাম জন হানটন।' সে একটি হাত বাড়িয়ে দিল।

মিসেস জিলিয়ানের মুখে আবার ফিরে এল উজ্জ্বল হাসিটি। তিনি অক্ষত হাতটি দিয়ে হানটনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। 'আপনি যা জানতে চান প্রশ্ন করুন, মি. হানটন। গড, আমি ভেবেছিলাম আমার অ্যাণ্ডি আবার স্কুলে কোনও ঝামেলায় পড়ল কি না।'

'ঘটেছিল কী?'

'আমরা বিছানার চাদর তুলে দিচ্ছিলাম বেল্টে এমন সময় আয়রনারটি বিস্ফোরিত হয়– মানে ওই সময় তা-ই মনে হয়েছিল। আমি তখন বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবছিলাম, আর ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড শব্দটা হলো, যেন একটা বোমা ফাটল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বাষ্প আর বিকট হিসহিস শব্দ হচ্ছিল...ভয়ঙ্কর।' তাঁর হাসি হাসি মুখখানা একটু কেঁপে উঠল।

'মনে হচ্ছিল আয়রনারটা যেন শ্বাস ফেলছে। ড্রাগনের নিঃশ্বাসের মত। এবং আলবার্টা– মানে আলবার্টা কিনি– চিৎকার করে বলছিল কিছু একটা বিস্ফোরিত হয়েছে। তখন সবাই

দৌড়াদৌড়ি আর চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। জিনি জেসন হাউমাউ করে বলতে থাকে তার গা পুড়ে গেছে। আমি ছুটতে গিয়ে পড়ে যাই। তখন জানতাম না আমারও শরীর দগ্ধ হয়েছে। ঈশ্বর রক্ষা করুন আরও খারাপ কিছু ঘটেনি। ওই বাষ্পের তাপমাত্রা ছিল ৩০০ ডিগ্রি।'

'খবরের কাগজে পড়লাম একটা স্টিম লাইন নাকি ফেটে গেছে। কীভাবে ফাটল?'

'ওভারহেড পাইপগুলো এই ফ্লেক্সিবল লাইনের সঙ্গে মিশেছে। এগুলোই মেশিনটাকে চালায়। জর্জ– মি. স্ট্যানার– বললেন বয়লার নিশ্চয় ফুলে উঠেছিল। লাইনটা তখন ফেটে যায়।'

আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই হানটনের। সে চলে যাবে ভাবছে, মিসেস জিলিয়ান আপন মনেই যেন বলতে লাগলেন:

'ওই মেশিনে এমন সব ঘটনা ঘটবে কখনও ভাবিনি। স্টিম লাইন ফেটে যাচ্ছে। তারপর মিসেস ফ্রলির ওই ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। আরও ছোটখাট কত ঘটনা ঘটল। একদিন ইসির জামা আটকে গিয়েছিল ড্রাইভ চেইনের সঙ্গে। ও যদি জামাটা ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে রক্ষা না করত তা হলে কত মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেত। মেশিন থেকে বোল্টসহ নানান জিনিস পড়ে যাচ্ছে। তারপরে ধরুন হার্ব ডিমেন্টের কথা– আমাদের লণ্ড্রি রিপেয়ারম্যান। ওটাকে নিয়ে তারও কম হাঙ্গামা পোহাতে হচ্ছে না। চাদর, পর্দা বারবারই আটকে যাচ্ছে ফোল্ডারে। জর্জ বলে এরকম হওয়ার কারণ নাকি ওয়াশাররা খুব বেশি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করছে। কিন্তু এরকম তো আগে কখনও ঘটেনি। মেয়েরা এখন ওই মেশিন নিয়ে কাজ করতে ভয় পায়। ইসি বলল সে নাকি যন্ত্রটার মধ্যে অ্যাডেল ফ্রলির মাংস কণা এখনও লেগে থাকতে দেখেছে।

মেশিনটার ওপর যেন কারও অভিশাপ আছে। তবে ওটা আগে এরকম ছিল না। যেদিন শেরি ক্ল্যাম্পে তার হাত কাটল তারপর থেকে যন্তরটা ওইরকম উদ্ভট আচরণ শুরু করে দিয়েছে।'

'শেরি?' জিজ্ঞেস করল হানটন।

'শেরি উলেট। সুন্দরী একটি মেয়ে, সদ্যই বেরিয়েছে হাইস্কুল পাশ করে। ভাল কাজ জানে। তবে মাঝে মাঝে বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তরুণী মেয়েরা যেমন হয় আর কী।'

'ওর হাত কাটল কীভাবে?'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ফিডার বেল্ট টাইট করার জন্য ক্ল্যাম্প আছে। শেরি ওগুলোকে অ্যাডজাস্ট করছিল যাতে আরও হেভি লোড নেয়া যায়। কাজ করতে করতে বোধহয় বয়ফ্রেণ্ডের কথা ভাবছিল। তারপর আঙুল কেটে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড।' মিসেস জিলিয়ানকে কেমন বিমূঢ় দেখাল। 'জানেন এরপর থেকে মেশিন থেকে বোল্টগুলো খসে পড়তে শুরু করে। অ্যাডেল...আপনি জানেন...এক সপ্তাহ পরে মারা যায়। মেশিনটা যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছিল এবং আরও রক্ত খেতে চায়। মহিলারা এসবই বলাবলি করছে। ওদের মাথায় কত উদ্ভট চিন্তা যে ঢোকে তাই না, মি. হিনটন?'

'হানটন,' অনমনস্ক গলায় জবাব দেয় হানটন, তাকিয়ে আছে ভদ্রমহিলার মাথার ওপর দিয়ে শূন্যে।

বাড়ির পেছনে একটা লণ্ড্রি রুম আছে। ওখানে বসে মাঝে মাঝে দুই বন্ধু আড্ডা দেয়। দুটো প্লাস্টিকের চেয়ারে পাশাপাশি বসে প্রিয় বন্ধুকে মিসেস জিলিয়ানের গল্প শোনাল হানটন।

তার গল্প বলা শেষ হলে জ্যাকসন বলল, 'তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ম্যাংগলারটা ভুতুড়ে কি না। ঠাট্টা করে তখন বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু এখন সিরিয়াসলি জানতে চাইছি

তোমার কি মনে হয় ওটার ওপর শয়তান ভর করেছে?'

'না,' অস্বস্তি নিয়ে বলল হানটন। 'বোকার মত প্রশ্ন কোরো না।'

ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঢুকছে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে জ্যাকসন বলল, 'ভুতুড়ে শব্দটা ঠিক জুতসই নয়। ভূতে পেয়েছে বললে অর্থটা জোরালো হয়। ফ্রেজিয়ারের Golden Bough বইতে ভূত ডেকে আনার অনেক তন্ত্রমন্ত্র আছে। ড্রুইডিক এবং অ্যাজটেক লোককথায় ভূতে পাবার বহু ঘটনা রয়েছে। আরও পেছনে ফিরে যেতে পারি আমরা– মিশরে। ভূত-প্রেতদের আহ্বান করার জন্য অনেক উপায়ই আছে। তবে সবচেয়ে কমন উপায় হলো কোনও কুমারীর রক্ত দিয়ে তাকে আহ্বান করা।' সে হানটনের দিকে তাকাল। 'মিসেস জিলিয়ান বলেছেন ঝামেলাগুলো শুরু হয় শেরি উলেট দুর্ঘটনাক্রমে তার হাত কেটে ফেলার পরে।'

'ওহ্, কাম অন,' বলল হানটন।

'তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে উনি আমার মতই সন্দেহ প্রকাশ করছেন,' বলল জ্যাকসন।

'আমি এখন যাই তার বাড়িতে,' অল্প হাসল হানটন। 'গিয়ে বলি, "মিস উলেট, আমি অফিসার জন হানটন। আমি একটি আয়রনার নিয়ে কাজ করছি যেটির ওপর শয়তান আছর করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই জানতে এসেছি আপনি কুমারী কি না।" এ কথা যদি আমার বউ সান্ড্রা জানতে পারে, ও আমাকে আস্ত রাখবে ভেবেছ?'

'কিন্তু মেয়েটার কাছে তোমাকে যেতেই হবে, জনি,' বলল জ্যাকসন। সে মোটেই হাসছে না। 'আমি সিরিয়াস। ওই মেশিনটা আমাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অমন জিনিসের কথা আমি জীবনে শুনিনি।'

'এমনিই জানতে চাইছি– ভূত-প্রেত আহ্বান করার জন্য আরও কীসব উপায়ের কথা বলছিলে না?' বলল হানটন।

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকসন। 'বইপত্র না ঘেঁটে বলা মুশকিল। তবে বেশিরভাগ অ্যাংলো স্যাক্সন ফর্মূলা হলো তারা কবরের মাটি কিংবা ব্যাঙের চোখ ব্যবহার করে। ইউরোপীয়ানরা প্রায়ই হ্যাণ্ড অভ গ্লোরির কথা বলে, এটি মৃত মানুষের আসল হাতও হতে পারে অথবা উইচেস সাবাথে ব্যবহৃত হ্যালুসিনেজেনিক হাত হলেও সমস্যা নেই– এখানে সাধারণত বিষকাঁটালি গাছ ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া আরও আছে।'

'এবং তোমার ধারণা এসব জিনিস গিয়ে সেঁধিয়েছে ব্লু রিবন আয়রনারের মধ্যে? ক্রাইস্ট, মার্ক। ওই কারখানার পাঁচশ' মাইলের মধ্যেও কোনও বিষকাঁটালির ঝোপ নেই। নাকি তুমি ভাবছ কেউ তার মরা চাচার হাতটা কেটে নিয়ে ফেলে দিয়েছে ফোল্ডারের মধ্যে?'

'যদি সাতশ' বানর সাতশ' বছর ধরে টাইপ করে–'

'তা হলে এদের একজন শেক্সপীয়রের সমস্ত কবিতা আর নাটক টাইপ করে ফেলতে পারবে,' তিক্ত গলায় বাক্যটি শেষ করল হানটন। 'গো টু হেল। তুমি বরং কোনও ওষুধের দোকানে গিয়ে ড্রায়ারের জন্য কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে এসো।'

ম্যাংগলারের কবলে পড়ে জর্জ স্ট্যানার তার হাতখানা যেভাবে খোয়াল তা সত্যি আশ্চর্যের।

সোমবার সকাল সাতটায় লণ্ড্রি প্রায় খালিই থাকে শুধু স্ট্যানার আর ওদের মেইনটেনেন্স ম্যান হার্ব ডিমেন্ট ওই সময় কাজে যায়। সাড়ে সাতটায় লণ্ড্রির মূল কাজ শুরু হয়। এর আগে তারা ম্যাংগলারের বিয়ারিং-এ গ্রিজ মাখায়। আজ ডিমেন্ট লণ্ড্রি মেশিনের শেষ প্রান্তে ছিল, চারটে সেকেণ্ডারিতে গ্রিজ মাখাতে

মাখাতে ভাবছিল যন্ত্রটা আজকাল দেখলে তার কেমন ভয় ভয় করে। অকস্মাৎ গর্জে উঠে জ্যান্ত হয়ে গেল ম্যাংগলার।

সে চারটে ক্যানভাস এক্সিট বেল্ট ধরে নিচের মোটরের নাগাল পেতে যাচ্ছে, এমন সময় বেল্টগুলো তার হাতের মধ্যে চলতে শুরু করল এবং তালুর ছাল চামড়া ছিলে নিয়ে তাকে সুদ্ধ টেনে নিয়ে চলল।

বেল্টগুলো ফোল্ডারে তার হাত ঢুকিয়ে ফেলার পূর্ব মুহূর্তে ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করল ডিমেন্ট।

'হোয়াট দ্য ক্রাইস্ট, জর্জ!' চিৎকার দিল সে। 'মেশিন বন্ধ করো জলদি!'

জর্জ স্ট্যানার চিৎকার দিতে লাগল।

উচ্চ নিনাদের অমানুষিক, রক্ত জল করা এ চিৎকারে ভরে গেল লণ্ড্রি, ওয়াশারের ইস্পাতের বদন, স্টিম প্রেশারের হাসি হাসি মুখ এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ারের শূন্য চোখগুলোয় বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। স্ট্যানারের গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তনাদ, 'ওহ, গড! আমাকে ধরেছে! আমাকে ধরেছে–'

রোলারগুলো বাষ্প নির্গমন শুরু করল। ফোল্ডার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দুমদাম শব্দ করতে লাগল। বিয়ারিং এবং মোটরগুলো নিজে নিজেই যেন জীবন ফিরে পেয়ে চিৎকার দিতে থাকল।

ডিমেন্ট মেশিনের অপরপ্রান্তে ছুটে গেল।

প্রথম রোলারটি ইতিমধ্যে কুৎসিত লাল রঙে ভরে যেতে শুরু করেছে। ডিমেন্টের গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল। ম্যাংগলার 'হাউ' করে উঠল, দুমদুম শব্দ করছে, হিসহিস আওয়াজ করছে।

ভোঁতা মস্তিষ্কের কোনও দর্শক প্রথম দর্শনে ভাবত স্ট্যানার বুঝি মেশিনটার ওপর অদ্ভুত একটি ভঙ্গি নিয়ে ঝুঁকে আছে। তবে ভোঁতা মানুষও দেখতে পাবে স্ট্যানারের চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, হাঁ করা মুখ দিয়ে একের পর এক

চিৎকার বেরুচ্ছে। তার একটা হাত সেফটি বার এবং প্রথম রোলারের নিচে অদৃশ্য; তার জামা কাঁধের কাছ্ থেকে কেউ যেন টান মেরে ছিঁড়ে ফেলেছে এবং বাহু বিশ্রীভাবে ফুলে উঠে স্রোতের মত রক্তধারাকে ঠেলে দিচ্ছে পেছন দিকে।

'বন্ধ করো!' চিৎকার দিল স্ট্যানার। মট করে একটা শব্দ হলো। ভেঙে গেছে কনুই।

ডিমেন্ট মেশিন বন্ধ করার বোতামে থাবা মারল।

কিন্তু বন্ধ হলো না ম্যাংগলার। গুঞ্জন, গর্জন সমানে চলছে।

অবিশ্বাস নিয়ে বারবার বোতাম টিপে গেল ডিমেন্ট। কিন্তু ঘটল না কিছুই। স্ট্যানারের হাতের চামড়া চকচকে এবং টানটান হয়ে গেছে। শীঘ্রি ওটা রোলের চাপে ফেটে যাবে, অথচ এখনও জ্ঞান হারায়নি স্ট্যানার। চিৎকার করে যাচ্ছে সমানে। ডিমেন্ট একটা কার্টুন ছবিতে দেখেছিল একটা লোককে একটা স্টিমরোলার চিড়ে চ্যাপ্টা করে ফেলেছে। কার্টুনটা বহুবার দুঃস্বপ্নের মত হানা দিয়েছে ঘুমে। এখন আবার ওটার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

'ফিউজ–' কিচকিচ করে উঠল স্ট্যানার। তার মাথাটা ক্রমে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, মেশিন তাকে সামনের দিকে টেনে নিচ্ছে।

পাঁই করে ঘুরল ডিমেন্ট, দৌড় দিল বয়লার রুমে। স্ট্যানারের রোম খাড়া করা চিৎকার তাকে উন্মাদ কতগুলো ভূতের মত তাড়া করল। রক্ত আর বাষ্পের মিশ্রিত গন্ধ বাতাসে।

বামদিকের দেয়ালে তিনটে ভারী ধূসর বাক্সে রয়েছে লন্ড্রির ইলেকট্রিসিটির সমস্ত ফিউজ। ডিমেন্ট একটানে বাক্সগুলো খুলল এবং পাগলের মত লম্বা, সিলিণ্ডার চেহারার ফিউজগুলো ধরে টেনে টেনে খুলতে লাগল। ফিউজ খুলে খুলে ছুঁড়ে মারছে কাঁধের পেছনে। তার মাথার ওপরের বাতিগুলো নিভে গেল, তারপর বন্ধ

হলো এয়ার কমপ্রেসার; এরপর গোঙাতে গোঙাতে বন্ধ হয়ে গেল বয়লার।

অথচ এখনও ম্যাংগলার চলছে। স্ট্যানারের ঘর ফাটানো চিৎকার এখন গোঙানিতে পরিণত হয়েছে।

কাচের বাক্সে রাখা ফায়ার এক্সের দিকে কী করে যেন চোখ চলে গেল ডিমেন্টের। সে ওটা হাতে নিয়ে উঁ উঁ করতে করতে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। স্ট্যানারের হাত প্রায় কাঁধের কাছ থেকে অদৃশ্য। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওর মোটা ঘাড়টা ঢুকে যাবে সেফটি বারের মধ্যে, গুঁড়ো হয়ে যাবে মাথা।

'আমি পারব না,' হাতে কুঠার ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ডিমেন্ট। 'যীশাস, জর্জ, আমি পারব না। আমি পারব না। আমি–'

মেশিন এখন পরিণত হয়েছে কসাইখানায়। ফোল্ডার থুতু মেরে ফেলে দিল শার্টের আস্তিন, মাংসের টুকরো এবং একটা আঙুল। স্ট্যানার ভীষণ একটা চিৎকার দিল, ডিমেন্ট কুঠারটি মাথার ওপর তুলে নিল। পরক্ষণে সজোর কোপ বসাল। একবার। দু'বার।

ছিটকে পড়ে গেল স্ট্যানার। অজ্ঞান। নীল হয়ে আছে মুখ। কাঁধের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হাতের গর্ত দিয়ে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে। কাটা হাতটা ম্যাংগলার পেয়েছে। সে রক্তাক্ত হাতখানা যেন পুরে নিল মুখে এবং বন্ধ হয়ে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে লুপ থেকে প্যান্টের বেল্ট খুলল ডিমেন্ট, স্ট্যানারের রক্ত পড়া বন্ধ করতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগল।

ইন্সপেক্টর রজার মার্টিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে হানটন। তিন বছরের প্যাটি হানটনকে বল গড়িয়ে দিতে দিতে তাকে লক্ষ করছে জ্যাকসন।

'ও সবগুলো ফিউজ খুলে ফেলেছিল?' জিজ্ঞেস করছে হানটন। 'তারপরও অফ বাটন কাজ করেনি? হাহ্? ...আয়রনারটাকে কি বন্ধ করা হয়েছে...গুড। গ্রেট। হাহ্? ...নো, নট অফিশিয়াল।' হানটনের কপালে ভাঁজ পড়ল, আড়চোখে তাকাল জ্যাকসনের দিকে। 'সেই রেফ্রিজারেটরের কথা মনে আছে, রজার? ...হ্যাঁ, আমিও। গুডবাই।'

ফোন রেখে সে ফিরে চাইল জ্যাকসনের দিকে। 'চলো, মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে আসি, মার্ক।'

মেয়েটির নিজের বাসা। সুন্দর সাজানো গোছানো লিভিংরুম। ওদের সামনে অস্বস্তি নিয়ে বসে আছে মেয়েটি। হানটন যখন নিজের ব্যাজ দেখিয়েছে মেয়েটির চমকে ওঠা চেহারা দেখে তার সন্দেহ হয়েছে হয়তো কোনও ভজকটের সঙ্গে জড়িত এই মেয়ে। নইলে এমন জড়সড় হয়ে থাকবে কেন?

'আমি অফিসার হানটন আর ইনি আমার সহকর্মী মি. জ্যাকসন। আমরা এসেছি লণ্ড্রির অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়ে কথা বলতে।' সুন্দরী, লাজুক মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে হানটনের নিজেরও বেশ অস্বস্তি লাগছিল।

'ভয়ঙ্কর,' বিড়বিড় করল শেরি উলেট। 'জীবনের প্রথম চাকরি আমার এটা। মি. গার্টলি আমার চাচা। কাজটা করছি কারণ যা বেতন পাই তা দিয়ে আমার দিব্যি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন...খুবই গা ছমছমে।'

'স্টেট বোর্ড অভ সেফটি পূর্ণ তদন্তের জন্য আয়রনারটাকে বন্ধ করে দিয়েছে,' বলল হানটন। 'আপনি কি তা জানেন?'

'জানি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটি। 'জানি না এখন কীভাবে চলব...'

'মিস উলেট,' বাধা দিল জ্যাকসন। 'আয়রনারটা নিয়ে কাজ

করতে গিয়ে আপনিও অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন, না? ক্ল্যাম্পে লেগে আপনার হাত কেটে গিয়েছিল।'

'জি, আমার আঙুল কেটে গিয়েছিল,' মেয়েটির মুখে হঠাৎ আঁধার ঘনাল। 'জীবনের প্রথম দুর্ঘটনা আমার।' সে ওদের দিকে সমর্থন লাভের দৃষ্টিতে তাকাল। 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় অনেক মেয়েই আমাকে সহ্য করতে পারে না...যেন সবকিছুর জন্য আমিই দায়ী।'

'একটা কঠিন প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে,' ধীরে ধীরে বলল জ্যাকসন। 'প্রশ্নটি আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। মনে হতে পারে এটি ব্যক্তিগত এবং সাবজেক্টের বাইরে। যদিও মোটেই তা নয়। আপনার জবাব কখনও কোনও ফাইলে টুকে রাখা হবে না কিংবা রেকর্ডে থাকবে না।'

ভীত দেখাল মেয়েটিকে। 'আ-আমি কি কিছু করেছি?'

হেসে মাথা নাড়ল জ্যাকসন। দুশ্চিন্তামুক্ত হলো মেয়েটি। মনে মনে বন্ধুকে ধন্যবাদ দিল হানটন।

'তবু বলি আপনার জবাবে হয়তো এই ছোট্ট, সুন্দর ফ্ল্যাটটি আপনাকে হাতছাড়া না-ও করতে হতে পারে। আপনি আপনার চাকরিটি ফিরে পাবেন এবং লণ্ড্রিটি আগে যেমন অবস্থায় ছিল সেই চেহারায় ফিরে যাবে।'

'তা হলে আমি যে কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি,' বলল শেরি।

'শেরি, তুমি কি ভার্জিন?'

হাঁ হয়ে গেল মেয়েটি, মস্ত শক খেয়েছে, যেন একজন প্রীস্ট ওর সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান শেষে ঠাস করে গালে চড় বসিয়ে দিয়েছেন। তারপর সে মাথা তুলল, গোছানো অ্যাপার্টমেন্টের ওপরে চোখ বুলাল, যেন ওদেরকে এখনই জিজ্ঞেস করে বসবে ওরা কী করে ভাবছে এই সুন্দর বাসাটি তার গোপন মিলনক্ষেত্র

হবে।

'আমি আমার স্বামীর জন্য নিজেকে রক্ষা করে রাখছি,' সরল গলায় বলল শেরি।

হানটন এবং জ্যাকসন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। হানটন জানে জ্যাকসন সত্য কথাই বলেছে। একটা শয়তান কিংবা অশুভ শক্তি ভর করেছে ওই লণ্ড্রি মেশিনের ওপর এবং ওটাকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করেছে যে কি না নিজেই জ্যান্ত হয়ে উঠতে পারে।

'ধন্যবাদ,' মৃদু গলায় বলল জ্যাকসন।

'এখন কী?' ফেরার পথে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল হানটন। 'ভূতের ওঝা খুঁজব?'

নাক সিটকাল জ্যাকসন। 'ভুয়া ভূতের ওঝা দিয়ে কাজ হবে না। এটা আমাদেরই করতে হবে, জনি।'

'আমরা পারব?'

'হয়তো বা। তবে সমস্যা হলো আমরা জানি কিছু একটা ভর করেছে ম্যাংগলারের ওপর কিন্তু সেটা কী জানি না।' হানটনের গা শিরশির করে উঠল যেন মাংসহীন একটা আঙুল ওকে স্পর্শ করেছে। 'দানব বা অপদেবতাদের তো কোনও অভাব নেই। আমরা যেটাকে নিয়ে কাজ করছি ওটা কি বুবাস্টিস্ কিংবা প্যানের সার্কেলের মধ্যে রয়েছে? নাকি স্বয়ং শয়তানের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে যাচ্ছি? আমরা জানি না। যদি দানবটা নিজে থেকেই ওটার ওপর ভর করে থাকে তা হলে হয়তো আমাদের একটি সুযোগ আছে। তবে লণ্ড্রি মেশিনটার অবস্থা দেখে মনে হয় এর ওপর অশুভ শক্তি লাগাতার ভর করে যাচ্ছে।'

মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে দিল জ্যাকসন। 'কুমারী মেয়ের রক্ত। ইয়েস। তবে এতে সত্যি কাজ হবে কি না সে বিষয়ে আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে।'

‘কেন?’ ভোঁতা গলায় প্রশ্ন করল হানটন। ‘এক্সরসিজমের ফর্মূলা প্রয়োগ করা যায় না?’

কঠোর দেখাল জ্যাকসনের চেহারা। ‘এটা চোর পুলিশ খেলা নয়, জনি। এক্সরসিজমের অনুষ্ঠান খুবই বিপজ্জনক একটি বিষয়। এ যেন নিউক্লিয়ার ফিশন নিয়ে নাড়াচাড়া করা। একটা ভুল হয়েছে কী আমরা শেষ। ওই যন্ত্রটার সঙ্গে একটা দানব আছে। হয় সে ভর করেছে কিংবা ওটার সঙ্গে আটকে রয়েছে। যদি একটা সুযোগ দেয়া যায়–’

‘ওটা ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে?’

‘ওটা সানন্দেই বেরিয়ে আসতে চাইবে,’ থমথমে মুখে বলল জ্যাকসন। ‘কারণ দানবটা মানুষ খুন করতে খুব ভালোবাসে।’

জ্যাকসন পরদিন হানটনের বাসায় এল। দু'জনের গোপন শলা পরামর্শে যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য হানটন তার বউ এবং মেয়েকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছে। ওরা লিভিংরুমে বসল। কীসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না হানটন।

‘আমি আজ ক্লাস ক্যান্সেল করেছি,’ বলল জ্যাকসন। সে স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়ায়। ‘সারাদিন ভূত-প্রেতের বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। বিকেল নাগাদ দানব আহ্বান করার ত্রিশটারও বেশি রেসিপি কম্পিউটারে ঢুকিয়েছি। কিছু কমন এলিমেন্ট পেলাম। তবে সংখ্যায় খুবই কম।’

হানটনকে তালিকা দেখাল সে: কুমারীর রক্ত, কবরের মাটি, হ্যাণ্ড অভ গ্লোরি (ফাঁসি কাষ্ঠে মারা যাওয়া কোনও অপরাধীর ভিনেগারে ভিজিয়ে রাখা শুকনো হাত– লেখক), বাদুড়ের রক্ত, নাইট মস, ঘোড়ার খুর, ব্যাঙের চোখ।

তালিকায় আরও আছে। তবে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

‘ঘোড়ার খুর,’ অন্যমনস্ক গলায় বলল হানটন। ‘ফানি–’

‘খুবই কমন। তবে–’

‘এসব জিনিস– এগুলোর কোনও একটি সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা দাও তো।’

‘নাইট মস হলো একধরনের ছত্রাক। দেয়াল, পাথর বা গাছের গুঁড়িতে জন্মায়। এগুলো দিয়ে কাজ করা যায়।’

‘ঘোড়ার খুরের কথা বলেছ তুমি,’ বলল হানটন। ‘জেলাটিন তৈরি হয় ঘোড়ার খুর দিয়ে। আর ওই লণ্ড্রির মেঝেতে জেলাটিন পাওয়া গেছে।’

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকসন। ‘আর কিছু?’

‘বাদুড়ের রক্ত...ওটা একটা বড় জায়গা। ওখানের দেয়ালে অনেক ফোকর এবং ফাটল আছে যেখানে বাসা বাঁধতে পারে বাদুড়। ম্যাংগলারে কোনও বাদুড় আটকে যেতেই পারে।’

লাল চোখ জোড়া আঙুল দিয়ে টিপে ধরল জ্যাকসন। ‘মিলে যাচ্ছে...মিলে যাচ্ছে।’

‘যাচ্ছে কি?’

‘হ্যাঁ। তবে হ্যাণ্ড অভ গ্লোরিকে আমরা এর থেকে বাইরে রাখতে পারি। মিসেস ফ্রলির মৃত্যুর আগে নিশ্চয় কেউ ওই আয়রনারে কোনও মরা মানুষের হাত ফেলে দেয়নি। আর ওই এলাকায় বিষকাঁটালির কোনও ঝোপ নেই।’

‘কবরের মাটি?’

‘মানে?’

‘ব্যাপারটি কাকতালীয়ই বলা যায়,’ বলল হানটন। ‘তবে ওই লণ্ড্রি শপের সবচেয়ে কাছেই রয়েছে প্লিজ্যান্ট হিল গোরস্তান। ব্লু রিবন থেকে পাঁচ মাইল দূরে।’

‘তোমাকে এখন একটা কথা বলি,’ চিন্তামগ্ন গলায় বলল জ্যাকসন। ‘আমি হ্যাণ্ড অভ গ্লোরি নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলাম। ওটা

হলো কালো জুজু। অত্যন্ত শক্তিশালী জাদু।'

'হলি ওয়াটার দিয়ে ওটাকে থামানো যায় না?'

'হ্যাণ্ড অভ গ্লোরি দিয়ে যে দানবকে ডেকে আনা হয় সে কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে বাইবেল। হলি ওয়াটার, বাইবেল ইত্যাদি হলো হোয়াইট ক্রিশ্চিয়ান ম্যাজিক। ওসব দিয়ে কিছু করতে গেলে আমাদের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। তবু কোনও উপায় না দেখলে–'

'তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত যে–'

'না। তবে মোটামুটি নিশ্চিত ওই মেশিনে শয়তানের আছর আছে। কারণ সবই তো মিলে গেল।'

'কখন রওনা হতে চাও?'

'যত শীঘ্রি সম্ভব ততই মঙ্গল,' বলল জ্যাকসন। 'কিন্তু আমরা ভেতবে ঢুকব কী করে? জানালা ভেঙে?'

হাসল হানটন। পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে বন্ধুর নাকের সামনে ঝোলাতে লাগল।

'কোত্থেকে পেলে? গার্টলি দিল?'

'না,' জবাব দিল হানটন। 'মার্টিন নামে এক স্টেট ইন্সপেক্টর দিয়েছে।'

'সে জানে আমরা কী করছি?'

'বোধহয় জানে। সে আমাকে কিছুদিন আগে একটা অদ্ভুত গল্প বলেছে।'

'ম্যাংগলার নিয়ে?'

'না,' বলল হানটন। 'একটা রেফ্রিজারেটর নিয়ে। চলো বেরোই।'

অ্যাডেল ফ্রলি মারা গেছেন। একজন ধৈর্যশীল কেয়ারটেকার তাঁর খণ্ড বিখণ্ড লাশ সেলাই করেছে, তিনি এখন শুয়ে আছেন

কফিনে। তবে তাঁর আত্মা বোধহয় এখনও মেশিনে রয়ে গেছে। যদি থাকে, ওটা তারস্বরে চিৎকার করছে। তিনি ওদেরকে সাবধান করে দিতে পারতেন। তাঁর হজমে গোলমাল ছিল। F-Z Gel নামে একটি ওষুধ খেয়ে তিনি এ অসুখের চিকিৎসা করতেন। এটি দেশের সমস্ত ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। ৭৯ সেন্ট দাম। ওষুধের বাক্সে লেখা থাকে: F-Z Gel গ্লুকোমার রোগীদের সেবন নিষেধ কারণ এর ভেতরে যে উপাদান রয়েছে তা তাদের অসুখ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। শেরি উলেট মেশিনে হাত কাটার কয়েকদিন আগে অ্যাডেল ফ্রলির হাত ফস্কে F-Z Gel ট্যাবলেটগুলো ম্যাংগলারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তিনি জানতেন না তাঁর বুক জ্বলা নিরাময় করত যে ওষুধগুলো তার মধ্যে বিষকাঁটালির রস ছিল আর ওটি ইউরোপের কিছু দেশে হ্যাণ্ড অভ গ্লোরি নামে পরিচিত।

ব্লু রিবন লণ্ড্রির ভৌতিক নীরবতা অকস্মাৎ ভঙ্গ হয়ে গেল ভুতুড়ে পতপত আওয়াজে– ড্রায়ারের ওপরে, ইনসুলেশনের গর্তে ঢোকার জন্য পাগলের মত ডানা ঝাপটাচ্ছিল একটি অন্ধ বাদুড়।

শব্দটা অনেকটা খিকখিক হাসির মত।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সচল হয়ে উঠল ম্যাংগলার, একপাশে কাত হয়ে গেল– বেল্টগুলো আঁধারের মাঝে দ্রুত চলছে, খাঁজকাটা চাকা এবং তারের জালিগুলো একত্রিত হলো, ওজনদার পালভারাইজিং রোলারগুলো ক্রমাগত ঘুরে চলল।

এটা এখন ওদের জন্য রেডি।

মাঝরাতের কিছু পরে পার্কিংলটে গাড়ি ঢোকাল হানটন। কতগুলো চলন্ত মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে চাঁদ। সে ব্রেক কষল, অফ করে দিল হেডলাইট। বন্ধ করল ইগনিশন। কারখানা থেকে দুমদাম হুসহাস আওয়াজ ভেসে আসছে। ‘ওটা

ম্যাংগলার,' মৃদু গলায় বলল ও। 'নিজেই চালু হয়ে গেছে। এই মাঝরাতে।'

ওরা একমুহূর্ত বসে রইল চুপচাপ। টের পেল ভয়ের একটা সাপ পা বেয়ে উঠছে।

হানটন বলল, 'অলরাইট। লেট'স ডু ইট।'

ওরা নামল গাড়ি থেকে। হাঁটা দিল ভবনের উদ্দেশে। ম্যাংগলারের শব্দ ক্রমেই উচ্চকিত হয়ে উঠছে। হানটন সার্ভিস ডোরের তালায় চাবি ঢোকাতে ঢোকাতে ভাবল যন্ত্রটার শব্দ একদম জ্যান্ত– যেন গরম শ্বাস ফেলছে আর নিজের সঙ্গে হিসহিস শব্দে উপহাসের সুরে ফিসফিস করছে।

'একজন পুলিশের সঙ্গে আছি বলে নিশ্চিন্ত বোধ করছি,' বলল জ্যাকসন। হাতে ধরা বাদামী রঙের ব্যাগটি সে অন্য হাতে নিল। ভেতরে রয়েছে জেলির ছোট একটি জার, তাতে হলি ওয়াটার এবং একটি বাইবেল।

ভেতরে পা রাখল ওরা। দরজার ধারের সুইচ টিপে বাতি জ্বালল হানটন। শীতল, ফ্লুরেসেন্ট আলোয় ভরে গেল ঘর। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ম্যাংগলার।

রোলারের ওপর বাষ্পের কতগুলো ঝিল্লি। অশুভ নীরবতা নিয়ে যন্ত্রটা যেন ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'গড, কী কুৎসিত দেখতে,' ফিসফিস করল জ্যাকসন।

'চলো,' বলল হানটন। 'আমার ভয় লাগছে।'

ওরা ওটার কাছে হেঁটে গেল। সেফটি বারটি বেল্টের ওপর ডাউন পজিশনে রয়েছে।

হাত বাড়িয়ে দিল হানটন। 'মার্ক, জিনিসটা আমাকে দাও এবং কী করতে হবে বলো।'

'কিন্তু–'

'কোনও তর্ক নয়।'

জ্যাকসন ওর হাতে ব্যাগটি দিল। হানটন মেশিনের সামনে, বিছানার চাদর রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি টেবিলের ওপর ব্যাগটি রাখল। সে জ্যাকসনকে বাইবেলটি দিল।

'আমি পড়ছি,' বলল জ্যাকসন। 'যখন ইঙ্গিত দেব আঙুল দিয়ে মেশিনটার গায়ে হলি ওয়াটার ছিটাবে। বলবে: পিতা এবং পুত্রের নামে বলছি এবং হলি গোস্টের নামে বলছি এ জায়গা থেকে তুমি চলে যাও, নোংরা শয়তান। বুঝতে পারলে?'

'হুঁ।'

'আবার যখন ইশারা করব ওয়েফার ভেঙে মন্ত্রটি পুনরাবৃত্তি করবে।'

'কাজ হচ্ছে কি না বুঝব কী করে?'

'বুঝতে পারবে। অশুভ শক্তিটা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এ কামরার সবগুলো জানালা ভেঙে ফেলতে পারে। তবে প্রথমবারে কাজ না হলে আমরা শেষপর্যন্ত চালিয়ে যাব চেষ্টা।'

'ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে,' বলল হানটন।

'আমারও তাই।'

'হ্যাণ্ড অভ গ্লোরির ব্যাপারে আমাদের যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে–'

'ভুল হয়নি,' বলল জ্যাকসন। 'শুরু করলাম।'

বাইবেল পড়তে লাগল সে। তার কণ্ঠ খালি লণ্ড্রিতে ভুতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলল। মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তার হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল। ম্যাংগলার এখনও চুপচাপ। তবে জ্যাকসনের মনে হচ্ছে ওটা ওর দিকে তাকিয়ে যেন মিটিমিটি হাসছে।

'...এবং ভূমি তোমাকে বমি করিয়া ফেলিয়া দিবে তুমি ইহা নোংরা করিয়াছ বলিয়া যেভাবে তোমার সম্মুখে জাতিগুলাকে বমি করিয়া দিয়াছে।' মুখ তুলে চাইল জ্যাকসন, তার চেহারা

টানটান। সে ইশারা করল।

হানটন ফিডার বেল্টের ওপর পবিত্র জল ছিটাল।

অকস্মাৎ তীব্র চিৎকার করে উঠল মেশিন, যেন ফোস্কা পড়ে গেছে গায়ে। ক্যানভাসের বেল্টের যেখানে হলি ওয়াটার পড়েছে সেখান থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। ওগুলো মোচড় খাচ্ছে, লাল টকটকে হয়ে যাচ্ছে গা। ম্যাংগলার হঠাৎ প্রবল একটা ঝাঁকি খেল।

'পেয়েছি!' চিৎকার দিল জ্যাকসন। 'এবারে ওটা পালাবে।'

সে আবার বাইবেল পাঠ শুরু করল। যন্ত্রপাতির শব্দ ছাপিয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠল তার কণ্ঠ। আবার ইঙ্গিত করল হানটনকে এবং হানটন পবিত্র ওয়েফার ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিল লণ্ড্রি মেশিনের গায়ে। হঠাৎ হাড় জমাট করা আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল তার দেহে; পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখানে আসাটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ওদেরকে ধোঁকা দিতেই যন্ত্রটা প্রলুব্ধ করেছে– ওরা যা ভেবেছে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ম্যাংগলার।

জ্যাকসনের গলার স্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে, পৌঁছে যাচ্ছে ক্লাইম্যাক্সে।

মেইন মোটর এবং সেকেণ্ডারির মাঝখানের আর্কে জ্বলে উঠতে শুরু করল স্ফুলিঙ্গ; বাতাস ভরে গেল ওজোন গ্যাসের গন্ধে। যেন গরম রক্তের তামাটে গন্ধ; ভয়ঙ্কর গতি ম্যাংগলারের, উন্মাদের মত চলছে, এখন কেউ একটা আঙুল স্পর্শ করুক বেল্টে, মেশিনটা গোটা শরীর চোখের পলকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাঁচ সেকেণ্ডে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড বানিয়ে ফেলবে। ওদের পায়ের নিচের কংক্রিটের মেঝে কাঁপছে থরথর করে।

চোখ ঝলসানো বেগুনি আলো নিয়ে একটা মূল বিয়ারিং বিস্ফোরিত হলো, শীতল বাতাস ভরে গেল বজ্র-বিদ্যুতের গন্ধে; এখনও ম্যাংগলার চলছে, দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে তার গতি,

বেল্ট, রোলার এবং খাঁজকাটা চাকাগুলো এমন ভয়ানক গতিতে ছুটছে যেন সবগুলো মিলেমিশে এক হয়ে গেছে, আলাদাভাবে কোনওটাকে চেনা যাচ্ছে না।

প্রায় সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল হানটন, হঠাৎ পিছিয়ে গেল এক কদম। 'ভাগো!' চিৎকার দিল সে।

'আমরা ওটাকে প্রায় বাগে পেয়ে গেছি!' জ্যাকসনও ফিরিয়ে দিল চিৎকার। 'কেন–'

একটা বর্ণনাতীত কুৎসিত ছেঁড়াফাঁড়ার শব্দ হলো এবং কংক্রিটের মেঝেতে তৈরি হলো বড়সড় ফাটল, হা হা করে ওটা ছুটে এল ওদের দিকে গর্তের বিস্তৃতি প্রতি সেকেণ্ডে বাড়িয়ে দিতে দিতে। পুরানো সিমেন্টের ভাঙা টুকরোগুলো ফুলঝুরি হয়ে শূন্যে ছিটকে যেতে লাগল।

জ্যাকসন ম্যাংগলারের দিকে তাকাল এবং চিৎকার দিল।

ওটা কংক্রিট থেকে বিচ্যুত হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যেন আলকাতরার গর্তে পড়া একটা ডাইনোসর ফাঁদ থেকে বেরুবার চেষ্টা করছে। ওটাকে এখন আর কাপড় ইস্ত্রি করা যন্ত্রের মত লাগছে না। ওটার শরীর বদলে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে। ৫৫০ ভোল্টের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়ে নীল আগুন ছিটাল, ছিটকে পড়ল মেঝেতে। একমুহূর্তের জন্য মনে হলো দুটো আগুনের গোলা যেন ওদের দিকে চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে, সেই চোখে প্রবল খিদে।

আরেকটা ফল্ট লাইন ছিঁড়ে গেল। ম্যাংগলার ওদের দিকে ঝুঁকল, মেঝের সঙ্গে আটকে রাখা কংক্রিটের খুঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন করল নিজেকে। যন্ত্রটা ওদের দিকে লোভাতুর ভঙ্গিতে তাকাল; সেফটি বারটি সজোরে বন্ধ হলো। হানটনের মনে হলো বাষ্প ভরা ওটা একটা ক্ষুধার্ত মুখ।

ওরা দৌড়াবার জন্য ঘুরল। ঠিক তখন পায়ের নিচে

আরেকটা ফাটল তৈরি হলো। ওদের পেছনে গগনবিদারী হুংকার, জিনিসটা নিজেকে এখন পুরোপুরি মুক্ত করে ফেলেছে। হানটন লাফ দিয়ে পার হলো গর্ত তবে জ্যাকসন হোঁচট খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল।

হানটন ঘুরল বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য। একটা প্রকাণ্ড ছায়া পড়ল ওর গায়ে, ঢেকে দিল ফ্লুরেসেন্টের আলো।

ছায়াটা দাঁড়াল জ্যাকসনের সামনে। সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মৃত্যু ভয়ে বিকৃত চেহারা– বুঝতে পারছে আর রক্ষা নেই। তাই চিৎকারও দিচ্ছে না। হানটন শুধু কালো, বিরাট উঁচু কী একটা যেন দেখতে পেল ঠিক বুঝতে পারছে না জিনিসটা কী, নড়াচড়া করছে। জ্বলজ্বলে বিদ্যুতের চোখ, ফুটবলের মত বড় এবং গোল গোল, প্রকাণ্ড হাঁ করা মুখ, ভেতরে লকলক করছে ক্যানভাসের জিভ।

সে দৌড় দিল; পেছন থেকে ভেসে এল জ্যাকসনের মৃত্যু চিৎকার।

ঘন ঘন বেল বাজার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রজার মার্টিনের। সে দরজা খুলে হানটনকে দেখে আঁতকে উঠল।

হানটনের চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে, থাবার মত হাত দিয়ে মার্টিনের রোব খামচে ধরল। কাটা গাল দিয়ে রক্ত পড়ছে, মুখ বোঝাই সাদা সিমেন্টের পাউডারে।

তার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে।

'বাঁচাও...ফর যীশাস'স সেক, বাঁচাও আমাকে। মার্ক মরে গেছে। মারা গেছে জ্যাকসন।'

'আস্তে, আস্তে,' বলল মার্টিন। 'এসো। লিভিংরুমে বসবে চলো।'

হানটন ওর পিছু নিল, গলা দিয়ে আহত কুকুরের গোঙানি

বেরিয়ে আসছে।

মার্টিন ওকে দুই আউন্স হুইস্কি দিল। গ্লাসটা দু'হাতে চেপে ধরে এক ঢোকে তরলটা গিলে নিল হানটন। হাত থেকে পড়ে গেল গ্লাস, আবার মার্টিনের রোবের ল্যাপেল চেপে ধরল সে।

'ম্যাংগলার হত্যা করেছে মার্ক জ্যাকসনকে। ওটা...ওটা...ওহ, গড! ওটা বেরিয়ে আসতে পারে! ওটাকে বেরিয়ে আসতে দেয়া যাবে না! আমরা...ওহ...' উন্মাদের মত একটা চিৎকার দিল হানটন। তীক্ষ্ণ, অমানুষিক আর্তনাদ।

মার্টিন ওকে আরেক গ্লাস মদ দিল কিন্তু হানটন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ওটা। 'ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে,' বলল ও। 'ওটা বের হয়ে আসার আগেই পুড়িয়ে ছাই করতে হবে। ওহ, ওটা যদি বেরিয়ে আসে কী হবে? ওহ্, যীশাস, ওটা যদি–' হঠাৎ চোখ উল্টে পড়ে গেল মেঝেতে। অজ্ঞান।

মিসেস মার্টিন দাঁড়িয়ে ছিল দোরগোড়ায়, গলার কাছে চেপে ধরেছে রোব। 'কে এই লোক, রগ? এ কি পাগল? আমি ভাবলাম–' শিউরে উঠল সে।

'ও পাগল নয়,' স্বামীর চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে আতঙ্ক বোধ করল মহিলা।

ঘুরল মার্টিন ফোন করার জন্য। রিসিভার তুলল এবং পাথর হয়ে গেল।

বাড়ির পুব দিকে অস্পষ্ট একটা শব্দ হচ্ছে, যেদিক থেকে কিছুক্ষণ আগে এসেছে হানটন। শব্দটি ক্রমে বেড়ে চলল। দুমদাম, ঠনঠন, যান্ত্রিক আওয়াজ। লিভিং রুমের জানালা অর্ধেক খোলা, বাতাসে কেমন বিশ্রী একটা গন্ধ পেল মার্টিন। ওজোন গ্যাসের গন্ধ...নাকি রক্তের গন্ধ?

অকেজো রিসিভার হাতে নিয়ে প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়েই থাকল ও, ওদিকে শব্দটা ক্রমে বেড়েই চলেছে। হুসহাস শব্দ হচ্ছে। যেন

রাস্তায় কেউ গরম বাষ্পের নিঃশ্বাস ফেলছে। রক্তের গন্ধটা তীব্রতর হলো ঘরে। গুলিয়ে এল গা।

মার্টিনের হাত থেকে খসে পড়ে গেল ফোন।

ওটা বেরিয়ে পড়েছে।

মধ্যরাতের আতঙ্ক

পূর্বাভাস

বরিশাল জেলা শহর থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে, শ্রীমন্ত নদীর তীরে পাদ্রিশিবপুর। তিনশ' বছর আগে একদল খ্রীষ্টান মিশনারি ছবির মত সাজানো গ্রামটিতে আসেন ধর্ম প্রচারণার উদ্দেশ্য নিয়ে। এখন অবশ্য এটি পুরোদস্তুর শহর। একদা এখানে খ্রীষ্টানদের আধিপত্য ছিল বেশি। এখনও অধিকাংশ বাসিন্দাই ক্রিশ্চিয়ান। সাহেবরা ইউরোপীয় স্টাইলে ঘরবাড়ি বানিয়েছিলেন। এসব বাড়িতে সেলার বা বেসমেন্ট রয়েছে। ঘরগুলোতে হলওয়ে, স্টর্মডোর (মূল দরজার উপর লাগানো আলাদা একটি কাচের দরজা বা প্যানেল, যা ঝড়-ঝাপটা থেকে মূল দরজাকে রক্ষা করে), পোর্টিকো ইত্যাদি সবই বিদেশী স্টাইলে তৈরি। সেইসব ভবনের কয়েকটি এখনও অক্ষত। তারই একটির অবস্থান কিং স্ট্রিটের শেষ মাথায়, দীপদের বাড়ির বিপরীতে। আলফ্রেড কিং নামে এক ইউরোপিয়ান সাহেব এ বাড়ির নির্মাতা। তিনি এ এলাকার জমিদার ছিলেন। নানান জনহিতৈষীমূলক কাজকর্ম করতেন বলে এলাকার লোকজন তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধাও করত। তবে ১৯৬০ সালে, তাঁর স্ত্রী টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে কিং সাহেব বাড়িটি জনৈক মোবারক মৃধার কাছে ভাড়া দিয়ে চলে যান একা একা এ দেশে তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছিল বলে। মুসলিম লীগ কর্মী মোবারক

একাত্তরে রাজাকার নেতা হয়ে পাদ্রিশিবপুরের আতঙ্কে পরিণত হয়। তবে এলাকার বাঙালিদের ওপর বেশিদিন সে অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে পারেনি। নভেম্বরের এক ঘন বাদলা রাতে মুক্তিবাহিনীর একটি দল এসে গুলি করে মেরে ফেলে মোবারক এবং তার রাজাকার ছেলে তোবারককে। স্বাধীনতার পরে দীর্ঘদিন খালি পড়ে ছিল কিং হাউস। পঁচাত্তরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে বাড়িটি বেদখল হয়ে যায়। তবে এরশাদ আমলে এ বাড়ির লিজ নিয়ে নেয় স্থানীয় চার্চ। এ চার্চের বয়স ৩০০ বছর। পর্তুগীজ জলদস্যু গনজালেস চার্চটির প্রতিষ্ঠাতা। চার্চ কর্তৃপক্ষ কিং হাউসকে শুরুতে গেস্ট হাউস হিসেবে ভাড়া দিয়েছেন। বাড়ির মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে, অভ্যন্তরীণ কিছু আধুনিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এটিকে পরবর্তীতে বাড়ি হিসেবে ভাড়া দেয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এত বিশাল একটি বাড়ি, ভাড়া কম হওয়া সত্ত্বেও ওখানে বেশিদিন ভাড়াটেরা থাকতে চায় না। অনেকেই বলেছে 'কিং হাউস' থেকে নাকি রাত বিরেতে ভৌতিক চিৎকার, খলখল হাসি, গোঙানি, আর্তনাদ ইত্যাদি নানারকম ভীতিকর আওয়াজ শোনা যায়। এটা গুজবও হতে পারে কারণ দীপ এবং তার মা গত চার বছর ধরে এ এলাকায় আছে, কখনও কোনও ভৌতিক ঘটনা ঘটতে দেখেনি। আর গত দুই বছর ধরে তিনতলা ওই প্রাচীন বাড়িটি ফাঁকাই পড়ে আছে, কোনও ভাড়াটেকে উঠতে দেখেনি ওরা। দীপ জানতও না এতদিন পরে বাড়িটি আবার ভাড়া হয়েছে এবং ওই বাড়ির বাসিন্দারা তার জন্য নিয়ে আসছে দুঃস্বপ্নময় মধ্যরাতের আতঙ্ক...

এক

মারিয়া রোজারিওর বয়স আঠারো। সে দীপের সহপাঠী, বান্ধবী এবং প্রেমিকা। ওরা দু'জনেই শহরের একমাত্র বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল অ্যাণ্ড কলেজে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। মারিয়ার বাবা বরিশাল জেলা জজ কোর্টের সাব জজ। মা গৃহিণী। অপূর্ব সুন্দরী মারিয়া অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং অনেকটাই পাশ্চাত্য ঘেঁষা। নভেম্বরের হালকা এ শীতের সময় সে ঘরে শর্টস আর টিশার্ট পরে থাকে, বাইরে গেলে তার প্রিয় ড্রেস জিনস, শার্ট, কনভার্স শু এবং লাল রঙের একটি জ্যাকেট। মারিয়া গাড়ি চালাতে পারে, বিয়ার খেতে ভালোবাসে, ডিস্কো এবং পার্টি তার খুবই প্রিয় এবং হুটহাট রেগে যাওয়া তার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ কারণে সবাই মারিয়াকে সমঝে চলে। মারিয়াকে সামাল দিতে দীপকে মাঝে মধ্যে বেশ বেগই পেতে হয়। মারিয়াকে সে ভয় করে, ভালোওবাসে অনেক বেশি। তাই হয়তো মারিয়া যখন ওকে রেগে 'রামছাগল' বলে গালি দেয় ও খুব একটা মাইণ্ড করে না। ছটফটে মেয়েটিকে দীপের মা মিসেস মাধুরী রডরিক খুব পছন্দ করেন। তাঁর বাড়িতে মারিয়ার অবারিত প্রবেশ। এমনকী সে রাত আটটার সময়েও যদি এসে ঘোষণা করে আজ এসেছে দীপকে অ্যাকাউণ্টিং বুঝিয়ে দেবে বলে এবং রাতে আন্টির সঙ্গে ডিনার করে তবে বাড়ি ফিরবে, মিসেস রডরিক খুব খুশি হন। দীপ অ্যাকাউন্টিং-এ একটু কাঁচা আর মারিয়ার মাথা এ বিষয়ে অত্যন্ত সাফ বলে ওরা যখন ঘরের দরজা আটকে অংক কষে, তিনি কিছুই মনে করেন না।

মারিয়ার মা মিসেস শেলি রোজারিও তাঁর মেয়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীপকে পছন্দ করেন ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী বলে। ফলে দীপের সঙ্গে মারিয়ার অবাধ মেলামেশায় তিনি কখনও বাধা দেন না। বরিশালে কমার্স পড়ার জন্য সেরা দুটি সরকারি কলেজ থাকা সত্ত্বেও তিনি এখানকার বেসরকারি কলেজে একমাত্র মেয়েকে ভর্তি করেছেন তার জেদের কারণে। সে-ই অন্য কোথাও ভর্তি হতে চায়নি। তিনি অবশ্য জানেন না তাঁদের আদরের মেয়েটি সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ ছেড়ে অন্য কোথাও ভর্তি হতে চায়নি দীপের জন্য। দীপের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ক্লাস নাইন থেকে। কখন যে ওরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে গিয়েছে নিজেরাও জানে না। এস. এস. সি.-র পরে দীপ যখন বলল তার মা চান না সে বরিশালের কোনও কলেজে গিয়ে পড়ুক কারণ ওখানে বড্ড রাজনৈতিক দলাদলি আর মারামারি, মারিয়া তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেয় সে-ও এ শহর ছেড়ে যাবে না। যদিও মাধ্যমিকে সে খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল– গোল্ডেন এ পেয়েছিল যা কমার্সের খুব কম ছাত্রছাত্রীই পেয়ে থাকে। দীপ পেয়েছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ।

মারিয়া আজ রাতে দীপকে অ্যাকাউন্টিং-এর অংক শেখানোর ছুতোয় এলেও তার একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। আজ সে দীপের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে। দীপের জন্য তার মায়া হয়। কারণ সুদর্শন গর্দভটা এতটাই লাজুক এবং ভদ্র যে আজতক মারিয়াকে চুমু খাওয়ার কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি। চুম্বন বা একটু আধটু আদরে মারিয়ার মোটেই আপত্তি নেই। প্রেমিকাকে কিস করার অধিকার তো দীপের আছেই এবং এ ব্যাপারে বাবুর ইচ্ছা যে ষোলো আনা তা তার অভিব্যক্তি দেখেই বোঝা যায়। তবে নিজে থেকে এগিয়ে আসার সাহস পায় না বোধকরি মারিয়া ফোঁস করে ওঠে কি না সে ভয়েই! তাই মারিয়াকেই অগ্রণী

ভূমিকা পালন করতে হলো।

কিন্তু ঘটনা যখন ঘটতে শুরু করল, ওকে জড়িয়ে ধরেছে দীপ, আবেশে চোখ বুজে এসেছে মারিয়ার, ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে লাল টুকটুকে কমলাকোয়া ওষ্ঠদ্বয়, এমন সময় টের পেল আলিঙ্গনে বাঁধা দীপের শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে। তার মুখে গরম নিঃশ্বাস পড়ছিল দীপের, এখন আর পড়ছে না। তারপর ওকে দারুণ হতাশ এবং অবাক করে দিয়ে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করল দীপ। চোখ মেলে চাইল মারিয়া এবং রীতিমত ধাক্কা খেয়ে দেখল তার প্রেমিকপ্রবর এমন দারুণ একটা সুযোগ স্রেফ পায়ে ঠেলে ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখে বিনোকিউলার। গভীর মনোযোগে কী যেন দেখছে। দীপের সঙ্গে সবসময় একটা বিনোকিউলার থাকে। এটি দিয়ে সে মানুষ, প্রতিবেশী, প্রকৃতি ইত্যাদি দেখে।

'দীপ!' ছটফট করে উঠল মারিয়া। প্রেমের উদ্দাম সাগরে সে আজ ভেসে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু এসময় কী হলো দীপের? বিনোকিউলারে অমন মনোযোগ দিয়ে সে কী দেখছে?

'মারিয়া,' হঠাৎ বলে উঠল দীপ। 'বললে বিশ্বাস করবে না দু'জন লোক একটা কফিন নিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকছে।'

'এখানে এসো,' বিছানায় গিয়ে বসল মারিয়া। মদালসা ভঙ্গিতে হাসল। 'ওসব ফালতু জিনিস দেখার চেয়ে অনেক ভাল কিছু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'মারিয়া, আমি সিরিয়াস।'

'আমিও।'

'না, তুমি বুঝতে পারছ না। ওরা...যীশাস, ওরা কফিন নিয়ে সেলারে ঢুকল।'

উত্তেজিত মারিয়াও। এবং একই সাথে অধৈর্য হয়ে উঠছে। 'ডার্লিং, ওসব বাদ দাও তো। বিছানায় এসো। আমার শীত

করছে।'

জবাবে কেবল বিড়বিড় করল দীপ। 'ঈশ্বর!' জানালার ওধারে একটু সরে গেল।

'দীপ,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল মারিয়া। 'তুমি আসবে নাকি আসবে না?'

'মারিয়া, এখানে এসো। দেখো।' যেন মারিয়ার কথা ও শুনতেই পায়নি। 'ফর ক্রাইস্ট'স সেক এমন আজব দৃশ্য জীবনে দেখিনি...'

'ওকে, দ্যাট'স ইট!' চেঁচাল মারিয়া, ঝট করে উঠে দাঁড়াল। দুপদাপ পা ফেলে এগোল দরজায়। ওর দিকে ঘুরল দীপ।

'তুমি আসলেই একটা রামছাগল, দীপ,' হিসিয়ে উঠল মারিয়া। রাগে জ্বলছে চোখ। 'তোমাকে কী দিতে চেয়েছিলাম তার কথা স্রেফ ভুলে যাও।' একটা আঙুল তুলল দীপের দিকে শাসানোর ভঙ্গিতে, 'আমার সঙ্গে যদি আর কোনওদিন কথা বলেছ!'

'কিন্তু...কিন্তু...' প্রেমিকার রুদ্রমূর্তি দেখে বোকা বনে গেছে দীপ। বোকার মত হাতে ধরে আছে বিনোকিউলার। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার কাছ থেকে তফাতে,' খেঁকিয়ে উঠল মারিয়া, ডোর নবে মোচড় দিল সজোরে। দড়াম শব্দে খুলে গেল দরজা, ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল সে, প্যাসেজ পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

ওর সমস্ত কামনা-বাসনা ফুটো হওয়া বেলুনের মত চুপসে গেছে। সে জায়গায় ভর করেছে তীব্র ক্রোধ। দীপ নিশ্চয় এতটা বোকা নয় যে ওকে সান্ত্বনা দিতে আসবে। তা হলে এক ঘুষিতে দীপের নাক ফাটিয়ে দেবে মারিয়া।

কিন্তু দীপ আসছে, মারিয়ার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে পেছন

পেছন চলে আসছে। মারিয়া ইচ্ছে করে দুড়ুম দাড়ুম শব্দে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। আশা করছে বিকট শব্দে দীপের মার ঘুম ভেঙে যাবে এবং মারিয়া কেন রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল সে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে পেরেশান হয়ে যাবে দীপ।

'মারিয়া, প্লিজ!' কাতর গলায় ডাকল দীপ। ওর পেছনে পায়ের শব্দ পাচ্ছে মারিয়া। 'আমার কথা বিশ্বাস করো। ওই লোকগুলোর মতলব ভালো ঠেকেনি আমার...অদ্ভুত কিছু একটা করছে ওরা।'

'অদ্ভুত কিছু একটা তুমি করছ, দীপ,' গলায় বিষ ঢালল মারিয়া। থামল না সে, পেছন ফিরেও তাকাল না।

'ওদের কাছে কফিন দেখেছি আমি!' অবশেষে মারিয়ার নাগাল পেল দীপ, একটা হাত রাখল কাঁধে।

'তাতে কী হলো!' চেঁচাল মারিয়া, পাঁই করে ঘুরল। চমকে গেল দীপ। ওকে চমকে দিয়ে আমোদ পেল মারিয়া। 'শোনো, এতই যদি তোমার কফিন প্রেম, তা হলে যাও না, ওদের সঙ্গে কফিন বহন করো গে।' ওর কথা শুনে হতভম্ব দীপ।

'একটা কাজ করো,' ওকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্য বলল মারিয়া। 'একটা গর্ত খুঁড়ে ওর মধ্যে শুয়ে পড়ো। প্রতিবেশীরা তখন তোমার জন্য কফিন নিয়ে আসবে।'

'মারিয়া!'

একই সঙ্গে দু'জনে পা রাখল মেঝেয়। মারিয়া লম্বা পদক্ষেপে এগোল ড্রইংরুমের দরজার দিকে। দীপ ওর পেছনে। 'আমি–' বলতে গেল মারিয়া, বাধা পেল একটি কণ্ঠে।

'মারিয়া? দীপ?' সুরেলা কণ্ঠটি হাঁক ছাড়ল। 'কী হয়েছে?'

দীপের মা মাধুরী রডরিক। ড্রইংরুমের মাঝখানে, সোফায় বসে টিভি দেখছেন। ওদের দিকে পেছন ফেরা। তবে তাঁকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। মারিয়া দ্রুত পরনের পোশাক ঠিক

করল। নিজেকে অকস্মাৎ আস্ত একটা বোকা মনে হলো তার।

'তোমরা আবার ঝগড়া শুরু করেছ বুঝি?' মিষ্টি গলায় বললেন মিসেস রডরিক।

'না, মা। ঝগড়া করছি না।' দীপ মারিয়াকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ড্রইংরুমে। বিব্রত দেখাচ্ছে ওকে। মারিয়ার হঠাৎ মায়া লাগল ওর জন্য।

'মাঝে মধ্যে একটু আধটু ঝগড়া, মন কষাকষি মন্দ নয়।' ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন মিসেস রডরিক। 'এইমাত্র সানন্দায় একটা লেখা পড়লাম। ওতে লিখেছে যারা বিয়ের আগে ঝগড়াঝাঁটি করেনি সেসব দম্পতির ডিভোর্স হয় সবচেয়ে বেশি–শতকরা আটাত্তর ভাগ।'

'মা, আমরা এখনও কলেজের গণ্ডি পেরোইনি,' বিলাপের মত শোনাল দীপের কণ্ঠ।

'ওহ্, তাই তো! মনেই ছিল না।' একমুহূর্তের জন্য বিস্মিত হওয়ার ভান করলেন তিনি, তারপর উজ্জ্বল হাসিতে ভরিয়ে তুললেন মুখ। 'তবে আগে প্ল্যান করে রাখলে পরে কম ভুগবে।' ছেলের সঙ্গে তার অত্যন্ত ফ্রেণ্ডলি সম্পর্ক। তাই গার্লফ্রেণ্ড-বয়ফ্রেণ্ড, রিলেশন, প্রেম ইত্যাদি নিয়ে খুব ফ্রিভাবে কথা বলেন।

মিসেস রডরিককে খুব পছন্দ করে মারিয়া। একজন আদর্শ মা, বিকেল বেলা টিভিতে যেসব মায়েদের দেখানো হয়, সুশ্রী গৃহিণী, মিসেস মাধুরী তেমনই স্নেহময়ী একজন মা। তাঁর চেহারায় চমৎকার মা মা একটি ভাব আছে, বয়স মধ্য চল্লিশ, মুখখানা সবসময় হাসিহাসি। অসম্ভব মিষ্টি একজন মহিলা, তবে একটু পাগলাটে...তাঁর ছেলের চেয়েও বোধহয় বেশি।

শাশুড়ি হিসেবে আন্টি দারুণ হবেন, মনে মনে বলল মারিয়া।

'মারিয়া,' বললেন মিসেস রডরিক। 'তোমার মাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। ছুটিতে তাঁর সঙ্গে তাস খেলার কথাটা মনে

করিয়ে দিতে ভুলো না। উনি পেকান পাই নিয়ে এলে আমি ওনার জন্য সুজির হালুয়া বানাব।' খিলখিল করে হাসলেন তিনি। মারিয়ার মার পেকান পাই শহর বিখ্যাত।

'নিশ্চয় বলব,' বলল মারিয়া।

'থ্যাংক ইউ, মামণি।' ওঁরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসিতে উদ্ভাসিত হলেন। *মানুষ এত চমৎকার হয় কী করে?* মনে মনে বলল মারিয়া। মিসেস রডরিক বললেন, 'দীপের অংক কষে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ। বেচারা। স্কুলে পড়ার সময় অংক নিয়ে আমাকেও অনেক নাকানি চোবানি খেতে হয়েছে।'

খিলখিলিয়ে হাসলেন তিনি। মারিয়া মনশ্চক্ষে দেখতে পেল পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সেও একইভাবে হেসে চলেছেন তার আন্টি। ভারী মিষ্টি লাগছে তাঁকে। এ নারী যৌবনে দেখতে না জানি কত সুন্দরী ছিলেন।

এমন একজন নারীকে মি. রডরিক কেন যে ছেড়ে চলে গেলেন!

মিসেস রডরিক তাঁর স্কুলের গল্প বলতে লাগলেন। মারিয়া এক সেকেণ্ডের জন্য মনোযোগ ফেরাল দীপের দিকে। ভাবছে *আমি কি ওর জন্য এখনও সত্যি পাগল? ও কী ভাবছে আমাকে নিয়ে?*

দীপ যথারীতি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাইরে।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করল মারিয়া। তবে ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কিছুই দেখতে পেল না।

আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মারিয়ার। তবে মিসেস রডরিককে বুঝতে দিল না যে আবার ওর মাথায় চড়ে যাচ্ছে রাগ। 'আমি এখন যাব,' বলল ও। 'মাকে বলে এসেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরব। কিন্তু দেরি হয়ে গেল।'

'খেয়ে যাও?'

'না, আন্টি। আজ থাক। আরেকদিন এসে খাব।'

'আচ্ছা, গুডনাইট। সাবধানে যেয়ো।' হাসিহাসি মুখে বললেন তিনি। এমনকী যখন সিরিয়াস কথা বলেন তখনও হাসতে থাকেন মিসেস রডরিক। হাসিটা বোধহয় তাঁর রক্তমাংসে ঢুকে গেছে।

'আমি সাবধানেই যাব,' বলল মারিয়া। জানালার দিকে ফিরল ও। 'গুডনাইট, দীপ।'

'হুঁ, গুডনাইট,' বিড়বিড় করে বলল দীপ, ডুবে আছে নিজের চিন্তায়।

ব্যস, শেষ তীরটা ছোঁড়া হয়ে গেল। দীপের সঙ্গে বহুবার সম্পর্কের টানাপোড়েন হয়েছে মারিয়ার। তারপরও দীপকে নিজের অনুভূতির কথা জানিয়েছে ও। কিন্তু দীপটা আগের মত রামছাগলই রয়ে গেল। ওর বিনোকিউলার সবসময় ভুল দিকে ফোকাস করে।

দরজা বন্ধ করে চলে যাচ্ছে মারিয়া তবু ওদিকে ফিরে দেখল না দীপ।

দুই

'কাজটা তুই ঠিক করিসনি,' বললেন দীপের মা। 'মারিয়াকে তোর রিক্সা করে দেয়া উচিত ছিল।'

'কী?' বলল দীপ। ওর পূর্ণ মনোযোগ এখনও প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে। ও বাড়িতে আলো জ্বলছে। অথচ গত দুই বছরে কখনও ও বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেনি দীপ।

'কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। তুই ওর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিস।'

'হ্যাঁ, তবে...' তর্ক করতে চাইল না দীপ। তর্ক করার অবকাশও নেই। ঠিকই বলেছেন মা। সত্যি, মারিয়ার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে দীপ।

কিন্তু ঘটনা হলো এই যে ও সত্যি দেখেছে পরিত্যক্ত বাড়িটির বেসমেন্টে দুটো অচেনা লোক একটি কফিন নিয়ে ঢুকেছে। আর ড্রইংরুমে এখন বাতি জ্বলছে। মারিয়ার উচিত ছিল ওর সঙ্গে রাগারাগি না করে বরং দু'জনে মিলে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা। ওখানে কী ঘটছে জানতে ইচ্ছে করছে দীপের।

'মা,' বলল ও, 'পাশের বাড়িতে কয়েকজন লোক দেখলাম।'

'নিশ্চয় নতুন ভাড়াটে এসেছে।'

'ভাড়াটে? কারা?'

'তা জানি না। ওই বাড়িটি তো একদমই গেছে। ওখানে বাস করতে হলে অনেক কিছু মেরামত করতে হবে।'

'আমি মরে গেলেও ওখানে যাব না।'

হাসলেন তিনি। মা সবসময় হাসেন। মাঝে মাঝে দীপের মনে হয় মাকে বলে সবসময় এমন করে হেসো না তো! বিরক্তিকর! অবশ্য মাঝে মাঝে ভালোই লাগে মার হাসি। কিন্তু আজ ভাল লাগছে না।

চোখ বুজল দীপ। কফিনটা ভেসে উঠল মনের চোখে: প্রকাণ্ড কফিন, অলংকৃত, চারপাশ পেতল দিয়ে মোড়ানো। খুবই সুন্দর কারুকাজ, দেখে মনে হয় অনেকদিনের পুরানো জিনিস।

তা হলে ও জিনিস দেখার পরে গায়ের রক্ত এমন ঠাণ্ডা হয়ে এল কেন দীপের? ওটার কথা কেন সে মন থেকে দূর করে দিতে পারছে না?

ওর প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন কীর্তনখোলা টিভি চ্যানেলের নিউজে সদ্য সংবাদের স্ক্রলে একটি লেখা বারবার ভেসে উঠতে লাগল: আজ রাতে বরিশালের লঞ্চঘাটের পেছনে এক লোকের

মুণ্ডহীন একটি লাশ পাওয়া গেছে...

ঝট করে দীপের চোখ চলে গেল জানালায়। পড়শীর বাড়ির জানালার পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে। জানালা বন্ধ।

ওটা ছিল ভয়ঙ্কর এক ঘটনার শুরু মাত্র।

তিন

ঘণ্টা বেজে তৃতীয় পিরিয়ডের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। খোলা দরজা দিয়ে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে এল ছাত্র-ছাত্রীর দল, করিডরের গোলকধাঁধা ধরে ছুটল।

তবে ২৩৪ নম্বর কক্ষ থেকে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীর মত নিজেকে টেনে বের করল দীপ। এটি কুখ্যাত মি. ঝুনুর রুম। তাঁকে ছাত্ররা ঠাট্টা করে ডাকে ঝুনা নারকেল যিনি কি না দশ টন হোমওঅর্কের আবিষ্কর্তা। আজ তিনি অ্যাকাউন্টিং পরীক্ষা নিয়েছেন। পরীক্ষায় গোল্লা পেয়েছে দীপ।

দীপের শুকনো, বিমর্ষ মুখ দেখে দাঁত বের করে হাসল হরর হাবলু হালদার। নাম হাবলু কিন্তু ওর মত বিটকেল এবং বদমাইশ ছেলে গোটা ক্লাসে নেই। সে বেজায় বেঁটে, মাথার চুল কেটেছে অদ্ভুত স্টাইলে, রবারের মত মুখটাকে সে যেমন ইচ্ছা বাঁকাতেড়া করতে পারে। সে এখন হাসছে। তার শয়তানি হাসি দেখলে যে কারও পিত্তি জ্বলে যায়।

'অমন মন খারাপ করে থেকো না, দীপ্তো,' হাসতে হাসতে বলল হরর হাবলু। 'এ কলেজ থেকে পাশ করতে খুব বেশি পড়াশোনা করার প্রয়োজন হয় না।'

'বকবক কোরো না তো, হরর। তোমার বকবক শুনে আরও মেজাজ খারাপ হচ্ছে,' বলল দীপ।

'আমাকে ঠাট্টা করে হরর ডাকো আর যা-ই বলো, বস্। তবে অংক নিয়ে ডিগবাজি তুমি খাচ্ছ, আমি নই।'

দীপ রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সুন্দর একজোড়া পদযুগল ধরা পড়ল চোখের কোণে। পাঁই করে ঘুরল ও। মারিয়া। নাকটা আকাশের দিকে খাড়া রেখে গটগট করে হেঁটে যাচ্ছে। বুকে ধরে রেখেছে বইপত্র।

'মারিয়া!' হাসিমুখে ডাক দিল দীপ।

ওকে দেখেও না দেখার ভান করল মারিয়া। চোখমুখ শক্ত করে হেঁটে চলল। মিশে গেল ভিড়ের মাঝে।

'কী ব্যাপার?' হাঁসের মত প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠল হাবলু। 'ও কি অবশেষে তোমার আসল চেহারাটা চিনে ফেলেছে?'

'শাট আপ, হাবলু! সবসময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না।'

'ওওও আমি ভয় পাচ্ছি!' নাকি সুরে বলল হাবলু। 'ভয়ের চোটে আমি এখন হিসু করে দেব!'

'দূরে গিয়া মর!' খেঁকিয়ে উঠল দীপ, ছুটল যেদিকে মারিয়া গেছে সেদিকে। গত শনিবার রাতের ওই ঘটনাটার পর থেকে মারিয়া ওর সঙ্গে বাতচিত বন্ধ করে দিয়েছে। দীপ ভয় পাচ্ছে ভেবে মারিয়া হয়তো আর কোনওদিনই ওর সঙ্গে কথা বলবে না। ভিড়ের মধ্যে মারিয়াকে খুঁজে পাবে কি না জানে না দীপ তবু খুঁজবে সে ওকে। ফোর্থ পিরিয়ড হয়তো মিস হয়ে যাবে। যাক। ও ব্যাকুল চোখে খুঁজতে লাগল মারিয়াকে।

ওর পেছন থেকে ভেসে এল হরর হাবলুর হরর হাসি। ভৌতিক হাসিটা কেন জানি রক্ত হিম করে দিল দীপের।

ও জানে না শীঘ্রি রক্ত জমাট বাঁধা ঘটনা ঘটতে চলেছে ওর জীবনে।

চার

সন্ধ্যা। প্রিয় বাহন আকাশনীল রঙের সাইকেলটি নিয়ে বেরিয়েছে দীপ। ঘণ্টাখানেক ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে চালাচ্ছে। শুধু মারিয়ার কথা ভাবছে।

মারিয়ার কাছে ওর ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু কীভাবে ক্ষমা চাইবে জানে না। মেয়েটাকে ভীষণ মিস করছে ও, খালিখালি লাগছে বুকের ভেতরটা। মারিয়াকে দেখতে ভীষণ মন চাইছে। এমন একটা বুদ্ধি বের করতে হবে যাতে দু'জনের ঝগড়া মিটে গিয়ে আবার গড়ে ওঠে সখ্য।

মারিয়ার কথা ভাবছে দীপ, একই সঙ্গে পড়শীদের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই কফিনের দৃশ্যটা মগজ থেকে তাড়াতে পারছে না।

দীপ সাইকেল চালাতে চালাতে কখন নিজেদের বাসার সামনে চলে এসেছে খেয়ালই নেই। রাস্তার পাশে দাঁড়া করাল তার বাহন। বিরাট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। দেরি হওয়ার কৈফিয়ত চাইবেন মা। কিছু একটা বানিয়ে বলতে হবে দীপকে। ওর মা সবসময় খবরদারী করা টাইপের মহিলা নন। তবে দীপের আদ্যোপান্ত সবকিছু তাঁর জানা চাই। দীপ কোথায় যায়, কার সঙ্গে কথা বলে খুঁটিনাটি সমস্ত খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন তিনি। পৃথিবীর সকল মা-ই বোধহয় এরকম ভাবছে দীপ।

সাইকেল থেকে নেমেছে দীপ, কিংস্ট্রিটের মোড়ে হাজির হলো একটি ট্যাক্সি ক্যাব। নিশ্চয় বরিশাল থেকে এসেছে। কারণ এখানে ক্যাব সার্ভিসের ব্যবস্থা নেই। বরিশালে এক ক্যাব কোম্পানির কয়েকটি গাড়ি আছে। দীপ দেখল ক্যাবটা ঘুরে ওর

দিকে আসছে। গাড়িটা ঠিক ওদের বাড়ির সামনে থেমেছে বলে রীতিমত চমকে গেল ও।

আরও চমকাল যখন দেখল ক্যাব থেকে নেমে এল ওর দেখা সবচেয়ে সেক্সি এক নারী এবং সে হেঁটে এসে ওর সামনে দাঁড়াল।

মহিলার মাথার চুল রাতের মত কালো, কটা রঙ চোখ এবং অবিশ্বাস্যরকম সুন্দরী। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। তার ফিগার যে কারও বুকের ধুকপুকানি বাড়িয়ে দেবে, গা কামড়ে থাকা গাউন টাইপের কালো ড্রেসটা শরীরের লোভনীয় খাঁজগুলো প্রকটভাবে প্রকাশ করছে। মহিলা যখন ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, দীপের মনে হলো ওর হাঁটুজোড়া মাখনের মত গলে গেছে এবং ও এখুনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে রাস্তায়।

'এটা নাইনটি-নাইন কিং স্ট্রিট?' রাস্তা হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়ের ভঙ্গিতে বলল মহিলা। তার লিপস্টিকচর্চিত লাল ওষ্ঠদ্বয় দীপের হার্টবিট দ্বিগুণ করে দিল।

'আ-হ্-বা-ব্বা,' দীপের মুখ দিয়ে অস্ফুটে দুর্বোধ্য শব্দগুলো বেরিয়ে এল। মহিলা ওর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে জানে না তার প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করছে দীপ।

'আ-ইয়ে না। ওটা ও-ওই যে ওই বাড়িটা,' কাঁপা আঙুলে পড়শীর বাড়ি দেখিয়ে দিল সে।

'ধন্যবাদ,' বেড়ালের মত আদুরে কণ্ঠে বলল মহিলা। নিতম্বে মাথা খারাপ করা ঢেউ তুলে পা বাড়াল গন্তব্যে। দীপের অজান্তে মুখ দিয়ে মৃদু লয়ের শিস বেরিয়ে এল। ওর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মহিলা, মুচকি হাসল। লজ্জা পেল দীপ তবে সেও মুখে হাসি ফোটাতে ভুল করল না।

এ মহিলাকে যদি এখানে নিয়মিত দেখা যায় তা হলে দারুণ

হবে, মনে মনে বলল দীপ। পড়শী লোকটা যে-ই হোক না কেন তার রুচিবোধ দারুণ।

শালার ভাগ্যবান কাকে বলে!

দীপ দেখল মহিলা হেঁটে প্রাচীন বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়াল, লম্বা, সরু, পদ্মকলি আঙুল দিয়ে চেপে ধরল কলিংবেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। কে মহিলাকে দরজা খুলে দিল দেখতে পেল না দীপ। তবে ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হওয়ার সময়ও মহিলার হাসিমুখ নজর এড়াল না ওর।

পাঁচ

ডাইনিং-এ ঢুকল দীপ আলুজ চিপস আর ফ্রিজ থেকে কোক নিতে। মা টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। আসলে পড়ছেন না বলে বলা উচিত ওতে চোখ বোলাচ্ছেন। সারাদিন কাজ করে এসে মা বেজায় ক্লান্ত। বেশিক্ষণ জেগে থাকতেও পারবেন না।

পুরানো বাড়িটিতে আলো জ্বলছে। মহিলার কথা আবার মনে পড়ল দীপের। একবার উঁকি দিল জানালা দিয়ে। ও বাড়ির সবগুলো জানালার পর্দা ফেলা। মার দিকে ফিরল দীপ।

'মা, আমাদের নতুন পড়শীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'না,' হাই তুললেন মিসেস মাধুরী বজরিক। 'তবে তার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।'

'কী কথা?'

'যেমন তার নাম লুসিয়ানো মানুচ্চি। ইটালিয়ান। তবে চমৎকার বাংলা বলে। বয়সে তরুণ এবং দেখতে দারুণ সুদর্শন।' হাসতে হাসতে হাই তুললেন তিনি। 'শুনলাম পেশায়

সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। পায়রা নদীর ওপর ব্রিজ হচ্ছে। সে সেটার তদারক করতে এসেছে। আগে বরিশাল থাকত। মেয়েরা তাকে দেখলেই নাকি হামলে পড়ত। রাতবিরাতে বিরক্ত করত। তাই নিরিবিলির জন্য এখানে এসেছে। লোকটা বোধহয় নারী বিদ্বেষী। মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করে না।'

হেসে ফেলল দীপ। কোঁচকাল কপাল। 'না,' বলল ও। 'আমার তা মনে হয় না।'

'আচ্ছা? তুই বোধহয় এমন খবর জানিস যা আমি জানি না।' প্রায় ক্ষুধার্তের ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে এলেন মিসেস রডরিক।

'না, না। আমি ওদের সম্পর্কে কিছুই জানি না।' ফ্রিজ খুলে কোকের একটা ক্যান বের করল দীপ। তবে ডাইনিং টেবিলের কৌটায় আলুজ পেল না। 'চিপস টিপস কিছু নেই?'

'না,' বললেন মা। একটু বিরতি দিয়ে জানতে চাইলেন, 'তো লুসিয়ানো মানুচ্চি সম্পর্কে তুই কী জানিস বললি না?'

'বললাম তো কিছুই জানি না।' দীপ কদম বাড়াল ড্রইংরুমে। 'আমি পড়তে গেলাম।'

'তুই পড়াশোনা করছিস?' মহা অবাক মিসেস রডরিক।

'বাহ্, পরীক্ষায় পাশ করতে হলে পড়তে হবে না?' ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিল দীপ। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। মা পেছন থেকে বিড়বিড় করে কী বললেন বুঝতে পারল না।

কথা সত্য। দীপ এখন পড়াশোনায় সিরিয়াস। একাদশ শ্রেণীতে পড়ছে ও। ক্লাসের প্রায় সব বিষয়ই মোটামুটি আয়ত্তে আনতে পারে সে, অ্যাকাউন্টিং ছাড়া। অনেকগুলো হোমওঅর্ক করা হয়নি। আজ সারারাত লেগে যাবে অংকগুলো কষতে।

অ্যাকাউন্টিং-এর অঙ্ক নিয়ে বসে পড়ল দীপ। খোলা বইটা যেন ওর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করছে। এ বিষয়টি কিছুতেই

ঢুকতে চায় না মাথায়। অংক নিয়ে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল দীপ। কোকের ক্যানটা খুলে ঢকঢক করে গিলল শীতল তরল।

অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আবার যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে দীপ এমন সময় রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল ভয়ঙ্কর এক চিৎকারে।

ঝাঁঝালো মিষ্টি পানি ঝর্ণার মত উদ্গীরণ হলো শূন্যে, বাদামী রঙের লক্ষ লক্ষ বুদ্বুদ ছড়িয়ে পড়ল টেবিল, বই এবং খাতাপত্রে। শ্বাস রোধ হয়ে এল দীপের, নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল কোক, গলায় যেন আগুন ধরে গেল। চোখে পানি এসে গেল ওর। দু'হাতে চেপে ধরল মুখ।

নিজেকে যখন সামলে নিয়েছে দীপ ততক্ষণে চারদিক আবার সুনসান। মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য শোনা গিয়েছিল চিৎকারটা। তবে ওটা কল্পনা নয়। এখনও চিৎকারটা ঝনঝন শব্দে বাজছে দীপের কানে। মরণ এক আর্তনাদ, বাতাস ছিঁড়ে ফালাফালা করে দেয়া এক সেকেণ্ডের বীভৎস একটা শব্দ।

তারপর নীরবতা।

বিকট এক নৈঃশব্দ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল দীপ। কিং হাউসের সমস্ত বাতি নেভানো। অন্ধকারের চাদরে ঢাকা বাড়ির দেয়াল। চিৎকারটা কি ও বাড়ি থেকে এল? সুন্দরী মহিলার মুখচ্ছবি ভেসে উঠল দীপের মনছবিতে। মহিলার চেহারা আর ওই চিৎকার দুটো যেন একই সুতোয় গাঁথা।

দীপ মনে মনে বলল, আর কোনওদিন হয়তো মহিলার চেহারা দেখব না আমি।

অ্যাকাউন্টিং-এর হোমওঅর্ক খাতাটা এখনও খোলা। কোকাকোলার বুদ্বুদগুলো সাদা খাতার ওপর রক্তের মত লাল

দেখাচ্ছে। ওদিকে তাকিয়ে কেন যেন শিউরে উঠল ও।

ছয়

প্রিয় ঘোড়ামিয়ার দোকানে বসে আছে দীপ। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুলকাচ্ছে মাথা। ওর সামনের প্লেটে সিঙ্গারা, দীপের পেটে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ।

কিন্তু সিঙ্গারার কথা বোধহয় ভুলেই গেছে দীপ। আশপাশে লোকজন কথা বলছে, হৈচৈ করছে, সিগারেট ফুঁকছে। কিন্তু নিজের ভাবনায় নিমগ্ন দীপের চিন্তায় তাতে ব্যাঘাত ঘটল না।

ঘোড়ামিয়ার দোকানের সিঙ্গারা অতি বিখ্যাত। বরিশাল থেকেও লোকে আসে এই কলিজার সিঙ্গারা খেতে। একটা বিগতযৌবনা খালের ওপর ঘোড়ামিয়ার কাঠের দোকান। দোকানে সে একটা টিভিও ফিট করে রেখেছে। চব্বিশ ইঞ্চি সাদা কালো ফিলিপস কোম্পানির টিভি। ১৯৮০ সালে কেনা কিন্তু এখনও চমৎকার সার্ভিস দিচ্ছে। তরুণরা যারা কখনও সাদা কালো টিভি দেখেনি তাদের কাছে বিশাল পর্দার এ টিভিটি খুবই আকর্ষণীয় একটি বস্তু। নাম ঘোড়ামিয়া কিন্তু চেহারাটা তার মোটেই ঘোড়ার মত নয়, তবু কেন তাকে সবাই ঘোড়ামিয়া বলে খোদা মালুম। শুধু সিঙ্গারা নয়, তার পুরি এবং পিঁয়াজুও অতি সুস্বাদু। ঘোড়া মিয়ার স্বভাব অত্যন্ত মধুর বলে তার এখানে লোকের আড্ডাটাও বেশ জমে। তবে এখানে সবাই আসে মজা করতে, দুশ্চিন্তা করতে নয়। কিন্তু আমাদের দীপের কোনও কারণে মন খুবই খারাপ। সে মুখে হাত ঘষতে ঘষতে হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল, 'আমার দিনগুলো পোড়া কপালে। আমার

জীবনটাও তাই...'

প্লেটের সিঙ্গারা দুটো সমবেদনার চোখে তাকিয়ে রইল দীপের দিকে। দীপ ভাবছিল, *সারারাত আমাকে হোমওঅর্ক করতে হয়। তারপরে ঝুনা নারকেলের ক্লাসে এসে ঘুমিয়ে পড়ি। এভাবে জীবন চলে না, দীপাঞ্জল। তোমার ফালতু জীবনটা হয়তো এই কলেজেই কাটিয়ে দিতে হবে।*

সে বছর বছর ফেল করছে আর একাদশ শ্রেণীতেই পড়ে রয়েছে, ওদিকে তার বন্ধুরা সবাই পাশ করে, গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হাসতে হাসতে, ওকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলছে 'আদু ভাই' এ ভাবনাটা দীপের মধ্যে বমিবমি ভাব এনে দিল। সে সিঙ্গারার দিকে এক পলক তাকিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল প্লেট। ওর জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। একদম ধ্বংস হয়ে গেছে।

'মারিয়া আমাকে ঘেন্না করে,' বিড়বিড় করল দীপ। শব্দগুলো টক হয়ে যাওয়া দুধের মত ডেলা পাকাল গলায়।

ও আর আমাকে চুমু খাবে না। চুমু দূরে থাক, ও আমার সঙ্গে আর কোনওদিন কথাই বলবে না।

রেমো ডি'সুজাকে কি কখনও এরকম নারী সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে হয়েছে?

না, ভাবল দীপ। রেমো ডি'সুজা কখনও এরকম সমস্যায় পড়েননি। কোনও লোকের কফিন নিয়ে তিনি দিনরাত ভেবে মরেন না। বরং রেমো এসব সমস্যাকে পাত্তাই দেবেন না। রেমো ডি'সুজা হলেন *মধ্যরাতের আতঙ্ক* নামে একটি হরর সিরিজের উপস্থাপক ও অভিনেতা। কীর্তনখোলা টিভি চ্যানেলে আগে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত বারোটায় তাঁর এই হরর সিরিজটি দেখানো হত। এখন পনেরো দিন পরপর দেখায়। দীপ হাঁ করে গেলে সিরিজটি। তার সবচেয়ে প্রিয় অভিনেতা ও ব্যক্তিত্ব হলেন ষাট ছুঁইছুঁই এই ভদ্রলোকটি।

প্রিয় হিরো রেমো ডি'সুজাকে নিয়ে ভাবনায় এমন বুঁদ হয়ে ছিল দীপ যে খেয়ালই করেনি মারিয়া এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। ওকে এক মুহূর্ত দেখল মারিয়া। দীপ কপালের দু'পাশের রগ চেপে আছে হাতে। প্রবল হতাশাগ্রস্ত চেহারা।

ওর জন্য মায়া লাগল মারিয়ার। ভারী মিষ্টি গলায় ডাকল, 'হাই, দীপ...'

কোনও সাড়া নেই। হয়তো ওর বিরহেই এমন কাতর। আবার ডাকল মারিয়া, 'হাই, দীপ...'

মুখ তুলে চাইল দীপ। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ।

'মারিয়া?' তারপর কী মনে পড়তে দ্রুত বলল, 'মারিয়া! শোনো, আমি ওই রাতের জন্য সত্যি দুঃখিত। আমি এমন বোকা। আমি-'

'দোষটা আমার ছিল, তোমার নয়,' গলায় সবটুকু মধু ঢেলে বলল মারিয়া।

'ছিল?' এ জবাব আশা করেনি দীপ।

'আ-হ্যাঁ...' মাথা দোলাল মারিয়া সেক্সি ভঙ্গিতে। হালকা স্পর্শ করল দীপকে।

দীপের মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। মারিয়ার হাতটা চেপে ধরল। আড়চোখে একবার এদিক-ওদিক দেখে নিল। ছোট্ট এ শহরের অনেকেই ওদেরকে চেনে। তাই কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে নেই। তবু গলার স্বর নামাল দীপ, 'মারিয়া, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি সেদিনের জন্যে খুবই শরমিন্দা। তোমার সঙ্গে আমি আর কোনওদিন ঝগড়া করব না। ঠিক আছে?'

টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মারিয়া। মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত চেহারা। 'গড, আমাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে বলে আমার যে কী ভাল লাগছে! জানো, গত কয়েকদিন

আমার বড্ড মন খারাপ ছিল। দীপ, আমি...' চোখ নেমে এল টেবিলে, লজ্জা লজ্জা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমরা যেখানে বিরতি দিয়েছিলাম, আজ রাতে সেখান থেকে আবার শুরু করতে চাই। ঠিক আছে?'

কোনও সাড়া নেই।

'দীপ?' হাসি মুখে চোখ তুলে চাইল মারিয়া।

দীপের মনোযোগ ওর দিকে নয়, টিভির দিকে, বুঝতে পেরে মুখ থেকে মুছে গেল হাসিটা। দীপ টিভির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'দীপ, আমার কথা শুনছ তুমি?'

দীপ কারও কথা শুনছে না। তার সমস্ত মনোযোগ এ মুহূর্তে টিভি পর্দায় কেন্দ্রীভূত। সে সব ভুলে গেছে– গোটা পৃথিবী, প্রেম, মারিয়া, ঘোড়ামিয়ার সিঙ্গারা–সব কিছু তার কাছে এখন ধূসর, সে বিকেল পাঁচটার স্থানীয় খবর দেখছে হাঁ করে। কীর্তনখোলা টিভি চ্যানেলে খবর হচ্ছে। বরিশালের সাবেক মেয়রের চ্যানেল বলে ঘোড়ামিয়া বেশিরভাগ সময় এ চ্যানেলটিই খুলে রাখে।

বরিশালে আরেকটা খুন হয়েছে। দপদপিয়া ব্রিজের নিচে, ধানখেতে লাশটি পাওয়া গেছে। জায়গাটা ভালই চেনে দীপ। মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ ধানখেত। লাশ লুকোবার পারফেক্ট প্লেস বলা যায়। ভিক্টিমের চেহারা দেখাল পর্দায়।

বড্ড পরিচিত মুখ।

এ তো সেই অসম্ভব সেক্সি মহিলা। ও, মাই গড, একে তো গতকালই দেখেছি...

...সেই চিৎকার...

কান খাড়া হয়ে গেছে দীপের। শুনছে সংবাদ পাঠক বলছে, 'পুলিশ লুবনা সৈকতের হত্যাকারীদের খুঁজছে। সাবেক

মডেল লুবনা "বরিশাল কিলার"-এর সর্বশেষ শিকার। কর্তৃপক্ষ বলছেন...'

খবরটি ঘোড়ামিয়ার দোকানের খদ্দেরদের মধ্যে একটা গুঞ্জন তুলল।

'জানো গতকাল আহাদ চাচার কাছ থেকে কী খবর শুনে এসেছি?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দীপ। হরর-হাবলু। ওর পাশে দাঁড়িয়ে বোকার মত হে হে করে হাসছে।

'তোমার খবর মানেই তো জঘন্য কিছু,' মুখ বাঁকাল দীপ।

হাসতে হাসতে হাবলু বলল, 'চাচা বলল গত দুই হপ্তায় একই ধরনের দুটো খুন হয়েছে। দু'জনেরই ধড় থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে মুণ্ডু। এ নিয়ে শহর তোলপাড়। চাচা আছে দৌড়ের ওপর। প্যান্ট খুলে যায় এমন অবস্থা। তবে আসল ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছ?'

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে সে। 'আসল ব্যাপার হলো বরিশাল শহরে একটা পিশাচ ঢুকেছে, দোস্তো। এই যে দেখো আরেকটা খুন হলো। নিশ্চয় সেই পিশাচটার কাজ। ওটা কবে আমাদের শহরে ঢুকে পড়ে সেই ভয়েই আমি অস্থির!' শিউরে ওঠার ভান করল সে।

'দী-প...' পেছন থেকে ভেসে আসা কণ্ঠটি দীপের রক্ত জমিয়ে দিল।

'মারিয়া?...' পাঁই করে ঘুরল দীপ। ওর দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে আছে মারিয়া। তারপর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরল সে। গটগট করে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে। ওকে পেছন থেকে আবার ডাকল দীপ। কিন্তু শুনল না মারিয়া। অসহায় দাঁড়িয়ে রইল দীপ। আর ওর দিকে তাকিয়ে শেয়ালের মত খ্যাঁক খ্যাঁক হাসতে লাগল হরর হাবলু।

সাত

বাড়ির গ্যারেজে সাইকেল ঢোকাল দীপ। এ বাড়ির মালিক তাঁর গাড়ি রাখার জন্য গ্যারেজটি বানিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকায় তাঁর মেয়ের কাছে চলে গেছেন। বোধহয় আর ফিরবেন না। মিসেস মাধুরী রডরিক বাড়িঅলার নামে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতিমাসে বাড়ি ভাড়া জমা দেন। এইচএসবিসির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকাটা চলে যায় বাড়িঅলার নিউ ইয়র্ক অ্যাকাউন্টে। তবে গ্যারেজের ভাড়া তাঁকে দিতে হয় না। ওটা বাড়িঅলা এমনিই ব্যবহার করতে দিয়েছেন দীপকে। ওর সাইকেলে একটি আয়নাও আছে। তাতে নিজের মুখখানা দেখল। ক্লান্ত চেহারা। বইপত্র নিয়ে নেমে এল সাইকেল থেকে। পা বাড়াল গ্যারেজের বাইরে। সামনে উদ্ভাসিত হলো পড়শীদের বাড়ি। গ্যারেজের সামনে বাগান এবং ঝোপ। তারপর প্রাচীন বাড়িটি। বাড়িটি তিনতলা। ভিক্টোরিয়ান কায়দায় গড়ে তোলা। এ পাড়ার সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীনতম ভবন। কালের দংশনে বাড়িটি তার শ্রী হারিয়েছে অনেকটাই। বাড়ির সামনে খাটো একটা ঝোপ চলে গেছে ড্রাইভওয়ের সমান দৈর্ঘ্য নিয়ে। পড়শীর বাগানে ফুলের গাছের চেয়ে আগাছার সংখ্যাই বেশি। বাড়ির ভিতটাকে গ্রাস করে রেখেছে আগাছা, বেসমেন্টের জানালাগুলো আগাছার কারণে প্রায় অদৃশ্য। এরপরে স্টর্ম

ডোর। ওদিকেই কফিন নিয়ে গিয়েছিল ওরা।

নিজের অজান্তেই ওদিকে পা বাড়াল দীপ। ওর মস্তিষ্ক যেন ওকে চালাচ্ছে। ওকে যেন জানতে হবে ওখানে কী ঘটছে। আর তার একটাই উপায় আছে...

ফুটপাতে বইগুলো রেখে ঝোপ ঠেলে এগিয়ে চলল দীপ। এপাশ থেকে উঠোনটিকে আরও বেশি হতশ্রী লাগছে। চকিত চাহনিতে একবার দেখে নিল চারপাশ, নিজেদের বাড়িটিকে দেখাচ্ছে মরূদ্যানের মত। পা টিপেটিপে স্টর্ম ডোরের দিকে এগোল দীপ।

দরজার সামনে চলে এল ও, জানালায় উঁকি দিল। লাভ হলো না কোনও। প্রতিটি জানালার পর্দা ফেলা।

জানালা দিয়ে লাফিয়ে নিচে নামল দীপ। স্টর্ম ডোরগুলো পরীক্ষা করল। বিশালকায় এবং ভারী। বাড়িটির মতই শতবর্ষী পুরানো। হাতল ধরে মোচড় দিল দীপ। খুলল না। দরজায় নতুন তালা ঝুলছে। এ ধরনের তালা বড় শহরের মানুষজন নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু ওদের ছোট মফস্বল শহরে? উঁহুঁ, এখানে এরকম কোনও তালা লাগানোর দরকার পড়ে না কারও।

তবে না যদি কারও কিছু লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়।

হাঁটু মুড়ে বসে বেসমেন্টের জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছিল দীপ, হঠাৎ পেছন থেকে ভেসে আসা একটি কণ্ঠ ওকে বরফের মত জমিয়ে দিল।

'অ্যাই, ছোকরা! ওখানে কী করছ তুমি?'

লাঞ্চ খেলে পুরো খাবারটাই এ মুহূর্তে বমি হয়ে যেত দীপের। কণ্ঠটি শুধু কঠিন এবং কর্কশ নয়, হিমশীতল। এরকম কণ্ঠের অধিকারীরা বিনা কারণেই যে কাউকে খুন করতে পারে।

দীপ চেহারায় ভাবলেশহীন ভাব ফোটানোর চেষ্টা করে

ঘুরল। না ফিরে দেখলেই বরং ভালো করত।

যে কথা বলেছে সে নিঃসন্দেহে সেই কফিন বহনকারী দুই পড়শীর একজন। রূঢ়, নমনীয়তাশূন্য একটা মুখ, ঘন ভুরুর নিচে কুচকুচে কালো চোখ।

চোখ জোড়া শীতল। ও চোখের ভাষা পড়া যায় না। লোকটা দু'কদম সামনে বাড়ল। দীপ সাথে সাথে পিছু হঠল, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল স্টর্ম ডোরের গায়ে। ভয়ে উড়ে গেছে জান। কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল জিভ। 'কি-কিছু না।'

সবুজ চেকশার্ট লোকটার গায়ে, কালো প্যান্ট। ডান হাতে মস্ত একটা বাঁকানো হাতুড়ি ভীতিকর ভঙ্গিতে নাড়ছে। হাসল সে। আসলে তার ঠোঁট জোড়া ফাঁক হলো এবং দেখা গেল চমৎকার মসৃণ দু'পাটি দাঁত। তবে হাসিতে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র লেশ নেই। তার চোখ জোড়ার শীতল ভাবে একটুও পরিবর্তন ঘটল না।

'মি. লুসিয়ানো মানুচ্চি অপরিচিত লোকজন একদম পছন্দ করেন না,' বলল সে।

'আ, জি, জি। আমি যাচ্ছি।' আরও কয়েক সেকেণ্ড তো তো করল দীপ। তারপর ঘুরল। ঝোপ ঠেলে যাচ্ছে, টের পেল ওর পিঠ বেয়ে নামছে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত।

ফুটপাত থেকে বইগুলো তুলে নেয়ার সময় সাহস করে একবার পেছন ফিরে চাইল দীপ। চলে গেছে লোকটা। বাড়িটিকে আরও অন্ধকার, বিশালাকার এবং ভুতুড়ে লাগছে।

আট

টানা চারঘণ্টা বিনোকিউলার দিয়ে পড়শীর বাড়ির দিকে তাকিয়ে

নজরদারি করার পরে দারুণ শ্রান্ত দীপ এখন ঘুমাচ্ছে। তবে জেগে থাকলে দেখতে পেত একটি ট্যাক্সি ক্যাব পড়শীর বাড়ির সামনে থেমে, একজন যাত্রী নামিয়ে দিয়ে আবার চলে গেছে। দেখত অচেনা মানুষটি সিঁড়ি বেয়ে পড়শীর দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে, একটু পরে জ্বলে উঠেছে বাতি। আলো জ্বলছে জানালায়। ঠিক দীপের ঘরের সোজাসুজি জানালাঅলা ঘরে জ্বলছে বাতি।

কিন্তু এসব কিছুই দেখতে পেল না দীপ। কারণ তখন সে ঘুমাচ্ছে অঘোরে।

এবং স্বপ্ন দেখছে।

স্বপ্নে বাজছে মিউজিক: ভৌতিক, আবেদনময় মিউজিক। যেন ওর শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের মত। আর কাদের যেন গলা শুনতে পাচ্ছে দীপ: ফিসফিস করে কথা বলছে, শুকনো পাতার খসখস আওয়াজের মত শোনা যাচ্ছে কণ্ঠস্বর। তবে কী বলছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঘরে কেউ এসে ঢুকল। ঘরটা গরম। ভেতরে কস্তুরির গন্ধ। নারী শরীরের স্পর্শ পেল দীপ। সেতারের সুর ঝঙ্কারের মত স্পর্শ। ক্ষুধার্ত। অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে দীপ। হাত চলে যাচ্ছে মহিলার পেটে, বুকে, ঘাড়ে।

মহিলার ঘাড়ের গড়ন ভারী সুন্দর।

মহিলাকে দারুণভাবে চাইছে দীপ।

মহিলার ঘাড়ের কাছ থেকে চুল ঠেলে সরিয়ে নিয়ে ওখানটাতে চুমু খেল দীপ, ঘাড়ের ঋজু পেশীতে ঘষল দাঁত, লবণাক্ত ত্বকের স্বাদ জিভে। ওর ভেতরে কামনার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ: মহিলাকে স্পর্শ করবে ও, জিভ বুলাবে গায়ে, চুমু খাবে...

মহিলাকে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল দীপ। মহিলা ঘুরল ওর দিকে। তাকাল...

...মহিলার চোখ জ্বলজ্বল করছে। লাল টকটকে মণি, বেড়ালের মত ঝকমক করছে। চোখের সকেট জোড়া সরু হয়ে গেল, কুঞ্চিত হলো গায়ের মাংস, হাঁ হয়ে গেল মুখ, বেরিয়ে পড়ল লম্বা এবং ভয়ানক ধারাল দাঁতের সারি। মহিলার তীক্ষ্ণ নখ বসে গেল দীপের পিঠে এবং...

নয়

একটা ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল দীপ।

'কী আজব স্বপ্ন!' চোখ ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় করে বলল ও। এমন সময় মিউজিক ভেসে এল কানে।

কিং হাউসের জানালা দিয়ে ভেসে আসছে যন্ত্রসঙ্গীত। জ্বলছে আলো। বিনোকিউলার খামচে ধরে বিছানায় উঠে বসল দীপ।

জানালার পর্দা তুলে দেয়া হয়েছে, ঘরের ভেতরের প্রায় সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। দীপের গলা শুকিয়ে এল। মিউজিক আসছে ওই ঘর থেকে।

ভৌতিক, আবেদনময় যন্ত্রসঙ্গীত...

জানালা খোলা। বাতাসে পতপত করে উড়ছে পর্দা। এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছে জানালার সামনে, মিউজিকের তালে শরীর দোলাচ্ছে। কাঁধ থেকে খসে পড়েছে শাড়ির আঁচল, দুধ সাদা উন্মুক্ত পেট দেখা যাচ্ছে।

ঢোক গিলল দীপ। বিনোকিউলারে আঠার মত লেগে রইল চোখ।

মেয়েটা আরও যৌনাত্মক ভঙ্গিতে শরীর দোলাতে লাগল। তাকিয়ে আছে দূরে, যেন কিছু একটা দেখে সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। তারপর, দীপকে দারুণ চমকে দিয়ে সে খুলে ফেলল ব্লাউজ এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, চাঁদের আলোয় তার আবক্ষ মূর্তিটি ঝিলিক দিল।

নগ্ন নারী শরীর দেখার সৌভাগ্য আজতক হয়নি দীপের। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হচ্ছে না তার, সে ঝুঁকে এল সামনে। টিভি চলছিল। এক থাবড়ায় বন্ধ করে দিল টিভি। নিঃসীম আঁধার ঢেকে দিল দীপকে। অন্ধকারে বসে তরুণীর অপরূপ সৌন্দর্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগল দীপ।

মেয়েটি আশ্চর্যরকম সুন্দরী, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, ফোলা ফোলা দারুণ সেক্সি দুই অধর আর বক্ষবন্ধনীতে আবদ্ধ আঁটসাঁট বুকের তুলনা হয় না, এর সৌন্দর্যও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ঠোঁট কামড়াল দীপ। *কে এই লোক?* ভাবছে ও। *এমন সুন্দর সুন্দর মেয়ে কোত্থেকে জোগাড় করে নিয়ে আসে সে?*

আর এ মেয়েগুলোকে নিয়ে কী করে লোকটা?

নড়াচড়া করতে ভুলে গেছে দীপ। তবে মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে। বরং ভাব দেখে মনে হচ্ছে পরিবেশটা উপভোগ করছে। সে আবার শরীর দোলাতে শুরু করেছে। জানালার ধারে একটু সরে এল সে, ঠিক দীপের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ঝপ করে মাথা নুইয়ে ফেলল দীপ। মেয়েটি তাকে দেখে ফেলতে পারে সেই ভয়ে।

কিন্তু মেয়েটি তাকে দেখতে পায়নি। এ ব্যাপারে নিশ্চিত দীপ। মেয়েটির শরীর দোলানোর ভঙ্গিটি বিমূঢ় করে তুলেছে ওকে। অমন করছে কেন মেয়েটা? কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ভাব...

ড্রাগস! মেয়েটাকে ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে কিংবা সম্মোহিত

করা হয়েছে। হঠাৎ ভয় পেল দীপ, ইচ্ছে করল জানালা দিয়ে গলে নেমে ডাক দেয় মেয়েটিকে।

এমন সময় আবির্ভূত হলো লুসিয়ানো।

মেয়েটি যেমন সুন্দর, পুরুষটা তেমন সুদর্শন। ঘরের ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্তে সে চলে এল যেন হাওয়ায় ভেসে, যেন মাটি ছোঁয়নি তার পা। মেয়েটির কাছে চলে এসেছে, দাঁড়িয়ে নেই, মনে হলো শূন্যে ঝুলে রয়েছে লুসিয়ানো। মেয়েটির কাঁধে হাত রাখল সে। আড়ষ্ট হয়ে গেল সুন্দরী।

মেয়েটির কাঁধ ম্যাসাজ করতে লাগল লুসিয়ানো, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটি, চোখে মদালসা চাউনি, ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে কামনায়।

দীপের মাথা খারাপ হবার দশা। লুসিয়ানোকে দেখছে হাতের তেলো দিয়ে ঘষছে মেয়েটির কাঁধ।

ওর স্বপ্নের মেয়ে...

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চেয়ারে খাড়া হয়ে গেল দীপ। জানালায়, লুসিয়ানোর বাহুলগ্ন মেয়েটি...

...এ মেয়েটিকেই ও খানিক আগে স্বপ্নে দেখেছে।

জানালা দিয়ে তাকাল দীপ। লুসিয়ানো মেয়েটির ঘাড়ের কাছের চুলগুলো আলগোছে সরিয়ে দিল। চুমু খেল ঘাড়ে, পেশীতে দাঁত ঘষল। ধকধক করে জ্বলে উঠল চোখ। মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে দিল চুম্বনের প্রত্যাশায়, ফিসফিস করে কী যেন বলল। হাসল লুসিয়ানো, বেরিয়ে এল দাঁত।

'ওহ, নো!' গুঙিয়ে উঠল দীপ। 'ওহ্, গড, না...'

লুসিয়ানোর দাঁত অত্যন্ত সুচালো এবং ভয়ানক ধারাল। আঁতকে উঠল দীপ, হাত থেকে পড়ে গেল বিনোকিউলার। মেঝেতে দুম করে শব্দ হলো।

মেয়েটির কাঁধ থেকে এক ইঞ্চি দূরে লুসিয়ানোর দাঁত, থেমে

গেল। দীপ নিজের ঘরের আঁধারের মধ্যে বসে কুঁকড়ে গেল, দৃশ্যটা থেকে সরিয়ে নিতে পারছে না চোখ। লুসিয়ানোকে মনে হলো ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর কলজে যেন এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল ওই ভয়ানক চাউনিতে।

জ্বলন্ত কয়লার মত লাল টকটকে এক জোড়া চোখ। গনগনে।

দীপের নাড়িভুঁড়ি যেন গলে গেল। 'না...' ফিসফিস করল সে।

হাসল লুসিয়ানো। লম্বা, হলুদ দাঁত।

লম্বা, বাঁকানো নখঅলা একটা হাত বাড়িয়ে দিল লুসিয়ানো, মুঠো করে ধরল জানালার পর্দা। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল পর্দা।

হাত নেড়ে বিদায় জানাল দীপকে।

দশ

'মা!' প্যাসেজ থেকে ছুটতে ছুটতে এল দীপ, মায়ের ঘরের দরজায় জোরে ধাক্কা মেরে চেঁচাতে লাগল, 'মা!'

মাধুরী রডরিক বিছানায় শুয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। ছেলের চিৎকারে বিশেষ আমল দিলেন না। 'দীপ?' আবছা গলায় ডাকলেন তিনি।

'ওঠো, মা!' হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত লাগছে দীপকে। 'যা দেখেছি বিশ্বাস হয় না, মা! যীশাস!'

মাধুরী এমনভাবে ছেলের দিকে তাকালেন যেন সে ভিনগ্রহ থেকে এসেছে। 'কী?' ঘুমঘুম গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি। 'কী হয়েছে?'

'ওর শ্বদন্ত আছে, মা! ওই বাড়িতে নতুন যে লোকটা এসেছে তার মুখে লম্বা, তীক্ষ্ণ দাঁত দেখেছি আমি।'

'দীপ...।'

'সত্যি বলছি।' মরিয়া শোনাল দীপের কণ্ঠ। 'আমি আমার বিনোকিউলারে জানালা দিয়ে ওকে লক্ষ করছিলাম, মা! ওর শ্বদন্ত আছে, বিশ্বাস করো!'

'বিনোকিউলার? দীপ, ও তো গোয়েন্দাগিরি! কাজটা মোটেই ঠিক করিসনি।'

'শ্বদন্ত, মা! লম্বা, লম্বা ধারাল দাঁত।'

'ওহ, দীপ!' মস্ত হাই তুললেন মা, পাশ ফিরলেন। 'কাল সকাল আটটায় আমাকে কাজে বেরুতে হবে।'

দীপ মার দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল। একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনল ও। লাফ মেরে চলে এল জানালায়। দেখল চকচকে কালো একটি জিপ গাড়ি থেকে লুসিয়ানোর ভৃত্য নেমে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। গেট খোলা, যেন ভারী কোনও মাল তোলা হবে জিপে।

দীপ এক লাফে বেরিয়ে গেল ওর মার ঘর থেকে। মিসেস রডরিক উঠে বসলেন বিছানায়।

'দীপ?' ডাকলেন তিনি।

দীপ খিড়কির দুয়ার খুলে, ফুটপাত ধরে লম্বা ঝোপের সারির দিকে দ্রুত পা বাড়াল। লুসিয়ানোদের বাড়ির পেছনের দরজা হাট করে খোলা, শুধু বারান্দার বাতি জ্বলছে।

দীপের বুকের খাঁচায় দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড, রক্তস্রোত ধাঁ ধাঁ করে উঠে যাচ্ছে চাঁদিতে। ক্লান্তি এবং ভয় মিলেমিশে কেমন হালকা করে ফেলেছে মাথা। ঝোপের আড়ালে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলছে ও। অসুস্থ বোধ করছে।

লুসিয়ানোর কাজের লোকটা বেরিয়ে এল বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে, প্লাস্টিকে মোড়ানো ভারী একটা বোঝা বহন করছে। প্লাস্টিকের বাণ্ডিলটার মুখ শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা। ওটার ভেতরে কী আছে অনুমান করে পেট গুলিয়ে উঠল দীপের।

লোকটা প্লাস্টিকের ব্যাগটা নিতান্তই অবহেলায় ছুঁড়ে দিল জিপের কার্গো হোল্ডে। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে সে, দীপ প্রায় বমি করতে যাচ্ছে, হঠাৎ পাখির ডানার ঝাপটানোর শব্দে দু'জনেই পরিণত হলো পাথরে।

দীপ চারপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, নড়তে ভয় পাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতেও ডর লাগছে।

ওর বামে এসে থেমে গেল ডানার ঝটপটানি। দীপ চোখ সরু করে লুসিয়ানোর বাড়িতে নজর বুলাল, ডানা ঝটপটানির উৎস খুঁজছে।

হাত দশেক দূরে, ওখানে রাতের বাতাস যেন আরও কালো এবং ঘন, রূপ নিল একটা মানুষে।

নিরেট কাঠামোটা পা বাড়াল লন ধরে গাড়ি অভিমুখে।

'এই যে, এটা নিতে ভুলে গেছ তুমি।'

লুসিয়ানো। ভৃত্যের দিকে একটা পার্স ছুড়ে মারল।

সুন্দরী মেয়েটির পার্স।

লোকটা এক হাতে ধরে ফেলল পার্স, মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরল গাড়ির দিকে।

গলা ঠেলে উঠে আসা ভয়ার্ত চিৎকারটাকে বহু কষ্টে গিলে ফেলল দীপ। এমন সময় এক চিলতে আলো এসে পড়ল ওর পেছনে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল ও।

'দীপ? দীপ-প?'

ওর মা।

আতঙ্কে মুখ সাদা দীপের। স্থির হয়ে গেছে ভৃত্য এবং ছায়ামূর্তি। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল দু'জনে, অন্ধকারে খুঁজছে দীপকে। লুসিয়ানো ওর দিকে কয়েক কদম বাড়াল।

লাফিয়ে খাড়া হলো দীপ, ছুটল জান বাজি রেখে। এক ছুটে ওদের বাড়ির কিচেনে।

'হারামজাদা,' হিসিয়ে উঠল লুসিয়ানোর ভৃত্য। দীপের পিছু নিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল লুসিয়ানো।

'জনি,' মুখে উদার হাসি ফুটিয়ে বলল প্রভু। 'ওসবের জন্য প্রচুর সময় পাবে।'

'প্রচুর সময়।'

মাধুরী রান্নাঘরে ব্যস্ত, হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল দীপ। তার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে মায়া লাগল মায়ের।

বেচারী। আজকাল অনেক বেশি পড়াশোনা করছে।

'আয়, খোকা, এক গ্লাস দুধ খেয়ে যা।'

'মা, আমি দুধ খাব না। আমি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখিনি। বিশ্বাস করো, ওই লোকগুলো আজ রাতে একটা মেয়েকে খুন করেছে।'

জ্বরটর হয়েছে কি না দেখার জন্য ছেলের কপালে হাত রাখলেন মাধুরী।

'মা! আমি অসুস্থ নই!' মার হাত ঠেলে সরিয়ে দিল দীপ। 'ওই লোকটার বড় বড় কুকুরে-দাঁত আছে। আমার মাথার ওপর দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে যেতে দেখেছি। তারপরই ছায়া থেকে বেরিয়ে আসে লুসিয়ানো,' হড়বড় করে বলছে ও। 'এর মানে কি জানো তুমি?'

মাধুরী উদ্বেগ নিয়ে দেখলেন ছেলেকে। 'না তো, জানি না

রে, খোকা।'

'এর মানে হলো লুসিয়ানো একটা ভ্যাম্পায়ার!'

এগারো

'একটা কী?' মারিয়ার চেহারাটা এক মুহূর্তের জন্য মিসেস রডরিকের মত দেখাল।

'একটা ভ্যাম্পায়ার। দুত্তুরি! আমি কি বলছি শুনছ না তুমি?'

'দীপ,' বলল মারিয়া। তার কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত এবং খানিকটা হতাশ। 'ব্যাপারটা খুব ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে তুমি কি তা বুঝতে পারছ? এসব আজগুবি গল্প শুনিয়ে তুমি আমার মন গলাতে পারবে না।'

'বাদ দাও!' ফুঁসে উঠল দীপ, ঘুরল দরজার দিকে। 'আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি।'

রৌদ্রালোকিত চমৎকার একটি বিকেল। ওরা মারিয়াদের ডাইনিং রুমে বসে কথা বলছিল। ঘরটি বেশ প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল রঙ করা, প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে আসা রোদে আলোকিত কামরা।

'দীপ, তুমি পাগলামি করছ!'

'হ্যাঁ, আমি তো পাগলই,' ভোঁতা শোনাল দীপের কণ্ঠ।

মারিয়া দৌড়ে গেল দীপের সামনে, বন্ধ করে দিল কপাট। মরিয়া দেখাচ্ছে ওকে। দু'হাতে চেপে ধরল দীপের কাঁধ, চোখে রাখল চোখ।

'দীপ, দাঁড়াও। আমার কথা শোনো,' বলল মারিয়া। দাঁড়াল দীপ, শুনল। যদিও ওর ভাবলেশহীন চেহারা দেখে বোঝা যায় মারিয়ার কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে

যাচ্ছে। 'এরকম হাস্যকর একটা গল্প শোনাতে যেয়ো না পুলিশকে,' বলে চলল ও। 'ওরা তোমাকে ধরে গারদে পুরে দেবে। বিশ্বাস করো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ভ্যাম্পায়ার নিয়ে একটা কথাও বলব না। তবে ওই মেয়েগুলোর কথা অবশ্যই বলব।'

মারিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঝাঁকি দিয়ে হাতের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করল দীপ, তারপর ঝড়ের গতিতে পাশ কাটাল মেয়েটিকে, ঝড়াং করে খুলে ফেলল দরজা।

'দীপ...' পিছু ডাকল মারিয়া। কিন্তু ওর ডাক অগ্রাহ্য করল দীপ।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল ও।

অজানা একটা ভয়ে শিউরে উঠল মারিয়া।

'তুমি যে অভিযোগ করছ বুঝে শুনে করছ তো?'

প্রশ্ন নয় ঘোষণার মত শোনাল কথাটা। তবে পুলিশ অফিসারের চাউনি দেখে বোঝা যায় সে বলছে *তোমার কথা যদি মিথ্যা হয় তা হলে তোমাকে আমি দেয়ালে গেঁথে ফেলব।*

প্রশ্নকর্তার কণ্ঠ জলদগম্ভীর। সে পাদ্রিশিবপুর থানার দারোগা ওসমান আখন্দ। মফস্বল এ শহরে তেমন একটা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় না তাকে। তবে মাঝে মাঝে ফালতু সব ফোন আসে। তখন বুনোহাঁসের পেছনে বৃথাই ধাওয়া করে সে। এবং বেহুদা গলদঘর্ম হয়।

পাদ্রিশিবপুর থানার সবচেয়ে মারকুটে পুলিশ কর্মকর্তা এই ওসমান দারোগা। বিশাল গাট্টাগোট্টা শরীর, সবাই তাকে ভয় পায়। এ শহরে সে যোগ দিয়েছে সবার আগে। তার মাথা ভর্তি খাটো চুল দ্রুত সাদা হয়ে যাচ্ছে, তবে গোঁফটা এখনও কালো। এ মুহূর্তে ওসমান দারোগার পরনে সাদা শার্ট এবং কালো

প্যান্ট। ষাঁড়ের মত দেখতে ওসমান এক ঘুষিতে দীপকে দেয়ালে গেঁথে ফেলার শক্তি রাখে শরীরে। এ ভাবনাটা সঙ্গত কারণেই স্বস্তি দিল না দীপকে। সে ওসমান দারোগার কাছে তার বিদেশী পড়শী সম্পর্কে অভিযোগ করতে এসেছিল। দারোগা প্রথমে ব্যাপারটা পাত্তা দিতে চায়নি কারণ দীপ তার পড়শীর বিরুদ্ধে খুনের যে অভিযোগ এনেছে তা তার কাছে নিতান্তই হাস্যকর মনে হয়েছিল। সত্য বটে, ইদানীং যে খুনখারাবিগুলো হচ্ছে তা নিয়ে বরিশাল শহর থমথমে। তথাকথিত সিরিয়াল কিলার খুনগুলো করছে বরিশালে। তাতে ওসমান দারোগার কী? কিন্তু দীপ যেভাবে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে অভিযোগগুলো করেছে তাতে দারোগা একটু অস্বস্তিতেই পড়ে গেছে। অন্য কেউ হলে সে হয়তো অভিযোগকারীকে দূর দূর করে তাড়িয়েই দিত। কারণ দীপের মত ছেলে ছোকরাদের সে খুব একটা পছন্দ করে না। তার ধারণা এরা সারাক্ষণ ফেসবুক নিয়ে পড়ে থাকে, যে যার মত একটা ফ্যান্টাসির জগৎ তৈরি করে নিয়েছে যে পৃথিবী বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। তবে দীপকে সে চেনে এবং দীপের মা মিসেস মাধুরী রড়রিককে সে বেশ শ্রদ্ধার চোখেও দেখে। গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে ওসমান দারোগা পাদ্রিশিবপুর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তখন দীপের মা তার খুব সেবাযত্ন করেছেন। অনেকটা সেই কৃতজ্ঞতা থেকেও ওসমান দারোগা দীপের অভিযোগ একেবারে পানিতে ফেলে দিল না। কিন্তু দারোগা বলে কথা! তাই একটু ভারিক্কি ভাব তাকে নিতে হয় বৈকি। দীপ যখন নাছোড়বান্দা এবং কেউ অভিযোগ করলে তা খতিয়ে দেখা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ছাড়ল ওসমান দারোগা। তবে তার ভাবভঙ্গি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল অভিযোগ যদি প্রমাণিত না হয় তবে দীপের কপালে খারাবিই

আছে। দারোগার দিকে তাকিয়ে ও জোরে মাথা ঝাঁকাল, প্রার্থনা করল সে যা দেখেছে তা যেন কল্পনা না হয়। ওসমান দারোগা মাথার চুলে অভ্যাসবশত একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে তার এক অধীনস্থকে 'আমি কিং স্ট্রিট থেকে একটু ঘুরে আসছি' বলে দীপকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বারো

পর্দার পেছন থেকে কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে। জানালায় ছায়া দেখতে পাচ্ছে দীপ। শিরশির করে উঠল গা, প্রতি পদক্ষেপে বেড়ে চলল শিরশিরানি।

দরজার সামনে চলে এল ওরা, ওসমান দারোগা আঙুলের গাঁট দিয়ে জোরে নক্ করল। নীরব বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলল শব্দ।

শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। ভারী এবং ধীর গতি। ভয়ের চোটে দম বন্ধ হয়ে এল দীপের, চামড়ার নিচে যেন পোকা হেঁটে বেড়াতে লাগল কিলবিল করে।

খুলে গেল দরজা।

দীপকে স্টর্ম ডোরের ধারে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে খেঁকিয়ে উঠেছিল এ লোকটা। গতকাল যেমন দেখেছে তারচেয়ে আজ খুব একটা ভালো লাগছে না একে দেখতে। যদিও হাসছে কিন্তু সেই শীতল এবং নির্মম ভাবটা ঠিকই ফুটে আছে চেহারায়। দেখলেই ছমছম করে গা।

'জি, বলুন?' বলল লোকটা। ওসমান থেকে দৃষ্টি চলে গেল দীপের দিকে, আবার স্থির হলো দারোগার ওপর।

'মি. মানুচ্চি?' জিজ্ঞেস করল ওসমান দারোগা।

'না, আমি জুলিয়ান গনজালভেজ, তার বন্ধু। কেন?'

'আমি ওসমান আখন্দ, পাদ্রিশিবপুর থানার দারোগা।' তার ব্যাজ দেখাল ওসমান। জনির চোখ নিখাদ বিস্ময়ে গোল হয়ে গেল। 'আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়,' একপাশে সরে দাঁড়াল জুলিয়ান ওরফে জনি ওদেরকে ভেতরে যেতে দেয়ার জন্য। ব্যাজ পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে আগে পা বাড়াল ওসমান। পেছন পেছন দীপ, ভয়টাকে দমন করার চেষ্টা করছে, তাকাল জনির দিকে। জনির মুখখানা আগের মতই– নির্দয়, নিষ্ঠুর।

ওরা চারপাশে চোখ বুলাতে লাগল।

বাড়ির ফয়ার বা সামনের উন্মুক্ত অংশটা প্রকাণ্ড, মেঝেতে সাদা-কালো রঙের চেকবোর্ড টাইলস, প্রতিটি টাইল দু'ফুট চওড়া। গোথিক চেহারার বিরাট সিঁড়ির পায়ের কাছে কালো পাথরের দুটো মূর্তি। ক্যাথেড্রালের মত দেখতে অভ্যন্তরভাগ তবে ভীতিকর একটা ভাব আছে।

ভীতিকর চেহারাটাকে আরও ছমছমে করে তুলেছে কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলো। অনেকগুলো বাক্স। তবে বেশিরভাগ এখনও খোলা হয়নি। ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি ঘর জুড়ে, কয়েকটি সাদা কাপড় দিয়ে আবৃত।

দীপ কয়েকটি বাক্সের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল। তোয়ালে, কাপড়চোপড়, নিকন্যাকসহ ঘর গেরস্থালির নানান জিনিস ওতে। ভ্যাম্পায়াররা কি গোসল করে? ভাবল দীপ। ওরা কি দাঁত মাজে কিংবা হাগুমুতু করার প্রয়োজন ওদের হয় কি?

এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই দীপের। সে জনি এবং দারোগা ওসমানের পেছন পেছন লিভিংরুমে ঢুকল। এ ঘরও ভর্তি হয়ে আছে নানান বাক্স-পেটরায়। ফয়ার থেকে বেরুবার সময় দীপের চোখে পড়ল একদিকের দেয়াল পুরোটা ঢাকা পড়েছে অসংখ্য ঘড়িতে।

কিন্তু সবগুলো ঘড়ি বোধহয় নষ্ট। কারণ চলছে না একটাও।

'আপনাদের জন্য কী করতে পারি?' ওরা হাঁটাহাঁটি বন্ধ করলে জিজ্ঞেস করল জনি।

'শহরে কয়েকটা খুনের ঘটনা ঘটেছে,' বলল ওসমান দারোগা। 'এ ছেলেটি আপনাদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা। এ বলছে সে নাকি আপনাদের বাড়িতে মানুষ খুন হতে দেখেছে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল জনির। 'আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন।' মাথা নাড়ল ওসমান। 'এ হাস্যকর। আমরা এ বাড়িতে ওঠার পর থেকে কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। এমনকী কোনও গাড়িও এ পাড়ায় ঢুকতে দেখিনি। আর কোনও খুন খারাবির কথাও আমরা জানি না।' একটু বিরতি দিল সে। তারপর যোগ করল, 'অবশ্য আমরা এসেছিও মাত্র ক'দিন হলো।'

'মিথ্যা কথা,' নিচু গলায় বলল দীপ। ওরা দু'জন ফিরল দীপের দিকে। 'আমি গত রাতে দেখেছি এ লোক একটা প্লাস্টিক ব্যাগে একটা লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

হেসে উঠল জনি। তবে হাসিটা মোটেই কৃত্রিম শোনাল না।

'বেড়ে বলেছ, ভাই,' হাসতে হাসতে বলল সে। 'তবে তুমি যা দেখে লাশ ভেবেছ ওটা আদৌ সেরকম কিছু ছিল না। তুমি যা দেখেছ তা হলো...' সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কয়েক কদম এগোল আবর্জনার স্তূপের দিকে। একটা বড়সড় ব্যাগ তুলে নিল ওখান থেকে। ভেতরে র‍্যাপিং পেপার এবং ভাঙাচোরা কার্ডবোর্ডের বাক্স। '...এটা...'

'আমি যে ব্যাগটা দেখেছি তার মধ্যে একটা লাশ ছিল,' একগুঁয়ে গলায় বলল দীপ।

'তুমি কি সত্যি লাশটা দেখেছ?' ওসমানের কণ্ঠে সন্দেহের

সুর।

'আ...মানে...না...তবে...'

'তবে কী?'

'...আমি দুটো মেয়েকে এ বাড়িতে আসতে দেখেছি। একজনকে দেখেছি বাড়িতে ঢুকতে, অপরজন বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওই মেয়ে দুটির হত্যাকাণ্ডের খবরই কাগজে ছেপেছে। ঈশ্বরের দিব্যি।' দমকা বাতাসের মত কথাগুলো দীপের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ও ভেবেছিল কথাগুলো বলার সুযোগ হয়তো পাবে না।

'একদম বাজে কথা,' বলল জনি। রেগে গেছে সে। *তোমার রেগে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে*, মনে মনে বলল দীপ। 'আমাদের তরুণ বন্ধুটি অবলীলায় একগাদা মিথ্যা কথা বলে গেল,' দারোগার দিকে ফিরল সে। 'আসুন, আপনাকে গোটা বাড়ি ঘুরে দেখাই, গারবেজ ব্যাগে কী আছে নিজের চোখে দেখে যান।'

'আপনি ব্যাগটা জিপে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন,' বলল দীপ।

মুখ কুঁচকে একটা অধৈর্য ভঙ্গি করল জনি। ওসমান দারোগার চেহারা দেখে মনে হলো সে লোকটার কথা বিশ্বাস করছে।

'উনি যে মিথ্যা বলছেন তা আমি প্রমাণ করে দিতে পারব,' বলল দীপ। 'চলুন, বেসমেন্টে যাই।'

'বেসমেন্টে কী আছে, দীপ?' প্রশ্ন করল ওসমান দারোগা।

'হ্যাঁ,' প্রতিধ্বনি তুলল জনি, ঘুরে দীপের চোখে চোখ রাখল। 'বেসমেন্টে কী আছে, দীপ?'

নড়াচড়া করতে পারছে না দীপ। কথাও বলতে পারছে না। জনির চাউনিতে এমন একটা কিছু আছে যার জন্য ওর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে রা বেরুচ্ছে না। না, জনি ওকে

সম্মোহন করার চেষ্টা করছে না, সুপার ন্যাচারাল মাইণ্ড কন্ট্রোলও করছে না, শুধু তাকিয়ে আছে দীপের দিকে। তার চাউনিতে অশুভ, ভয়ঙ্কর কী একটা ফুটে আছে যা দীপের সমস্ত শরীর অবশ করে দিয়েছে। দারোগা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না?

না, সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। কারণ সে জনির দিকে তাকিয়ে নেই। সে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সময় বয়ে চলেছে তবু দীপের মুখ থেকে রা সরছে না। জনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে দীপের দিকে। ওসমান বুটজুতো দিয়ে ঠোকর দিতে লাগল মেঝেয়।

অবশেষে দীপের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল জনি। তাকাল ওসমান দারোগার দিকে। 'আমি নিশ্চিত এ ছেলে জানে না সে যা বলছে না বুঝেই বলছে।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, বাধা পেল দীপের চিৎকারে। দীপ যে কথাগুলো বলল তা আসলে ও বলতে চাইছিল না, অজান্তেই বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে।

'কফিন!' চেঁচিয়ে উঠল দীপ। 'বেসমেণ্টে কফিন আছে! আমি ওদেরকে ওখানে কফিন নিয়ে যেতে দেখেছি।'

'কী?' চমকে গেল ওসমান দারোগা।

'জি,' বলল দীপ। 'ওখানে লুসিয়ানো মানুচিকে পাবেন আপনি। জিন্দালাশের মত কফিনের ভেতরে ঘুমাচ্ছে।'

'এসব কী বলছ তুমি?' রীতিমত বিস্মিত দারোগা।

'সে একটা ভ্যাম্পায়ার,' দীপ চেঁচাচ্ছে। 'আমি তাকে গতকাল রাতে আমাদের বাড়ির দোতলার বেডরুম থেকে দেখেছি। তার মুখে লম্বা লম্বা ধারাল দাঁত, মেয়েটার ঘাড় কামড়ে ধরেছিল সে দাঁত দিয়ে।'

'ওহ, খোদা!' বিড়বিড় করল ওসমান আখন্দ। মুখ বাঁকাল।

দীপের কথা শুনে যারপরনাই বিরক্ত। খামচে ধরল দীপের হাত। চলো, বাইরে চলো।'

'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু ফিন্তু নয়,' মেঘস্বরে বলল ওসমান। দীপ ভয় পেল দারোগা এখনই না ওকে দেয়ালে ছুঁড়ে দেয়।

সদর দরজায় পা বাড়াল ওরা। ওসমান দারোগা টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে দীপকে। জনি ওদের পেছনে। ওসমান জনির দিকে তাকাচ্ছে না তবে দীপ তাকাচ্ছে। মোটেই নিরীহ গোছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না জনিকে। শয়তানি দৃষ্টি তার চোখে। ওসমান ধাক্কা মেরে খুলল দরজা। তারপর জনির দিকে ফিরে নরম গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত, মি. গনজালভেজ।'

'না, না, ঠিক আছে,' মুখে হাসি ফোটাল জনি।

ওসমান দারোগা দীপকে দোরগোড়া থেকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিল বারান্দায়। তারপর ওর পিছু নিল। ওদের পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল জনি। ওসমান আবার খামচে ধরল দীপের হাত। টানতে টানতে নিয়ে চলল নিজের গাড়িতে।

'তোমাকে জেলে পোরা উচিত,' হিসিয়ে উঠল সে। 'শুধু শুধু পুলিশকে বিব্রত করার অপরাধে তোমাকে আমি কয়েদ খাটাতে পারি, সেটা জানো?'

'আমি মিথ্যা কথা বলিনি,' বলল দীপ। ও ভয় পেয়েছে, ওসমান এমনভাবে হাত চেপে ধরে রেখেছে, ব্যথা পাচ্ছে। 'লুসিয়ানো মানুচ্চি একটা ভ্যাম্পায়ার। আপনি যদি শুধু একবার খোঁজ নিয়ে-'

'শোনো, ছোকরা,' ওসমানের ধাক্কায় দীপ দারোগার মোটর সাইকেলের একপাশে ছিটকে গেল। 'এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমাকে যদি আমি আর কোনওদিন আমার থানার আশপাশেও ঘুরঘুর করতে দেখি স্রেফ গারদে পুরে দেব।

মিসেস রডরিকের ছেলে বলে ছাড় দেব না।'

'কিন্তু...'

ওসমান দীপের কথা শুনল না। সে দীপকে ঠেলে সরিয়ে মোটর সাইকেলে উঠে বসল।

'প্লিজ, আংকেল! আমি–'

বিকট শব্দে গর্জে উঠল ওসমানের মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন।

'–আমি সত্যি কথাই বলছি। আমি–'

রাবার এবং অ্যাসফল্টের ঘর্ষণের শব্দ উঠল একযোগে। ফুটপাত থেকে রকেটের গতিতে রাস্তায় লাফ মেরে নামল মোটর সাইকেল, ছুটল।

'ওরা আমাকে খুন করবে!' গলা ফাটিয়ে বলল দীপ। ততক্ষণে ওসমান দারোগার বাইক মোড় ঘুরেছে, চলে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমার বাইরে।

লুসিয়ানোদের বাড়ির সদর দরজা খোলার শব্দ হলো। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে জুলিয়ান গনজালভেজ ওরফে জনি।

হাসছে সে।

তেরো

সজোর ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। বাতাসের বেগে ভেতরে ঢুকল দীপ। ওর সামনে সরু এক সারি সিঁড়ি। দীপ একেকবারে দুটো করে ধাপ টপকাল।

'হাবলু!' হুংকার ছাড়ল ও। 'হাবলু!'

টানা বারান্দার শেষ মাথায় হরর হাবলুর ঘর। দীপ জুতোর শব্দ তুলে ছুটল ওদিকে, হালদারদের বাড়ির অন্য সদস্যরা ওর

ছোটাছুটিতে বিরক্ত হতে পারে সে কথা একবারও ভাবল না। ও কোনও কথা, কারও কথাই ভাবছে না। শুধু একটা ভীষণ ভয় ওকে তাড়া করে ফিরছে। হাবলুর ঘরের সামনে এসে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হরর হাবলু। ডান হাতে রং তুলি, তার বামে একটা পিশাচের ছবি। রহস্যপত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে ছবিটি। হাবলুর শখ হলো যত রাজ্যের ভূত-প্রেতের ছবি সংগ্রহ এবং ওগুলোর গায়ে রং চড়িয়ে পিশাচদের চেহারা আরও ভুতুড়ে এবং ভয়ানক করে তোলা। এজন্য সে বরিশালের বুকভিলায় গিয়ে বিদেশি পত্রিকা কিনে আনে। আর ঢাকা গেলে নীলক্ষেতের বইয়ের মার্কেটে ঢুঁ মেরে বিদেশি যত হরর বই এবং পত্রিকা পায় সব কেনে। ভাগ্য সহায় হলে মাঝে মধ্যে ওখানে হরর ছবির পোস্টারও পেয়ে যায় হরর হাবলু।

এই মুহূর্তে নিবিষ্টচিত্তে রহস্যপত্রিকার পিশাচের ছবিতে রং চড়িয়ে তাকে আরও বীভৎস করে তোলার কাজটি করছিল হাবলু। কাজে বাধা পাওয়ায় বিরক্ত হলো সে।

'তোমার সাহায্য দরকার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল দীপ।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল হাবলু। 'ওটা তো মারিয়ার ডিপার্টমেন্ট।'

'না, না! তুমি বুঝতে পারছ না! ভ্যাম্পায়ারটা বুঝে ফেলেছে যে ওর আসল পরিচয় আমি জানি।'

'কী?'

'ভ্যাম্পায়ার! ও জানে...কিংবা যখন ঘুম থেকে জেগে উঠবে তখন জেনে যাবে। শিট!' ঘড়ি দেখল দীপ। সাড়ে চারটা বাজে।

হাবলু নিজের ঘড়ি দেখল এক ঝলক, তারপর তাকাল

দীপের দিকে। 'কোন্ ভ্যাম্পায়ারের কথা বলছ তুমি? ভ্যাম্পায়ারের অভাব নেই, জানোই তো।'

ঘরের চারপাশে ইঙ্গিত করল সে। হরর হাবলুর ঘরটাকে পিশাচ জাদুঘর বললেই মানায় ভালো। সমস্ত দেয়াল জুড়ে বরিস কারলোফ, বেলা লুগোসি এবং [illegible] জুনিয়রের ভৌতিক ছবি। এরা সবাই বিশ্বখ্যাত হরর অভিনেতা। তার বুকশেলফ জুড়ে সেবা প্রকাশনীর সমস্ত হরর গল্প উপন্যাস। এ সংগ্রহের মধ্যে সেবার বহু পুরানো হরর বইয়ের দুর্লভ কালেকশনও আছে। দীপ হাবলুর কাছ থেকে একসময় এসব বই ধার করে নিয়ে পড়েছে। সে যেমন হরর ছবি দেখতে ভালোবাসে তেমনি হরর বই পড়তেও পছন্দ করে। আর তার সবচেয়ে প্রিয় হরর লেখক হলেন অনীশ দাস অপু। এ লেখকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। ঢাকায় বইমেলায় গিয়ে সে তার প্রিয় লেখকের অটোগ্রাফসহ বই সংগ্রহ করেছে। এ নিয়ে দীপের অনেক গর্ব আর হরর হাবলুর খুব হিংসা। কারণ এখন পর্যন্ত কোনও লেখকের অটোগ্রাফ সে সংগ্রহ করতে পারেনি। অবশ্য এজন্য অনেকটাই দায়ী তার প্রচণ্ড মুখচোরা স্বভাব। সে তার সহপাঠীদের সঙ্গেই ভালভাবে মিশতে পারে না, অপরিচিত লোকের সঙ্গে সেধে কথা বলার প্রশ্নই নেই।

মেঝেয় পা ঠুকল দীপ, দাঁতে দাঁত ঘষল, তবে কথা বলার সময় মোলায়েম থাকল কণ্ঠ। 'শোনো, আমি ইয়ার্কি মারছি না। আমাদের পাশের বাড়িতে এক ভ্যাম্পায়ার এসেছে। আত্মরক্ষা করতে না পারলে সে আমাকে ঠিক মেরে ফেলবে।'

'ঠিক,' নাক সিটকাল হাবলু। 'তুমি তো একটা ননীর পুতুল, দীপ।'

'আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

'না, করছি না।'

'কিন্তু—'

'দ্যাখো,' রং তুলি নিয়ে একটা অধৈর্য ভঙ্গি করল হরর হাবলু। 'তোমার সমস্যাটা কী আমি জানি না। তবে তোমার সমস্যা তোমার কাছে। বুঝতে পেরেছ? মারিয়ার প্রেমে পড়ার পর থেকে তোমার পাত্তাই পাওয়া যায় না। আমাকে তুমি এক সেকেণ্ডের জন্য সময় দাওনি, আমার সঙ্গে সেধে কথা পর্যন্ত বলতে আসোনি, আমার মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ। তাই আমিও তোমাকে ত্যাগ করেছি। কাজেই ভাগো।'

'হাবলু, প্লিজ!' অনুনয় দীপের কণ্ঠে। ওর সাবেক বন্ধুটি যে সব অভিযোগ করেছে তা মোটেই মিথ্যে নয়। 'আমি দুঃখিত। তুমি যা বলেছ সব ঠিক। কিন্তু সত্যি তোমার সাহায্য দরকার। আমি ভীত।'

'তোমার পাশের বাড়িতে ভ্যাম্পায়ার এসেছে,' মাথা নাড়ছে হাবলু। 'ওকে। তুমি কেন ভয় পেয়েছ বুঝতে পারছি।' পিশাচের ছবিটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'এটাকে দেখেও তোমার আত্মা উড়ে গেছে, না?'

'আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না!' রাগে বিস্ফোরিত হলো দীপ। 'সবাই আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছে যেন আমি একটা পাগল।'

'হ্যাঁ, বলো, সবাই তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করছে?' গর্জন ছাড়ল হাবলুও। 'আমার সঙ্গে লোকে কেমন আচরণ করে তা তোমার চোখে পড়ে না? তুমি কেমন ব্যবহার কর তা ভুলে গেলে? আমাকে স্কুলে দেখলে তুমি মুখ ঘুরিয়ে রাখ আর এখন এসেছ আমার সাহায্য চাইতে। ভাবছ তুমি বললেই আমি সব কাজ ছেড়েছুড়ে তোমার সঙ্গে ছুটব একটা স্টুপিড ফালতু ভ্যাম্পায়ারের পিছে, না?'

ওরা দু'জনে একে অন্যের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে

রইল। এত রেগে যাবে নিজেও বুঝতে পারেনি হাবলু হালদার। গভীর একটা দম নিল সে।

'তুমি নিজেই ভ্যাম্পায়ার শিকারে যাও, দীপ। কীভাবে ভ্যাম্পায়ার খতম করতে হয় জানো নিশ্চয়? নাকি গত তিন বছরে সব ভুলে বসে আছ?'

নিঃশব্দে মাথা দোলাল দীপ।

'বেশ। তুমি ওটাকে মারো। ওর হাড়গোড়গুলো রেখে দেব আমার কাছে। আর ভ্যাম্পায়ার মারতে গিয়ে যদি নিজেই মারা যাও...ওয়েল, সেক্ষেত্রে একটা কাঠের গোঁজ জোগাড় করে রাখব আমি, ঠিক আছে?'

নীরবতা।

'তুমি আমার কলজে কাঠের গোঁজ দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করতে চাও, তাই না!' মৃদু গলায় বলল দীপ। 'তা হলে তুমি মজা পাবে, না?'

'বোকার মত কথা বোলো না,' হরর হাবলু তার টেবিলে ঘুরল, ঘন সবুজ রঙে চোবাল তুলি, তারপর পিশাচের মুখে আবার রঙ মাখাতে লাগল। 'এখন ভাগো।'

চলে গেল দীপ। তবে যাওয়ার আগে দরজা লাগাল না।

চোদ্দ

বাড়ি ফেরার পথে হরর হাবলুর কথাগুলো শুধু মনে পড়তে লাগল দীপের। *নাকি তিন বছরে সব ভুলে বসে আছ?*

'তিন বছর,' নিজের সাইকেলের উদ্দেশে জোরে জোরে বলল দীপ।

হাবলু ঠিকই বলেছে। ক্লাস নাইন থেকে আমরা দু'জন বন্ধু

ছিলাম। একসঙ্গে থাকতাম সবসময়: *খেলতাম, কমিকস পড়তাম, টিভিতে একত্রে মধ্যরাতের আতঙ্ক দেখতাম...*

নামটা মনে পড়তে একটা ঝাঁকি খেল দীপ। *মধ্যরাতের আতঙ্ক*। *মধ্যরাতের আতঙ্ক* মানেই ভ্যাম্পায়ার আর ভূত-প্রেত নিয়ে কাজকারবার। *মধ্যরাতের আতঙ্ক* মানেই এর বিখ্যাত অভিনেতা ও উপস্থাপক রেমো ডি'সুজা, দাঁড়িয়ে আছেন রক্তপায়ী পিশাচদের সামনে, তাদেরকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত।

টিভি শো *মধ্যরাতের আতঙ্ক*-র একনিষ্ঠ দর্শক দীপ এমন কোনও পর্ব নেই যা দেখেনি। *মধ্যরাতের আতঙ্ক*-র কথা ভাবতে গিয়ে একটা প্ল্যান চলে এল মাথায়।

দীপ চার্চ রোডে অকস্মাৎ মোড় নিল, চলে এল সুপার সেভ্‌যার শপিং সেন্টারে। সাইকেলটা তালা মেরে, মার্কেটের দেয়ালের পেছনে ঠেকিয়ে রেখে ছুটল দোকানে।

আশা করল ও যে জিনিসের খোঁজে এখানে এসেছে তা পেয়ে যাবে।

শেষ পেরেকটা যখন মারা হলো ততক্ষণে আঁধার গ্রাস করেছে প্রকৃতি। পানিতে ডুবে মরা লাশের মত স্ফীত এবং শীতল অন্ধকারের পর্দা ঝুলে আছে দীপের বাড়ির জানালার বাইরে। ওদিকে কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীপ, তারপর পিছিয়ে গেল হাতের কাজটা কেমন হয়েছে তা পরখ করার জন্য।

গোমেজ হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে কিনে আনা পেরেক দিয়ে জানালা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে ও। কাঁচাবাজার থেকে আনা রসুনের মালা ঝুলছে দরজা এবং জানালায়। হলি ওয়াটার জোগাড় করতে পারেনি দীপ তবে প্রচুর পরিমাণে

প্লাস্টিকের ক্রুশ কিনে এনেছে। তিনটে ক্রুশ ঝুলিয়েছে, একটি রেখেছে নিজের সঙ্গে। তবে হাতুড়ি এবং সুই বাড়ির সম্পত্তি। ওগুলো সে যথাস্থানে রেখে আসবে।

ভ্যাম্পায়ার হত্যা করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গোঁজও জোগাড় করতে পারেনি দীপ। তবে গ্যারেজে কাঠের অভাব নেই। ওগুলো দিয়ে গোঁজ বানানো যাবে। কিন্তু এখন রাত হয়ে গেছে। কাজেই গ্যারেজে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। কাল সকালে ওখানে যাবে দীপ। অবশ্য যে আয়োজন করেছে দীপ, এ বাধা ডিঙিয়ে লুসিয়ানো মানুচ্চির পক্ষে ওর ঘরে ঢোকা সম্ভব হবে না।

আরেকটা বিষয় ভেবেও নিজেকে নিরাপদ লাগছে দীপের। ভ্যাম্পায়ারদের নিয়ে যেসব ছবি ও দেখেছে কিংবা বইতে পড়েছে, ওসব তথ্য যদি সত্য হয়, বিনা আমন্ত্রণে কারও বাড়িতে ঢুকতে পারে না ভ্যাম্পায়ার। আর দীপ জীবনেও কোনও ভ্যাম্পায়ারকে তার বাড়িতে আসার দাওয়াত দেবে না।

চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে দিল মার ডাক। 'দীপ? একটু নিচে আয় না, বাবা।'

'আসছি, মা!' সাড়া দিল দীপ, খুশি খুশি লাগছে। 'হাতের কাজটা সেরেই আসছি।'

দ্রুত জানালার সামনে ভারী চেস্ট অভ ড্রয়ার ঠেলে নিয়ে গেল দীপ। ভ্যাম্পায়ার যদি ঘরে ঢুকতে চায়, ড্রয়ারটা হয়তো তেমন বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। তবে দীপ মনে সান্ত্বনা পাবে ভেবে ভ্যাম্পায়ারের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য এটা অন্তত সাময়িক ঢাল হিসেবে কাজ করবে।

নাচতে নাচতে ড্রইংরুমের দিকে ছুটল। শারীরিক পরিশ্রম ওকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে, আরও বেশি আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে মনের ভেতর। চমৎকার মূড নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল

দীপ। জিজ্ঞেস করল, 'কেন ডাকছিলে?'

হাতে কফির কাপ নিয়ে ড্রইংরুমে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন মা।

'আয়, খোকা,' বললেন তিনি। 'তোর সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দিই।'

ফোমের পুরানো চেয়ারটার দিকে তাকাল দীপ। ওর বাবার চেয়ার। পিঠ উঁচু, হার্ট আকারের এ চেয়ারটিতে গত সাত বছরে শুধু বিশিষ্ট অতিথিরাই বসার সুযোগ পেয়েছেন...

ওই চেয়ারে কেউ বসে আছে। চেয়ারের নকশাকাটা ডানার জন্য মানুষটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না দীপ। তবে ট্যুইড জ্যাকেট পরা লোকটার হাত দেখা যাচ্ছে। লম্বা, সরু আঙুলগুলো মেয়েদের মত। বিবর্ণ সাদা একটি আঙুলে বহুমূল্য একটি হীরের আংটি ঝলকাচ্ছে।

দম বন্ধ হয়ে এল দীপের। *এ কিছুতেই হতে পারে না।*

মার অতিথি চেয়ার ঘোরাল, ঝুঁকে এল সামনে, হাসল, তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'হাই, দীপ,' বলল ভ্যাম্পায়ার। 'তোমার কথা অনেক শুনেছি।'

ঝুলে পড়ল দীপের চোয়াল। গলা নিমিষে শুকিয়ে মরুভূমি। শরীরের প্রতিটি পেশী নিঃসাড় হয়ে গেল। নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ও। নিঃশ্বাসও নিতে পারছে না। বিস্ফারিত, ভেজা চোখে শুধু তাকিয়ে থাকল দানবটার দিকে।

লুসিয়ানো মানুচ্চি অসম্ভব সুদর্শন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। পাদ্রিশিবপুরে এমন রূপবান পুরুষ কেউ কোনওদিন দেখেনি। বয়স চল্লিশের ওপরেই হয়তো হবে তবে দেখে বোঝা যায় না। অনেক কম মনে হয়। মুখে দুষ্টু মিষ্টি হাসি। কালো ঝকঝকে চোখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তার সমস্ত অবয়ব থেকে

বিচ্ছুরিত হচ্ছে কারিশমা। জানালার ওই মেয়েটা কেন এ লোকের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল এখন বুঝতে পারছে দীপ।

ভ্যাম্পায়ারটা এখন তার মাকেও পাগল করেছে।

মাধুরী রডরিক টিনএজ মেয়েদের মত আচরণ করছেন। খিলখিল হাসছেন, মুগ্ধ চোখে ভ্যাম্পায়ারটাকে দেখছেন।

দীপের মনে হচ্ছে লুসিয়ানো মানুচ্চি এখনই তার রক্ত শুষে খাবে এবং সে বাধাও দিতে পারবে না। লুসিয়ানো চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো। সে দীপের চেয়ে সামান্য লম্বা। তবে চওড়ায় দ্বিগুণ।

'আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম,' বলল সে। এক কদম বাড়ল সামনে।

দীপ এখনও পাথরের মূর্তি হয়ে আছে, তবে মনে হচ্ছে ভয়ের চোটে এখনই প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে। ও, *মাই গড*, মনে মনে আর্তনাদ করছে ও, *আমি মারা যাচ্ছি, আমি মারা যাচ্ছি...*

ভ্যাম্পায়ার ওর এক হাত দূরত্বে এসে দাঁড়াল।

একটা হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেক করার জন্য।

'মি. মানুচ্চিকে হ্যালো বল, খোকা!' সুর করে বললেন ওর মা। ঘুরলেন লুসিয়ানোর দিকে, গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, 'জানি না মাঝে মাঝে ছেলেটার যে কী হয়! অথচ আমরা চেয়েছি ও একটু অন্যভাবে বেড়ে উঠুক।'

'হ্যালো' বলো দীপ।

'হাই,' যন্ত্রচালিতের মত বলল দীপ। যন্ত্রচালিতের মতই ওর ডান হাতটা উঠে গেল শরীরের পাশ থেকে, হ্যাণ্ডশেক করল লুসিয়ানোর সঙ্গে।

ভ্যাম্পায়ারটা ওকে নিয়ন্ত্রণ করছে। দীপের মস্তিষ্ক এ ব্যাপারে পুরো সচেতন, কিন্তু ওর ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছু নেই,

শরীর যা করছে সব নিজে নিজে, দীপ কিছু করছে না।

হ্যাণ্ডশেক পর্ব শেষ হলো। তবে ওর ওপর নিয়ন্ত্রণটা আগের মতই বজায় আছে। দীপের কান লুসিয়ানোর কথা শুনছে কিন্তু মন সাড়া দিচ্ছে না ভেতর থেকে।

'তোমার মা আমাকে তোমাদের বাড়িতে আসার দাওয়াত দিয়েছেন,' বলল ভ্যাম্পায়ার। তার কণ্ঠে আছে মধুমাখানো যৌনাবেদন, ভরাট ও পরিশীলিত। 'না হলে এখানে আসাই হতো না।'

[তুমি ব্যাপারটা জানতে, তাই না?]

...তোমার মা বললেন যে কোনও সময় তোমাদের বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার। যেমন...

[মধ্যরাতে...]

'...উনি কাল আমাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাল আমি আসতে পারব না। আমি বলেছি পরে আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসব। বেশ মজা হবে, তাই না?'

'হুঁ,' বলল দীপ। টের পেল ওর ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে হাসির ভঙ্গিতে। কিন্তু জোর করে হাসানো হচ্ছে ওকে, বুঝতে পারছে দীপ, ওর নাকটা কুঁচকে গেল বিতৃষ্ণায়। ঠিক তখন ভ্যাম্পায়ারের সম্মোহনের বেড়াজালটা যেন ভেঙে গেল। দীপ টলতে টলতে পিছু হঠল, তার মুখখানা কাগজের মত সাদা, যেন বিষধর সাপ কামড়েছে ওকে। ওর মা বিমূঢ় হয়ে দেখছেন ওকে। একটা ছোট টেবিলে বাড়ি খেল দীপ। ওটা দুড়ুম করে পড়ল মেঝেতে। ভ্যাম্পায়ারটা শুধু হাসছে আর হাসছে।

'দীপাঞ্জল রডরিক!' ওর মা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তোমার হয়েছেটা কী?' মা রেগে গেলে 'তুমি' করে বলেন।

ভ্যাম্পায়ারকে বুঝতে দেয়া যাবে না যে তুমি ওকে দেখে

ভয় পেয়েছ, দীপের মন বলল ওকে। তা হলে ও তোমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবে। দাঁড়িয়ে পড়ল দীপ, কম্পিত হস্তে উল্টে যাওয়া টেবিলটা তুলে বসাল।

'সরি, মা,' ভয়টা ঢাকতে চড়া গলায় বলল, 'আমার এক্ষুণি হোমওঅর্ক করতে বসতে হবে।'

'ঠিক আছে, পড়তে বস্ গে, যা,' নিজেকে সামলে নিলেন মা। 'আমি চাই না তোর কোনও ক্ষতি হোক।'

'না,' মুচকি হেসে প্রতিধ্বনি তুলল ভ্যাম্পায়ার। 'আমরা নিশ্চয় তা চাই না।'

দীপ সিঁড়ি বেয়ে ছুটে ওঠার সময় লক্ষ করল লুসিয়ানো ওকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে।

নিজের ঘরে ফিরে এল দীপ। ওর নিরাপদ কামরায়।

অন্তত দীপের তা-ই ধারণা।

পনেরো

ছায়া।

বিছানায় বসে আছে দীপ। জানালার গায়ে কালো কালো, আয়তাকার ছায়াগুলো দেখছে বিস্ফারিত চোখে।

ছায়া। ছায়া দেখার কী আছে? গত চার বছর জানালার গায়ে একই ছায়া দেখে আসছে দীপ। একই রকমের গাছ, রাস্তার আলো, আলোর মাত্রা এবং অন্ধকার দেখছে ও গত ১৪৬০ দিন ধরে।

তা হলে এ ছায়াগুলো দেখে আমার গা শিরশির করে কেন? ভাবছে দীপ।

বিছানায় বসে রয়েছে ও, গত পাঁচ ঘণ্টা ধরে নট নড়নচড়ন

হয়ে এভাবেই বসে আছে, স্থির দৃষ্টি বেডরুমের জানালায়। ও বাড়িতে আলো জ্বলে উঠতে দেখার পর থেকে ও এভাবে বসে আছে। লুসিয়ানো মানুচ্চির শোবার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ওর কলজেটা ধক করে উঠেছিল। হামাগুড়ি দিয়ে বসে ছিল ঝাড়া তিন মিনিট। তারপর বুকে সাহস ফিরে পেতে উঁকি দিয়েছে।

আলো জ্বলছে তবে জানালার পর্দা নামানো। পর্দার ওপাশে কোনও নড়াচড়া লক্ষ করা যাচ্ছে না। ও ওদিকে একঠায় চেয়ে রইল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল দীপ। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

স্বপ্ন দেখছে দীপ। *পালাচ্ছে ও। রাতের অন্ধকারে ছুটছে, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। হুহু করে বাতাস কেটে যাচ্ছে কানের দু'পাশ দিয়ে, কাদের যেন ফিসফিস ভেসে আসছে, অনেকগুলো কণ্ঠ মিশে কুকুরের কান্নার মত একটা আওয়াজ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে কর্কশ এবং মিষ্টি।*

দীপের শরীরটা বেঁকে গেল ধনুকের মত, ফাঁক হলো চোয়াল, বেরিয়ে পড়ল ছোট ছোট ধারাল দাঁত, গলা চিরে বেরুল তীক্ষ্ণ এক চিৎকার। সামনে ঝাঁপ দিল দীপ, শূন্যে থাবা চালিয়ে মুঠোয় বন্দি করল একটা মথ। পুরে নিল মুখে। কচমচ করে চিবিয়ে খেতে লাগল। রস গড়িয়ে পড়ছে ঠোঁটের দু'কোণ বেয়ে।

ওর আরও খাবার দরকার।

মাটিতে ঝাঁপ দিল দীপ, ছোট ছোট গর্তের বাড়িতে যে প্রাণীগুলো বাস করে ওগুলোর নরম গলায় তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় বসিয়ে দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

ছাদে একটা শব্দ হলো দুম করে। চেয়ারে বসা দীপ লাফিয়ে উঠল। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে কলজে। মাথা নাড়ছে, যেন একটু

আগে দেখা দুঃস্বপ্নটাকে ঝাঁকি মেরে মস্তিষ্ক থেকে বের করে দিতে চাইছে।

'কে ওখানে?' ছাদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল দীপ। কান পাতল। বাড়ির কোনাকাঞ্চির পরিচিত শব্দগুলোই শুধু ভেসে এল। বাতাসের মৃদু শব্দ, অ্যাকুয়ারিয়ামের বুদ্বুদের আওয়াজ, রেফ্রিজারেটরের গুনগুন। মা ঘুমাচ্ছেন পাশের ঘরে।

চিলেকোঠার ঘরের কড়িকাঠে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ হলো। *চিলেকোঠা?* দীপ লাফ মেরে নামল চেয়ার থেকে। কড়িকাঠের শব্দটা মৃদু তবে নিয়মিত, ক্রমে সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে।

আঁচড় কাটার শব্দের মত।

বুকের সমস্ত সাহস জড়ো করে দীপ নিঃশব্দে এগোল দরজায়। সামান্য ফাঁক করল দরজা, উঁকি দিল, বেগতিক কিছু দেখলেই বন্ধ করে দেবে কপাট।

'মা?' গলা দিয়ে চিঁচিঁ আওয়াজ বেরিয়ে এল দীপের। 'মা, তুমি ওখানে?'

প্যাসেজ খালি এবং ভূতের মত নীরব। পা টিপে টিপে বেরুল দীপ, কার্পেটে ঘষা লেগে খসখস আওয়াজ তুলল। বেড়াল-পায়ে মার ঘরের সামনে চলে এল দীপ। এক চিলতে ফাঁক করল দরজা।

মাধুরী রডরিক মরার মত ঘুমাচ্ছেন। ঘুমের ওষুধ বোপাম-এর একটা পাতা বিছানার পাশের টেবিলে।

নিচে কিছু একটা আছে। অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে দীপ। নিচতলার বারান্দা থেকে আসছে শব্দটা। গ্লাসে নখ ঠোকার মত শব্দ।

মৃদু।

নির্মম।

দীপের হাঁটু হঠাৎ আলগা হয়ে এল। মা যেহেতু ঘুমাচ্ছেন

কাজেই ওই শব্দ কে করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তবে তার কথা ভাবতে চাইছে না দীপ। এমন কালিগোলা আঁধারে তো নয়ই। তবু ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ওকে।

হয়তো তেমন কিছু দেখতে পাবে না দীপ। ইঁদুরটিদুর জাতীয় কিছু একটা হয়তো হবে। ...তবে...

প্লাস্টিকের ক্রুশটা শক্ত করে চেপে ধরল দীপ, নেমে এল নিচে।

ষোলো

কাচের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে স্বস্তির এক নিঃশ্বাস ফেলল দীপ। আঁচড় কাটার মত যে শব্দটা ওর আত্মা উড়িয়ে দিয়েছিল সেটা আর কিছু নয়, জানালার শার্সিতে গাছের একটা ডাল ঘষা খাচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে ডাইনিং রুমে পা বাড়াল দীপ মুখে কিছু দেয়ার জন্য। খিদে পেয়েছে।

দীপ লক্ষ করেনি, ও কিচেনে ঢুকছে এদিকে সেই খচমচ আওয়াজটাও থেমে গেছে।

লুসিয়ানো মানুচ্চি শান্ত চোখে দেখছে ঘুমন্ত মাধুরী রুদ্রিককে। এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিল ঘরে। তারপর হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল মাধুরীকে। স্বপ্ন দেখছিলেন মাধুরী। মৃদু হাসলেন। লুসিয়ানো খোলা জানালার পাশ কাটিয়ে মেঝের ওপর কদম ফেলে আগে বাড়ল। মাধুরীর ঘরের ড্রেসিং টেবিলের মস্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। শয়তানি হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'তুমি জানো,' বেড়ালের মত গরগর করল সে, 'তুমি দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন।'

আয়নায় তার কোনও প্রতিচ্ছবি ফিরিয়ে দিল না হাসি।

প্রচণ্ড জোরে টান মেরে বেডরুমের দরজা বন্ধ করল সে।

ওপরতলায় মার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেল না দীপ, সে তখন ফ্রিজের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাতে ব্যস্ত।

স্যাণ্ডউইচ-এ ফিনিশিং টাচ দিল দীপ– চিজ স্লাইস, টমেটো, শসা, সালামি এবং হট টমেটো সস– কচমচ করে চিবুতে চিবুতে সিঁড়ি বাইতে লাগল ও।

হালকা পায়ে পার হলো প্যাসেজওয়ে, কাঁধের ধাক্কায় খুলে ফেলল বেডরুমের দরজা। ভেতরে পা রাখার আগে স্যাণ্ডউইচে মস্ত একটা কামড় বসাল। বন্ধ করল দরজা, ডেস্ক চেয়ারটা দরজার হাতলের নিচে ঠেক দিয়ে রাখল। বসল ও, অন করল টিভি, আরেক কামড়ে স্যাণ্ডউইচের বেশিরভাগ অদৃশ্য হয়ে গেল মুখের ভেতরে...

...এবং টের পেল ওর ঘাড়ের পেছনের ছোট চুলগুলো সরসর করে খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

অত্যন্ত ধীর গতিতে ঘুরল দীপ, যেন অশুভ চিন্তাটা দূর হয়ে যেতে যথেষ্ট সময় দিল। কিন্তু তাতে লাভ হলো না কোনও।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যাম্পায়ারটা।

জান বাজি রেখে ছুট দিতে চাইল দীপ। ইচ্ছে করল ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে। কিন্তু দুটোর কোনওটাই করতে পারল না। ও শুধু লাফ মেরে খাড়া হলো এবং মুখ থেকে আধখাওয়া স্যাণ্ডউইচ পড়ে গেল মাটিতে।

আয়েশী ভঙ্গিতে হামলাটা চালাল ভ্যাম্পায়ার। লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে দৃঢ় মুঠিতে চেপে ধরল দীপের গলা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর। মধুর হাসল ভ্যাম্পায়ার।

'একদম চিৎকার-চেঁচামেচি নয়। আমরা তোমার মার ঘুম ভাঙাতে চাই না, চাই কি, দীপ? তা হলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে, তাই না?' মাথা ঝাঁকাল দীপ। হাসল ভ্যাম্পায়ার। মসৃণ, সুন্দর দাঁতের সারি। 'কারণ তা হলে তাকেও আমার খুন করতে হবে, ঠিক?' সামান্য চাপ বাড়াল সে। ব্যথায় আগুন ধরে গেছে দীপের গায়ে।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে আবারও মাথা দোলাল দীপ। এ ছাড়া তার উপায়ও নেই। ভ্যাম্পায়ার তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যেভাবে ভেনট্রিলোকুইস্ট তার ডামিকে নিয়ে কাজ করে। ক্যারাটেতে ব্রাউন বেল্ট দীপ পিশাচটার বিরুদ্ধে একদমই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

'ঠিক,' বলে ভ্যাম্পায়ার দীপকে ধরে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলল দেয়াল লক্ষ্য করে। দীপ প্রচণ্ড বাড়ি খেল দেয়ালে। একতাল মাংসের মত হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়।

লুসিয়ানো এমন অলসভঙ্গিতে হেঁটে এল যেন র‍্যাম্প ওয়াক করছে। পঁয়ষট্টি কেজি ওজনের, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা দীপকে এক হাতে ধরে অনায়াসে হ্যাঁচকা টানে খাড়া করল। দীপের মাথা ঘুরছে বনবন করে।

'তুমি আমাকে কী ঝামেলায় ফেলেছ বুঝতে পারছ? আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছ, পুলিশকে আমার কথা বলে বিকেলের ঘুমটা নষ্ট করেছ।' দীপের গলায় আরও জোরে চাপ বাড়ল।

সে দীপকে ঠেসে ধরল দেয়ালে। তার দিকে ঝুঁকে এল লুসিয়ানো।

'আমি লুসিয়ানো দ্য লুসিফার। যাকে টার্গেট করি তার কবর দেখে ছাড়ি। মৃত্যু তোমার পাওনা, খোকা। তুমি মরে গেলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। তবে একটা সমস্যা আছে। একেবারে পাশের বাড়িতে হত্যাকাণ্ডটা ঝামেলা বাধাতে পারে।'

হাসছে ভ্যাম্পায়ার। 'বুঝতেই পারছ, আমার প্রাইভেসিতে নাক গলানো একটুও পছন্দ করি না। তা ছাড়া এ শহরটিকে আমার পছন্দও হয়েছে। আমি এখানে দীর্ঘদিন থাকতে চাই।' দীপের গলায় মুঠোর চাপ সামান্য আলগা হলো তবে দেয়ালের সঙ্গে এখনও ঠেসে ধরে আছে। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে দীপ।

'এসো একটা চুক্তি করা যাক, কেমন? তুমি আমার কথা ভুলে যাবে। আমিও তোমার কথা মনে রাখব না। কী বলো, দীপ?'

দীপ আত্মরক্ষার জন্য কিছু একটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ ক্রুশটার কথা মনে পড়ল।

পকেটে হাত ঢোকাল ক্রুশ বের করে আনতে। লুসিয়ানো ওর কব্জি ধরে এমন মোচড় দিল, যন্ত্রণায় চোখে সর্ষে ফুল দেখল দীপ। মনে হলো কাঁধের সকেট থেকে ছিঁড়ে যাবে হাত। মাথাটা বাড়ি খেল দেয়ালে।

'দেখি তো হাতে কী!' লুসিয়ানো আবার মোচড় দিল দীপের হাতে। অসহ্য ব্যথায় মুঠো খুলে পকেটের জিনিসটা পড়ে গেল মেঝেয়। ক্রুশ।

'আ-আমাকে আপনি মে-মেরে ফেললে সবাই সন্দেহ করবে,' হেঁচকির সুরে বলল দীপ। 'আমার ম্-মা, পুলিশ...'

কী যেন চিন্তা করল ভ্যাম্পায়ার, তারপর মিষ্টি হাসিতে ভরিয়ে তুলল মুখ।

'মৃত্যুটাকে যদি দুর্ঘটনার মত দেখানো যায় তা হলে কেউ সন্দেহ করবে না,' জানালার কাছে ঠেলে নিয়ে গেল সে দীপকে, এক পায়ের লাথিতে সরিয়ে দিল ভারী ড্রেসার। 'ধরো, এখান থেকে পড়ে মরে গেলে।' তালায় একটা টুসকি মেরে পেরেকগুলো এক এক করে তুলতে লাগল। 'ভ্যাম্পায়ার নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগা এক কিশোরের বেডরুমে ব্যারিকেড তৈরি

করতে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে মৃত্যুবরণের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়।'

এক পাক ঘোরাল সে দীপকে, ঝট করে খুলে ফেলল জানালা। 'নিঃসন্দেহে এটা একটা ভয়ানক ট্র্যাজেডি, কিন্তু অফিসার, ইদানীং ছেলেটা কেমন যেন সারাক্ষণ আত্মমগ্ন থাকত...আত্মহত্যাকারী টিনেজদের সম্পর্কে এরকম কথাই বলা হয়, তুমি জানো।'

ধীরে ধীরে লুসিয়ানো দীপকে ঠেলে দিচ্ছে জানালার বাইরে। দীপ উন্মাদের মত হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে, কিছু একটা খামচে ধরতে চাইছে অবলম্বনের জন্য। ডান হাতটা বাড়ি খেল জানালার গোবরাটে। শরীরের ঊর্ধ্বাংশে মোচড় দিয়ে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করল দীপ আত্মরক্ষার জন্য কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে।

শেষ ধাক্কাটা দেয়ার আগে মুহূর্তের জন্য পেশীতে ঢিল দিল লুসিয়ানো। পিঠটা ধনুকের মত বাঁকা করল দীপ, হেলে গেল বাঁয়ে, টেবিল হাতড়াচ্ছে পাগলের মত।

ওর নিচে মুখ হাঁ করে আছে কৃষ্ণ কালো রাত, পঁচিশ ফুট নিচে শানবাঁধানো শীতল জমিন। ওখানে ছিটকে পড়লে পাকা তরমুজের মতই মাথাটা ফেটে চৌচির হবে দীপের।

আবার ধাক্কা দিতে লাগল ভ্যাম্পায়ার। ওটার গায়ে অবিশ্বাস্য শক্তি। দীপ ডেস্কের ওপরে হাতড়াচ্ছে, যা হোক কিছু একটা পেতে চাইছে। এবং পেয়ে গেল...

একটা পেন্সিল। আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে খামচে ধরল পেন্সিলটাকে। টেনে আনছে হাতটা।

হাতটা ঘুরিয়ে পেন্সিলটা তুলে নিল দীপ, একটু মিস হলেই ওটা সোজা ওর গলায় ঢুকে যেত। বদলে গেঁথে গেল ভ্যাম্পায়ারের হাতের মাংসে। গুঙিয়ে উঠল লুসিয়ানো, ঝাঁকি

খেয়ে পেছন দিকে সরে গেল, বেড়ালের মত হিসহিস করছে।

ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করল দীপ। সামনের দিকে হেলে গেল শরীর, খকখক কাশছে।

...এমন সময় পরিবর্তন শুরু হলো লুসিয়ানোর শরীরে।

প্রথমে বোটকা, বমি ওঠা একটা গন্ধ নাকে এল। বিকট গন্ধের ঢেউটা বাড়ি মারল দীপের নাকে, নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসতে চাইল, কানে বাজল অসংখ্য মাছির গুঞ্জন ধ্বনি। এখনও পুরোপুরি সিধে হতে পারেনি দীপ, ঘুরে দাঁড়াবার শক্তিও নেই, সামনে যে ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস দৃশ্যটা ঘটছে তা দেখে ওর চোয়াল ঝুলে পড়ল।

লুসিয়ানো মানুচ্চির শরীর মোচড় খাচ্ছে প্রচণ্ড যন্ত্রণায়, বিকৃত হয়ে উঠছে চেহারা। আহত হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে, পেন্সিলটা গেঁথে রয়েছে মাংসে। কাঠপোড়া বিশ্রী গন্ধ নিয়ে হালকা একটা ধোঁয়া বেরুচ্ছে হাতের গর্ত থেকে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যাম্পায়ার, পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। দীপের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ওর কলজে লাফিয়ে উঠল দেখে ভ্যাম্পায়ার চট করে সিধে হয়েছে।

চোখ পিটপিট করল দীপ। লুসিয়ানো মানুচ্চিকে ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।

লুসিয়ানোর চেহারা থেকে সেই মসৃণ ভাবটা সম্পূর্ণ উধাও। যে সুদর্শন চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দীপের মা, আসল লুসিয়ানোকে দেখলে তিনি ভিরমি খেতেন। আসল লুসিয়ানো কুৎসিত, কদাকার একটা প্রাণী। তার নিচের চোয়াল ঝুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে হলুদ দাঁত। চুলগুলো মোটা মোটা, কর্কশ এবং বিবর্ণ, কানের গড়ন বদলে গিয়ে হয়ে উঠেছে সুচাল। মুখের চামড়া ফ্যাকাসে, অসংখ্য গর্ত তাতে। আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ওটার চোখ জোড়া।

ওটার চোখ...

চোখ নয়, ওখানে রয়েছে দুটো লাল গর্ত। স্ফীত গর্ত দুটো জ্বলজ্বল করছে, দু'টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মত, ভয়ঙ্কর চাউনি যেন দীপের খুলি পুড়িয়ে ঢুকে যাচ্ছে মগজে। ওর প্রাণরস শুষে নিচ্ছে। দীপের পিঠের পেশী ঢিলে হয়ে এল, দুর্বল পা আর বহন করতে পারল না শরীরের ওজন, ও হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল দেয়ালে।

নড়াচড়া করতে পারছে না।

হিসহিস করে উঠল ভ্যাম্পায়ার, লম্বা, বাঁকানো আঙুল দিয়ে খামচে ধরল পেন্সিল, নখে নখ বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলল। তারপর টান মেরে পেন্সিলটা বের করে আনল গর্ত থেকে।

মুখ কোঁচকাল দীপ। গর্তটা পুড়ে কালো হয়ে আছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও। ভ্যাম্পায়ার পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিল, ডগায় পচা, সাদা মাংসের টুকরো নিয়ে ওটা মেঝেতে পড়ল।

হাসল ভ্যাম্পায়ার। বিকট হাসি। ওটার শরীরের যাতনা কমছে, ভয়ঙ্কর ক্রোধের অভিব্যক্তিও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মুখ থেকে, আবার আগের চেহারা ফিরে পাচ্ছে সে।

তবে চোখ জোড়ায় কোনও পরিবর্তন ঘটল না। গনগনে কয়লার মত জ্বলছেই। নখে নখ বাড়ি খেল। আর ওটার দাঁতগুলো...

দীপের দিকে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছে ভ্যাম্পায়ার। একটা হাত তুলল, গর্তটা ফাঁক হয়ে আছে। 'আমার কী ক্ষতি করেছ দেখলে, খোকা!' বলল সে, এগিয়ে এল দীপের দিকে। ওকে মেরে ফেলবে।

দীপের পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে উঠল। 'নাআআ...' অসহায় সুরে গোঙাল সে।

এমন সময় ভেসে এল ওর মার চিৎকার।

সতেরো

'যাশ্‌শালা!' হিসিয়ে উঠে পাঁই করে ঘুরল ভ্যাম্পায়ার। *মহিলাকে প্রথম সুযোগেই আমার মেরে ফেলা উচিত ছিল।*

আবার দীপের দিকে ফিরল সে। দেয়ালে একটা বস্তার মত পড়ে আছে ছেলেটা। ছোকরাকে এক্ষুণি পিষে মেরে ফেলতে পারে সে। *না, অপেক্ষা করো, এখনও যথেষ্ট সময় আছে,* ভাবছে ভ্যাম্পায়ার। দীপকে ধরে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলার বাসনা দমন করল।

গত কয়েক শতক তাকে শিক্ষা দিয়েছে সহজে ধৈর্য না হারাতে। সে শেষবারের মত তাকাল দীপের দিকে এবং হিসিয়ে উঠল।

'দী-প!' মিসেস রডরিক প্যাসেজের শেষ মাথা থেকে চিল্লাচ্ছেন। **'আমার ঘরের দরজা খুলতে পারছি না।'**

দীপ প্রথমে কয়েক সেকেণ্ড বুঝতেই পারল না ভ্যাম্পায়ার ওর ঘর থেকে চলে গেছে। তারপর যখন বুঝতে পারল 'মা! মা!' বলে ডাকতে ডাকতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল টলতে টলতে। মার কিছু হলো কি না ভেবে ভীত।

নাহ্, ওর মা ঠিকই আছেন। তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর ঘরের দরজা ভাঙা। দীপ উন্মাদের চোখে ডানে বাঁয়ে তাকাল হুট করে কিছু যদি আবার হামলা করে বসে সে ভয়ে।

প্যাসেজের শেষ মাথার জানালাটা খোলা। চলে গেছে লুসিয়ানো। দীপ বুঝতে পারছে না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে কি না। নিঃশ্বাস ফেলল ও, পিঠ বেয়ে নামছে শীতল ঘামের

ধারা।

'দীপ, কী হয়েছে?'

না মা, কিছু হয়নি। তুমি যাকে কফি খাওয়াতে চেয়েছ সেই পড়শী ভ্যাম্পায়ার আমার ওপর হামলা করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। ব্যস।

'আ...আমি দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম, মা। তোমার দরজায় কী হয়েছে?'

বিস্মিত দেখাল মাধুরীকে। 'ঠিক বুঝতে পারছি না!' হঠাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো চেহারা। 'জানিস, আমিও একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমি একটা দোকানে গেছি কেনাকাটা করতে, টাকা বের করার জন্য পার্স খুলেছি হঠাৎ দেখি–'

ধাতব কিছু ভাঙার শব্দে বাধা পেলেন তিনি। বেশ কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হলো বিকট আওয়াজটা।

তারপর নীরবতা।

মাধুরী প্যাসেজের শেষপ্রান্তের খোলা জানালায় তাকালেন শূন্য দৃষ্টিতে। ওটার পরে বাড়ির পেছন দিককার উঠোন এবং গ্যারেজ।

'কীসের শব্দ ওটা?' এক কদম বাড়ালেন তিনি জানালায়, ঘুমঘুম ভাবটা এখনও যায়নি চোখ থেকে। দীপ মার হাত চেপে ধরল। ওর দিকে ফেরাল।

'কিছু না, মা। ডাস্টবিনে কুকুর-টুকুর বোধহয় লাফিয়ে পড়েছে। যাও, তুমি ঘুমাতে যাও।'

হাসলেন ওর মা। 'কিন্তু তুই যে বললি দুঃস্বপ্ন দেখেছিস। ঘুমের ওষুধ দেব? খাবি?'

দীপ মাকে নিয়ে তাঁর ঘরে চলল। 'না, ওষুধ লাগবে না। আমি ঠিক আছি। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, কেমন?'

মাধুরী হাই তুললেন। 'হুহ্, ঘুমানো দরকার। কাল থেকে

আমার নাইট শিফটের ডিউটি শুরু, জানিসই তো।' তিনি এখানকার সরকারি হাসপাতালে সিনিয়র স্টাফ নার্সের কাজ করেন।

'হ্যাঁ, মা। আমি জানি। গুডনাইট।'

মাধুরী ছেলের গালে আদর করে হাত বুলালেন।

'দীপ, তুই খুউউব ভালো...'

'শুভরাত্রি, মা।' দরজাটা টেনে বন্ধ করল দীপ, কজাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে আপত্তি জানাল।

আঠারো

নিজের ঘরে এসে আরামকেদারায় বসল দীপ। বিধ্বস্ত। অন্ধকারে টিভি চলছে, সাউণ্ড একদম কমানো। আধখাওয়া স্যাণ্ডউইচটা ওর দিকে মনমরা হয়ে তাকিয়ে আছে।

খাওয়ার কথা ভাবছে না দীপ। ঘরে বয়ে যাওয়া ঝড় এবং অগোছালো রুমের কী ব্যাখ্যা দেবে মার কাছে তা নিয়েও সে চিন্তা করছে না।

ও শুধু ভাবছে গ্যারেজের একটু আগের শব্দটা নিয়ে। টিভির দিকে আনমনা চাউনি। টিভিতে *মধ্যরাতের আতঙ্ক* শুরু হয়েছে। এ মুহূর্তে এ শোটা দেখা দরকার ছিল ওর। সাউণ্ড বাড়ানোর জন্য হাত বাড়িয়েছে দীপ, থেমে গেল ফোনের আওয়াজে।

বুকের রক্ত ছলকে উঠল দীপের। সামনে ঝুঁকে চট করে তুলে নিল মোবাইল। এক মুহূর্তের জন্য দূরে ধরে থাকল যেন ওটা একটা মরা জানোয়ার। তারপর ধীরে, খুব ধীরে কানে ছোঁয়াল ফোন।

কে ফোন করেছে অনুমান করতে পারছে দীপ।

‘আমি জানি তুমি ওখানে আছ, দীপ। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।’

মন্থর গতিতে জানালায় মুখ ফেরাল দীপ। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে লুসিয়ানো, দীপের বাড়ির দিকে চোখ। কানে ঠেকিয়ে রেখেছে মোবাইল ফোন। তার ভৃত্য হাঁটু মুড়ে বসেছে সামনে, আহত হাতে বেঁধে দিচ্ছে ব্যাণ্ডেজ।

নির্দয় হাসি ফুটল লুসিয়ানোর ঠোঁটে। ‘একটু আগে তোমার সাইকেলটা আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, দীপ...’

এজন্যই অমন বিকট শব্দ হয়েছে। হারামজাদা।

‘...তবে খুব শীগ্রি আমি তোমার যে দশা করব সে তুলনায় সাইকেল ভাঙার ক্ষতি কিছুই না।’

ধীরে সুস্থে ফোন রেখে দিল ভ্যাম্পায়ার। ফেলে দিল জানালার পর্দা। বসে আছে দীপ, এখনও হাতে ধরা মোবাইল, তাকিয়ে রয়েছে অন্ধকার জানালায়। ফোনের আলোটা নিভে যেতে চমক ভাঙল ওর। সিধে হলো। ফোন রেখে দিল বিছানায়, শুয়ে পড়ল খাটে। মনে প্রবল হতাশা। ফিরল টিভির দিকে। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল ওদিকে।

মধ্যরাতের আতঙ্ক-র উপস্থাপক ও অভিনেতা রেমো ডি’সুজা বলছেন, ‘স্বাগতম, হরর ভক্তগণ। আশা করি আজকের শো “আমি ভ্যাম্পায়ার!” পর্ব দুই আপনারা উপভোগ করবেন। এটি আমার অন্যতম সেরা শো।’ তিনি অলক্ষুণে দৃষ্টিতে চারপাশে একবার তাকালেন। ‘আপনারা কি জানেন, অনেক লোকই ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করে না? তবে আমি করি। কারণ আমি জানি ভ্যাম্পায়ার আছে। এদেরকে আমি নানান চেহারায় দেখেছি: পুরুষ, নারী, নেকড়ে, বাদুড়।’ দীপ এবার মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

‘আর ওরা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। ওদের

সঙ্গে লড়াইয়ে আমি সবসময় জিতে গেছি। এজন্যই লোকে আমাকে বলে ''দ্য গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলার''।' স্টুডিওতে কেউ খিকখিক করে হেসে উঠল। কটমট করে ওদিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকালেন তিনি। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'সেকেণ্ড বিরতি নিলেন।

'এবারে উপভোগ করুন ''আমি ভ্যাম্পায়ার!'' পর্ব দুই (দুই দুই দুই...)

তাঁর কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। পর্দায় তরুণ চেহারার রেমো ডি'সুজাকে হাজির হতে দেখা গেল, হাতে কাঠের গোঁজ এবং কাঠের ছোট হাতুড়ি। ক্যামেরা প্যান করে দেখাল একটি ভুতুড়ে প্রাসাদের অসংখ্য কামরাঅলা লম্বা এক করিডর।

উঠে বসল দীপ, পর্দায় আঠার মত লেগে আছে চোখ। 'ওকে ধরুন, রেমো। ওকে ধরুন,' ফিসফিস করল ও।

আর ঠিক তখন দীপাঞ্জল রডরিকের মাথায় দারুণ একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

উনিশ

বরিশালে, সদর রোডে, কসাই মসজিদের সামনে লাল ইটের ভবনে কীর্তনখোলা টিভি'র স্থানীয় অফিস। পাঁচতলা ভবনের ছাদে দাঁড়ালে কীর্তনখোলা নদী দেখা যায়। চার এবং পাঁচতলা জুড়ে চ্যানেলের অফিস। বাকি তলাগুলো দখল করেছে ফাস্টফুডের রেস্টুরেন্ট, ব্যাংক এবং শপিং মল।

মধ্যরাতের আতঙ্ক-র উপস্থাপক ও অভিনেতা রেমো ডি'সুজা শুকনো মুখে অফিসের সাইড ডোর থেকে নিঃশব্দে

বেরিয়ে এলেন, কাঁধে ফেলে রেখেছেন কালো একটা কোট। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। কারও সঙ্গে এখন দেখা না হলেই রক্ষা। নেমে এলেন রাস্তায়। গাড়ির সামনে এসেছেন, পেছন থেকে ডাক শুনে থেমে গেলেন।

'মি. ডি'সুজা।'

ঘুরলেন তিনি। ১৭/১৮ বছরের একটি ছেলে দ্রুত কদম ফেলে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। একটা ঝকঝকে মার্সিডিস গাড়ির দরজায় হাত রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

'মি. ডি'সুজা, আপনার সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি? খুব জরুরি।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন রেমো ডি'সুজা। শার্টের পকেট থেকে বের করলেন ঝর্ণা কলম। 'নিশ্চয়...বলো, কোথায় সই করতে হবে?'

'জি?'

ডি'সুজা সাহেব ভুরু কুঁচকে তাকালেন ছেলেটার দিকে।

'বললাম তোমার কি অটোগ্রাফ লাগবে? অটোগ্রাফ বই কই? আমি একটু ব্যস্ত আছি।'

দীপ বলল, 'না, স্যর, আমি অটোগ্রাফের জন্য আসিনি। কাল রাতে আপনি টিভিতে যা বলেছেন তা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। আপনি বলেছিলেন আপনি ভ্যাম্পায়ার বিশ্বাস করেন।'

'তো?'

'আপনি কি সত্যি এসবে বিশ্বাস করেন?'

'অবশ্যই। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলো,' শুকনো গলা ডি'সুজার। 'তোমাদের জেনারেশনের কেউ এসবে বিশ্বাস করে না।'

তাঁর চোখ জ্বলে উঠল।

হতবুদ্ধি দেখাল দীপকে। 'মানে?'

'মানে হলো আমার চাকরিটা আর নেই। আমাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে কারণ কেউ আর ভ্যাম্পায়ার কিলারদের দেখতে চায় না। কিংবা ভ্যাম্পায়ার দেখারও কারও শখ নেই। তোমার বয়সীরা সবাই ব্যস্ত শুধু ফেসবুক আর হোয়াট'স অ্যাপ ইত্যাদি নিয়ে। আচ্ছা, আমি গেলাম।'

দীপ বিস্মিত হয়ে দেখল গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে রেমো ডি'সুজা রাস্তার ওপাশে লক্কড় ঝক্কড় একটা ভক্সওয়াগনের দিকে পা বাড়িয়েছেন। ও ডি'সুজার পিছু নিল।

'স্যর, প্লিজ, দাঁড়ান! আমি ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করি!'

'বেশ,' ডি'সুজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। 'তোমার মত অন্যেরাও যদি বিশ্বাস করত তা হলে আমার অনুষ্ঠানের রেটিং আরও ওপরে থাকত।'

ভক্সওয়াগনের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন রেমো ডি'সুজা। মরিয়া হয়ে উঠল দীপ। 'বিশ্বাস করুন, আমার বাড়ির পাশেই এক ভ্যাম্পায়ার বাস করে। আপনি কি ওটাকে হত্যা করতে পারবেন?'

দাঁড়িয়ে পড়লেন ডি'সুজা। ঘুরলেন। দীপের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন। 'কী বললে?'

দীপও দাঁড়াল। 'বললাম আপনি কি ওটাকে হত্যা করতে পারবেন?'

রেমো ডি'সুজার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ সুরে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'বাহ্, বেশ বেশ! অতি চমৎকার। তোমাকে এসব কথা বলার জন্য কে পাঠিয়েছে ছোকরা? রায়হান? শফিক? নাকি হারামজাদা ক্রুগুলো সবাই আমার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে এ কাণ্ড করেছে? আমার চাকরি তো

গেছেই, শেষ মুহূর্তে অপমান করে বিদায়ের ষোলোকলা এভাবে পূর্ণ করা হলো, না?' দীপ হাঁ করে দেখছে ডি'সুজাকে।

'ওরা তোমাকে এজন্য কত দেবে বলেছে? গার্লফ্রেণ্ডকে ট্রিট দেয়ার জন্য কিছু টাকা পাবে বলে কাজটা করতে এসেছ, তাই না?'

গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছেন ডি'সুজা। পকেটে হাত ঢোকালেন চাবির জন্য। পেলেন না।

'ওই খুনগুলো, স্যর। খবরের কাগজে যেসব খুনের খবর ছাপা হয়েছে সেগুলোর কথা বলছি। ওই খুনগুলোর জন্য দায়ী এক ভ্যাম্পায়ার এবং সে আমার পাশের বাড়িতেই থাকে।'

রেমো ডি'সুজা ওর দিকে ফিরলেন। 'আর মশকরা কোরো না তো, বাপু। ভালো লাগে না,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'তোমার ডিউটি তো পালন করেছ। এখন বিদায় হও। গার্লফ্রেণ্ডকে ট্রিট দাও গে, যাও।'

দীপের শেষ আশাটা উবে যাচ্ছে। ও রেমো ডি'সুজার কোটের ল্যাপেল চেপে ধরল। **'মি. ডি'সুজা, আমি মশকরা করছি না। আমি ভয়ানক সিরিয়াস।'**

অভিনেতার চোখ সামান্য স্ফীত হলো। *এ নির্ঘাত পাগল*, মনে মনে বললেন তিনি। দীপের হাত সযত্নে সরিয়ে দিলেন ল্যাপেল থেকে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তবে আমার কিছু করার নেই।' দীপ কীসে যেন হোঁচট খেয়ে একটু পিছিয়ে গেল, এ ফাঁকে দ্রুত গাড়ির দরজা খুলে ফেললেন রেমো ডি'সুজা।

'কিন্তু আপনি না বললেন আপনি ভ্যাম্পায়ার বিশ্বাস করেন...।'

'মিথ্যা বলেছি। এখন ভাগো।'

অভিনেতার জবাব বিমূঢ় করে তুলল দীপকে। রেমো

ডি'সুজা লাফ মেরে উঠে পড়লেন গাড়িতে, বন্ধ করে দিলেন দরজা। ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল দীপ।

'প্লিজ, আমার কথা শুনুন! গত রাতে ভ্যাম্পায়ারটা আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। না পেরে আমার সাইকেলটা ভেঙে ফেলেছে।' ম্যানিয়াকের মত গাড়ির জানালায় হাত দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল দীপ। রেমো ডি'সুজা পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন গাড়ি।

'ও আবার আমাকে হত্যা করতে আসবে বলেছে। আপনি আমাকে যদি সাহায্য না করেন, খুন হয়ে যাব আমি...'

চওড়া একটা বৃত্ত নিয়ে গাড়ি ঘোরালেন রেমো, দীপ এখনও ঝুলে আছে তাঁর বাহনের সঙ্গে।

'আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে!'

ডি'সুজা শেষবারের মত তাকালেন ওর দিকে যেন ও রোগাক্রান্ত একটা জানোয়ার। তারপর গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন। পার্কিং লট থেকে শব্দ করে বেরিয়ে এল রঙচটা লক্কড় ঝক্কড় কচ্ছপ গাড়িটা।

'মি. ডি'সুজা!'

দীপ অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখল তার শেষ আশাটা চলে যাচ্ছে।

বিশ

হালদারদের বাড়িতে ল্যাণ্ড ফোন বাজছে। তবে নিশ্চয় এটা হরর হাবলুর ফোন নয়। কারণ হাবলুর কোনও বন্ধু নেই তাই কেউ তাকে ফোন করে না। অথচ হরর হাবলুর বাবা ক্লেমেন্ট হালদার এবং মা শেফালি হালদার দু'জনেই বেশ আমুদে স্বভাবের।

মানুষজনের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করেন। তাঁদের ছেলেটা হয়েছে একদম উল্টো। হাবলু সন্ন্যাসী কাঁকড়ার মত। সবসময় গর্তে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। কলেজ ছাড়া ঘরের বার হতেই চায় না। হাবলুর বাবা মা বুঝতে পারেন না তাঁদের ছেলে কেন এরকম ঘরকুনো স্বভাবের হলো, কেন সে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে না, মৌজ মস্তিতে আগ্রহ নেই।

হরর হাবলুর বাবা মার জানা নেই হাবলু আসলে মানুষজনের সান্নিধ্যই সহ্য করতে পারে না। তবে হাবলুর বাবা মা বাধ্য হয়েই ছেলের ঘরকুনো স্বভাবটা শেষতক মেনে নিয়েছেন। তাঁরা যখন সামাজিক কর্মকাণ্ড করছেন কিংবা আড্ডা দিচ্ছেন, হরর হাবলু ওইসময় ঘরে বসে হয় হরর বই পড়ে, হরর সিনেমা দেখে কিংবা রং তুলি দিয়ে হরর মুখোশের ছবি আঁকায় ব্যস্ত থাকে। আর হাবলুর বন্ধু নেই বলেই তার কাছে কোনও ফোন আসে না। কাজেই আজ যখন ফোন বাজছিল কেউ ভাবেনি ওটা ছিল হাবলুর ফোন।

আর কেউ তো কল্পনাই করেনি যে ফোনটা করেছে একটি মেয়ে।

মিসেস হালদার যখন ফোন ধরে চেঁচিয়ে জানালেন একটি মেয়ে তার পুত্রধনকে ফোন করেছে, স্বভাবতই হরর হাবলু কৌতূহলে মরে যাচ্ছিল কে তাকে ফোন করেছে জানার জন্য।

তৃষা, পূজা, শারমিন, নূপুরসহ আরও কয়েকটি মেয়ের নাম মনে পড়ল হাবলুর। এরা সকলে ওর সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। কিন্তু এরা কখনও হাবলুকে ফোন করবে না কারণ হাবলুর সঙ্গে এদের কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না সে। আর এরা হাবলুকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে বলে হরর হাবলু এদেরকে মোটেই পছন্দ করে না।

হাবলু গিয়ে ফোন ধরল।

'হ্যালো?' গলার স্বর মোটা করে জানতে চাইল সে।

'হ্যালো, হাবলু?' ভারী মিষ্টি এবং মার্জিত একটি নারী কণ্ঠ ভেসে এল ওপ্রান্ত থেকে। নাহ্, দুষ্টের শিরোমণি মেয়েগুলোর কেউ নয়।

'আহ্...হ্যাঁ,' হাবলুর মস্তিষ্ক চলছে ঝড়ের বেগে। *কে এই মেয়ে?* মনে মনে প্রশ্ন করল ও। 'কে বলছ?'

'আমি মারিয়া রোজারিও। দীপের...বান্ধবী।' মেয়েটির কণ্ঠ নার্ভাস, বিব্রত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত শোনাল। 'তোমার সঙ্গে আমার খুব দরকার।'

'কী দরকার?'

'আ...ইয়ে...' ইতস্তত গলায় মারিয়া বলল, 'ইদানীং দীপের আচরণে বিসদৃশ কিছু চোখে পড়েছে তোমার?'

'ওর চেহারা ছাড়া অন্য কোনও বিসদৃশের কথা বলছ?'

'আমি ঠাট্টা করছি না, হাবলু। দিস ইজ সিরিয়াস। ও কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছে। আমার ভয় লাগছে।'

'তাই নাকি?' বলল হাবলু। হঠাৎ গতকালকের কথা মনে পড়ে গেল ওর। হাসতে লাগল।

'ও গতকাল আমার বাসায় এসেছিল,' বলে চলল হাবলু। 'খুবই উদ্‌ভ্রান্ত লাগছিল ওকে। বলল আমার সাহায্য দরকার, কারণ–'

'ওহ, গড।'

'–একটা ভ্যাম্পায়ার নাকি ওকে হত্যা করতে চাইছে। তোমাকেও একই গল্প শুনিয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ, ওহ, গড,' হরর হাবলু মনশ্চক্ষে পরিষ্কার দেখতে পেল মারিয়া পায়চারি করছে আর আঙুলের গাঁটে কামড় দিচ্ছে। দৃশ্যটা কল্পনা করে মজা পেল সে।

'মনে হচ্ছে তোমার বয়ফ্রেণ্ডের মাথাটা গেছে। শীঘ্রি ওকে রশি দিয়ে বেঁধে পাবনা পাঠিয়ে দাও।'

'কী?'

'মানসিক রোগীদের সেরা হাসপাতালটা আছে ওখানে। জানো না?'

'হাবলু,' কাতরে উঠল মারিয়া। ওর কাতর ধ্বনিটা এমন করুণ, থতমত খেয়ে গেল হরর হাবলু। 'প্লিজ, ইয়ার্কি কোরো না। আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করো। কী ঘটছে আমাদের খুঁজে বের করা দরকার–'

'এক মিনিট,' বাধা দিল হাবলু, এবারে আর মশকরা করছে না সে, সিরিয়াস কণ্ঠস্বর। 'তুমি যেন কী বললে? ''আমরা'' শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনেছি কি আমি?'

'হ্যাঁ, আমি...' হাবলুর গলার স্বর এক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় করে তুলল মারিয়াকে। 'আমি ভাবলাম তুমি হয়তো ওকে সাহায্য করবে,' দ্রুত যোগ করল ও। 'তুমি তো ওর বেস্ট ফ্রেণ্ড এবং–'

'তুমি অতীত কালের কথা বলছ, মারিয়া। ও আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড ছিল। কিন্তু এখন সে অন্য আর দশটা সহপাঠীর মতই আমাকে এড়িয়ে চলে। এখন যদি সে কাগুজে ড্রাকুলার গলা কাটতে যেতে চায় তো যাক না। তবে গলা কাটতে যেন ভালো কাঁচি ব্যবহার করে।'

'তুমি বড্ড স্বার্থপরের মত কথা বলছ, হাবলু।'

'আমি সত্যি স্বার্থপর, মারিয়া। এবং স্বার্থপরের মত কথা বলতে আমার একটুও সংকোচ হচ্ছে না।'

'বেশ! বেশ!' মারিয়া রেগে গেছে। 'সেদিনের কথা তোমার মনে নেই যেদিন রনি আর হায়দার মিলে তোমাকে ঘোড়ামিয়ার দোকানের পেছনে বসে ধোলাই দিচ্ছিল? সেদিন তোমাকে

কে উদ্ধার করেছিল? ফুটবল মাঠের ঘটনাটার কথাও ভুলে গেছ?'

'এসব তোমাকে কে বলেছে?' মিইয়ে গেল হরর হাবলু। ঘোড়ামিয়ার দোকানের দৃশ্যটা ঝটিত মনে গেল। রনি এবং তার ডান হাত হায়দার ওকে টেনে হিঁচড়ে খালের থকথকে কাদায় ফেলে দিতে যাচ্ছিল। লোহার চেইনের আঘাতে ডান হাতটা অনেকখানি কেটে গিয়েছিল হাবলুর। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগটা এখনও দগদগ করছে বাইসেপের ওপর।

সেদিন কে রক্ষা করেছিল আমাকে? মনে মনে বলে হরর হাবলু। *কে রনিকে ঘুষি মেরে চোখে কালশিটে দাগ ফেলে দিয়েছিল এবং কার লাথি খেয়ে হায়দার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কে?*

সব কথা মনে আছে হরর হাবলুর।

'দীপ আমাকে বলেছে,' বলছে মারিয়া। 'দীপ তোমার অনেক গল্প করেছে আমার কাছে। একসাথে *মধ্যরাতের আতঙ্ক* দেখার সময় ও বলত, "আমি আর হরর হাবলু এ পর্বটি একসঙ্গে অন্তত এক ডজনবার দেখেছি।"'

'সে তো অনেকদিন আগের কথা,' বাধা দিল হাবলু।

'ওকে, ফাইন,' অনুযোগের সুরে বলল মারিয়া। 'তুমি ঠিকই বলেছ। ওসব প্রাচীন ইতিহাস। তুমি নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝো না। বন্ধুর উপকারের প্রতিদান দিতেও জানো না। তুমি আসলে–'

'ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে,' বিস্ফোরিত হলো হরর হাবলু।

চুপ হয়ে গেল মারিয়া। কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর হাবলু জানতে চাইল, 'আমাকে এখন কী করতে হবে বলো?'

'আন্টি?' খিড়কির দুয়ারে ধাক্কা দিল মারিয়া। খোলা। উঁকি দিল ভেতরে। 'আন্টি? দীপ? বাড়িতে কেউ আছ?'

কোনও সাড়া নেই। সুনসান বাড়িতে ডাইনিং থেকে ভেসে আসা রেফ্রিজারেটরের গুঞ্জনধ্বনি ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। ওরা কি কেউ বাসায় নেই? ভাবছে মারিয়া। সদর দরজা বন্ধ। দীপ এবং তার মা বেশিরভাগ সময় খিড়কির দুয়ার ব্যবহার করেন। সদর দরজা বন্ধ থাকলে মারিয়াও এ পথেই যাতায়াত করে। আর ওদের শহরে চুরি ডাকাতি খুব কম হয় বলে অনেক বাসাতেই খিড়কির দুয়ার খোলা রাখে লোকে। মারিয়া হরর হাবলুর দিকে ফিরল। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। পা রাখল ঘরে।

সিঁড়ি গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঠের সাথে কাঠের ঘর্ষণের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। তারপর আবার নিশ্চুপ সবকিছু। 'এসো,' বলল মারিয়া। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল দু'জনে।

দীপের ঘরের দরজা বন্ধ। পাতলা এক ফালি আলো বেরিয়ে এসেছে দরজার নিচ থেকে। খসখসে একটা শব্দ শোনা গেল। এক মুহূর্ত বিরতি দিল ওরা, একে অন্যের দিকে তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

'ও ওখানে কী করছে?' মারিয়ার কানে ফিসফিস করল হাবলু।

'জানি না। চলো গিয়ে দেখি।'

'চলো।'

কাছে আসার পরে ক্রুশটা চোখে পড়ল ওদের। বেশ বড় আকারের ক্রুশ এবং ওজনদার, মেহগনি কাঠের ওপর রুপো দিয়ে মোড়ানো। দীপের দরজায় লেখা **প্রবেশ নিষেধ** সাইন বোর্ডের এক হাত ওপরে ঝুলছে ক্রুশ, আলো পড়ে ঝলকাচ্ছে।

শেষবারের মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু'জনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হাবলু, হাত রাখল দরজার হাতলে, মোচড় দিল।

'যীশাস ক্রাইস্ট!' আঁতকে উঠল হাবলু। ঝট করে ওদের দিকে ফিরে চাইল দীপ, চিৎকার দিয়ে চেয়ার থেকে এক ফুট ওপরে লাফিয়ে উঠেছে। মারিয়ার গলা দিয়েও বেরিয়ে এল চিৎকার, মুখে হাত চাপা দিল সে, চোখ বিস্ফারিত। ওরা তিনজন একে অন্যের দিকে দীর্ঘক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল।

'যীশাস ক্রাইস্ট,' আবার ঈশ্বরের পুত্রের নাম নিল হরর হাবলু।

দীপের ঘর দুর্গ আর গির্জার যৌথ একটা সমন্বয়ে পরিণত হয়েছে। টেবিল এবং ডেস্কের এক ইঞ্চি জায়গাও খালি নেই, দখল করে রেখেছে জ্বলন্ত মোমবাতি। দেয়াল জুড়ে থাকা ব্রুস লি আর মোহাম্মদ আলির বড় বড় পোস্টারের গায়ে ঝুলছে অসংখ্য ক্রুশ। প্রতিটি জানালায় রসুনের মালা, বিছানাও ভরে আছে ওতে।

মেঝেয়, দীপের পায়ের কাছে কর্কশ চেহারার হাতে তৈরি এক জোড়া কাঠের ক্রুশ, একটির ওপর আরেকটি শুয়ে আছে। ক্রুশগুলো তিন ফুট লম্বা, পাঁচ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং পৌনে এক ইঞ্চি মোটা। দীপ ক্রুশের মাথার দিকটা চেঁচে ফেলে তীক্ষ্ণ এবং ধারাল করে রেখেছে।

তিন নম্বর ক্রুশটা বানাচ্ছিল দীপ। ওর বাঁ হাতে ক্রুশের ভ্রূণ আর ডান হাতে ধারাল একটি ছুরি।

এ ক্রুশ কোনও মানুষের বুকে গাঁথলে তার কলজে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে।

'আমার ঘরের চেহারা দেখে নিশ্চয় তোমাদের অবাক লাগছে?' বলল দীপ।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল হরর হাবলু। তবে মারিয়ার মুখে কোনও কথা জোগাল না। সে দীপের কাণ্ড দেখে বাকরুদ্ধ।

'আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি,' বলল দীপ। 'এ ঘরে থাকলে লুসিয়ানো আমাকে হামলা করতে পারবে না। ওর ভৃত্যটা বাড়ির বাইরে যাওয়া মাত্র আমি ওখানে গিয়ে এ জিনিসটা ঢুকিয়ে দেব।'

'কিন্তু–' মারিয়া বলতে গেল। চিৎকার করে ওঠার পরে এই প্রথম ওর গলায় রা ফুটল।

'না,' বাধা দিল দীপ। তার কণ্ঠ নিরাসক্ত এবং ভোঁতা। 'আমি শুনতে চাই না যে আমি উন্মাদের মত আচরণ করছি। আমি শুনতে চাই না যে আমি ফ্যান্টাসির জগতে বসবাস করছি। আমার পাশের বাড়ির লোক একজন ভ্যাম্পায়ার। গত রাতে সে আমাকে প্রায় মেরে ফেলছিল। তোমরা কিংবা আমার মা আমার কথা বিশ্বাস করো বা না করো তাকে আমার কিস্যু আসে যায় না। রেমো ডি'সুজাও আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমি নিকুচি করি।

'বিশ্বাস করো, আমার পড়শী একটা ভ্যাম্পায়ার এবং সে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে কারণ সে জানে আমি তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছি। তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো তো জাহান্নামে যাও। আমি এ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কারণ আমার হাতে সময় নেই।'

কাঠের গোঁজের মাথা আবার চাঁচতে লাগল দীপ।

'এক মিনিট,' অবশেষে বলল হাবলু। 'রেমো ডি'সুজা আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমি নিকুচি করি। এ কথার অর্থ কী? তুমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছ?'

'হুঁ,' মুখ তুলে না তাকিয়েই জবাব দিল দীপ। কাঠের ছিলকা ফেলছে মেঝেতে।

'উনি কী বললেন?'

তিক্ত হাসল দীপ। 'সবাই যা বলে উনিও তা-ই বলেছেন। আমি নাকি পাগল।' কাঠের গোঁজে দ্রুত চলছে ছুরির ফলা। 'তাতে আমার বয়েই গেল'।'

'তাতে তোমার বয়েই গেল মানে? তোমার কি কখনও মনে হয়নি তুমি যা বলছ ভুল বলছ?'

'আমি ঠিক বলছি এ কথা তোমাদের কখনও মনে হয়নি?' খাড়া হলো দীপ। হাতে ছুরি এবং গোঁজ। রাগে কাঁপছে। 'মেয়েটার ঘাড়ে ওকে কামড়ে দেয়ার দৃশ্যটা তোমরা তো আর দেখনি। তোমরা দেখনি বাদুড় থেকে সে কীভাবে মানুষ হয়ে গেল! তোমরা দেখনি গত রাতে সে এখানে এসে কীভাবে আমাকে খুন করতে চেয়েছে!'

'তুমি কী বলছ নিজেই জানো না।'

'দীপ, প্লিজ,' মিনতি ঝরে পড়ল মারিয়ার গলায়। প্রায় ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ। জল এসে গেছে চোখে। 'এ উন্মাদনা। তুমি–'

'মারিয়া,' কঠোর এবং শীতল দীপের মুখ। 'আমার একটা উপকার করো। বাড়ি চলে যাও।'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই!' অস্ফুটে বলল মারিয়া।

'চমৎকার! যদি সত্যি সাহায্য করতে চাও তা হলে ওই গোঁজগুলোর একটা তুলে নাও হাতে এবং আমার সঙ্গে চলো। আমার শুধু এ সাহায্যই দরকার। এটুকু করতে না পারলে বাড়ি চলে যেতে পারো।'

'মারিয়া, চলো,' শান্ত গলায় বলল হরর হাবলু।

'কিন্তু...' ঝট করে হাবলুর দিকে ঘুরল মারিয়া। ওর চোখ ভেজা।

'চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ও আমাদের কথা শুনবে না,' বলল হাবলু। বিরক্ত।

'ও ঠিকই বলেছে,' সায় দিল দীপ। 'আমি তোমাদের কথা শুনব না।'

মারিয়া এবং দীপ একে অন্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। দীপের চেহারায় কাঠিন্য এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মারিয়াও তার চেহারায় ভাবটা আনতে চাইল তবে পারল না। ওর চোখে অশ্রু এসে যাচ্ছে।

'চলো,' তাগাদা দিল হাবলু। 'চলো, মারিয়া।'

খুব আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল মারিয়া, দীপের ওপর থেকে সরিয়ে নিল চোখ। ধীর গতিতে ঘুরল, কদম বাড়াল দরজায়। মৃদু হেসে একপাশে সরে দাঁড়াল হরর হাবলু। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল মারিয়া, ঘুরল।

'আই লাভ ইউ, দীপ,' বলল সে।

জবাবের অপেক্ষা করল না মারিয়া, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'গেলাম, দীপ। তুমি একটা অভিনেতা বটে,' চোখ টিপল হরর হাবলু, তারপর অনুসরণ করল মারিয়াকে।

'এখন আমরা কী করব?' জানতে চাইছে মারিয়া। ফুটপাত ধরে হাঁটছে হাবলুর সঙ্গে। দীপদের বাড়ির বন্ধ জানালায় তাকাল।

'এ স্রেফ পাগলামি,' বলল হাবলু। 'আমি কল্পনাও করিনি দীপটা এসব কাণ্ড ঘটাবে। গোঁজগুলো লক্ষ করেছিলে?' গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল মারিয়া। 'ভাবতে পারো ওরকম ধারাল একটা গোঁজ যদি কারও বুকে ঢুকিয়ে দেয়া হয় তা হলে–'

'হাবলু!' মারিয়ার চোখ লাল এবং ভীত।

'ওকে, ওকে, আয়াম সরি,' বলল হরর হাবলু। 'আমার

মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তবে ঠিক জানি না বুদ্ধিটা কাজে লাগবে কি না।'

'কী বুদ্ধি?' মারিয়ার চাউনি একটু নরম হলো।

একটু মাথা চুলকে নিল হাবলু। 'তোমার কাছে কিছু টাকা হবে?'

'কী?' খেঁকিয়ে উঠল মারিয়া। 'তুমি–'

'না, না। আমার জন্য চাইছি না, মারিয়া! একটু মাথা ঠাণ্ডা করে শোনোই না।'

শুনল মারিয়া।

দু'মিনিট পরে ওর মুখে হাসি ফুটল।

তিন মিনিট পরে বলল, 'আমি টাকার জোগাড় করছি। নো প্রবলেম।'

চার মিনিট পরে ওরা আতঙ্কের জগতে প্রবেশের জন্য পা বাড়াল।

একুশ

শহরের সর্ব দক্ষিণে, সাবান ফ্যাক্টরি গলির শেষ মাথায় একটি তিনতলা বাড়ির টপ ফ্লোরে থাকেন মি. রেমো ডি'সুজা। শহরের অন্যান্য এলাকার তুলনায় এদিকে বাসা ভাড়া কম। এবং বেশ নিরিবিলি। একা মানুষ এতদিন ভালোই ছিলেন। কিন্তু এখানকার পাট বুঝি এবারে তুলতেই হলো। কারণ তাঁর হাতে বাড়ি ভাড়া এবং বিদ্যুৎ বিলের কাগজ। একটি বিলও গত ছয় মাস ধরে পরিশোধ করা হয়নি। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কাগজটি হলো বাড়ি ছাড়ার নোটিশ। ছয় মাস ভাড়া বকেয়া রাখার কারণে তাঁকে আগামী মাসে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলা

হয়েছে। কীর্তনখোলা টিভিতে যোগ দেয়ার পরে এই প্রথম তাঁর আফসোস হচ্ছে কেন এন.জি.ও'র চাকরিটা ছেড়ে অভিনয় করতে গেলেন। কেয়ার-এ রিসার্চ অফিসারের কাজ করতেন। ব্যাংক লোন নিয়ে একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ভক্সওয়াগন কিনেছিলেন প্রতিষ্ঠানের কাজে বিভাগের বিভিন্ন শহরে প্রায়ই যেতে হত বলে। রেমো ডি'সুজা বরিশালের বিখ্যাত গ্রুপ থিয়েটার *শব্দাবলী*র একজন নাট্যকর্মী ছিলেন। বরিশালের মেয়র হাসিবুল হাসান যখন পাঁচ বছর আগে কীর্তনখোলা টিভি চ্যানেল চালু করেন পার্টনারশিপে, মেয়রের এক কমন ফ্রেণ্ডের রেফারেন্সে রেমো সাহেব তাঁকে হরর সিরিজ *মধ্যরাতের আতঙ্ক* প্রচার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সাহিত্যরসিক এবং হরর গল্পপ্রেমী মেয়রের প্রস্তাবটি পছন্দ হয়ে যায়। তাঁর উৎসাহে রেমো ডি'সুজা কীর্তনখোলা টিভিতে *মধ্যরাতের আতঙ্ক* শুরু করে দেন। তিনি এ সিরিজের উপস্থাপক এবং অন্যতম অভিনেতা। ধীরে ধীরে সিরিজটি জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল। শূটিং-এর জন্য প্রায়ই ঢাকা-বরিশাল দৌড়াদৌড়ি করতে হত বলে রেমো বাধ্য হয়েই এন.জি.ও'র কাজটা ছেড়ে দেন। রেমো সাহেবের দুর্ভাগ্য, বছর দুই আগে সরকার পরিবর্তনের কারণে বরিশালের মেয়র অসংখ্য মামলার আসামী হয়ে শেষতক আত্মগোপনে চলে যান। কীর্তনখোলা চ্যানেল থেকে তাঁর পার্টনারশিপও বাতিল হয়ে যায়। নতুন মালিকপক্ষ আর *মধ্যরাতের আতঙ্ক* চালাতে আগ্রহী ছিলেন না। সাপ্তাহিক সিরিজটি পাক্ষিকে এসে ঠেকে এবং TRP পড়ে গেছে এ অজুহাতে কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সিরিজটি বন্ধ ঘোষণা করেন। অবশ্য নতুন ম্যানেজমেন্ট খরচ কমাতে কয়েকটি অনুষ্ঠান বাতিল করার পরিকল্পনা করেছিল আগেই। শোনা যায় বিজ্ঞাপনের অভাবে তাদের নিজেদেরই নাকি ত্রাহি দশা। সে যে কারণই থাকুক না কেন দুঃখজনক ব্যাপার এটাই

যে সবার আগে বলির পাঁঠা হতে হলো *মধ্যরাতের আতঙ্ককে*।

আজ এসে রেমো ডি'সুজা শোনেন তাঁর চাকরি খতম। হাসিবুল হাসান এ চ্যানেলের সঙ্গে জড়িত থাকলে আজ রেমো সাহেবকে এমন অপমানজনকভাবে চ্যানেল থেকে বিদায় নিতে হত না। তিনি গত ছয় মাস ধরে বেতনও পাচ্ছেন না। বেতনের কথা বলতে গিয়ে অ্যাকাউন্টেন্টের মুখ ঝামটা খেতে হয়েছে। সে বলেছে, 'মিয়া, দেহেন না, কীর্তনখোলা ডুবতে বইছে। আমগোও তো ছয় মাস ধইরা বেতন বাকি। মাসখানেক পরে যোগাযোগ কইরেন। দেহি, কী করন যায়।'

অ্যাকাউন্টেন্ট জামানের বাংলা পাঁচের মত মুখটার কথা মনে পড়তে তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'জাহান্নামে যাক সবাই' বলে। তাঁর ঘরের দেয়াল জুড়ে নিজের অভিনীত *মধ্যরাতের আতঙ্ক* সিরিজের নানান পোস্টার। তিনি ত্রিশটির বেশি পর্বে অভিনয় করেছেন, উপস্থাপকের ভূমিকাতেও ছিলেন। এসব ছবির মধ্যে হিট করেছে *রক্তাক্ত প্রাসাদ, রাতের থাবা, আমি তোমার রক্ত খাব, ওখানে কে?* ইত্যাদি। চিরকুমার এবং আত্মীয় পরিজনহীন রেমো ডি'সুজা মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন *মধ্যরাতের আতঙ্ক*-র পেছনে। হরর ছবি তাঁর একমাত্র প্যাশন, তিনি ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করেন, একটু আধটু প্রেতচর্চাও করেন। স্বপ্ন ছিল *মধ্যরাতের আতঙ্ক* দিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করবেন, তারপর একসময় এমন হরর মুভি বানাবেন যা দেশে-বিদেশে হৈ চৈ ফেলে দেবে। কিন্তু হলো না। কীর্তনখোলার নতুন ম্যানেজমেন্ট গুণীর কদর করতে জানে না। জানলে কি আর রেমো ডি'সুজার মত প্রতিভাবান অভিনেতা, উপস্থাপক এবং পার্টটাইম সাইকিককে মুখের ওপর বলে দেয় 'আপনার *মধ্যরাতের আতঙ্ক* ফ্লপ শো। আপনি রাস্তা মাপেন!'

আগের এন.জি.ও'র কাছে গিয়ে আবার চাকরির জন্য ধর্না

দেবেন কি না ভাবছেন, চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল দরজায় কলিং বেলের শব্দে।

রেমো ডি'সুজার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। কোনও সন্দেহ নেই বাড়িঅলা। জানতে এসেছে কবে বাড়ি ছাড়ছেন তিনি। মুশকিল হলো বাড়িভাড়াসহ অন্যান্য ইউটিলিটি বিল পরিশোধের সামর্থ্য নেই রেমো সাহেবের। গত ছ'মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় ব্যাংকে জমানো টাকা পয়সাও সব শেষ। চোখে আঁধার দেখছেন এখন তিনি। তবে বাড়িঅলাকে আপাতত কিছু একটা বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় করে দেবেন চিন্তা করে পা বাড়ালেন দরজায়। উদ্বেগ নিয়ে অল্প খুললেন দরজার পাট।

বাড়িঅলা নয়, দুটি টিনেজ ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। ছেলেটাকে দেখে তাঁর হাসি পেল। তার চুলগুলো এমনভাবে খাড়া হয়ে আছে যেন ইলেকট্রিক শক-থেরাপি দেয়া হয়েছে মাথায়। পাগলাটে চেহারা। তবে তার পাশে দাঁড়ানো লাল জ্যাকেট পরা মেয়েটি ভারী সুন্দরী। পিঠ ছোঁয়া সিল্কি কালো চুলগুলো বাদামী রঙে হাইলাইট করা, চোখ জোড়া স্বচ্ছ সবুজ। নিশ্চয় কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেছে। তবে মেমসাহেবদের মত ধবধবে ফর্সা গায়ের রং ও উঁচু চোয়ালের কারণে মানিয়ে গেছে বেশ। তার ডাগর চোখের পাতাগুলো বেশ বড় বড়, ওপরের দিকে বাঁকানো। লম্বায় পাঁচ ফুট তিন-চার হবে। সঙ্গের ছেলেটা তারচেয়ে অনেক বেঁটে। পাঁচ ফুটও হবে কি না সন্দেহ। আর একদম রোগাপ্যাঁকাটি চেহারা। গায়ে ঢলঢলে কালো কোটে তাকে আরও হাস্যকর লাগছে।

'আংকেল,' ভীরু গলায় বলল মেয়েটি। 'আপনার সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি?'

তাৎক্ষণিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছেন মি. ডি'সুজা। ওদের মধ্যে অস্থির একটা ভাব। কিন্তু এ মুহূর্তে এদের সঙ্গে কথা

বলার মুড নেই তাঁর।

'আমি একটু ব্যস্ত আছি–' বলতে গেলেন তিনি।

'প্লিজ,' বলল মেয়েটি, চোখে এবং গলার স্বরে স্পষ্ট আকুতি। 'ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আচ্ছা, এসো,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কয়েক মিনিট ওদেরকে সময় দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ওদেরকে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দিলেন, তারপর বন্ধ করলেন দরজা। দু'জনকে নিয়ে ঢুকলেন ড্রইংরুমে।

'কী ব্যাপার বলো তো?' বললেন রেমো ডি'সুজা। 'তোমাদের কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য সাক্ষাৎকার চাই? নাকি অটোগ্রাফ?'

'না, ওসবের জন্য আসিনি আমরা,' জবাব দিল মেয়েটা। 'আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি।'

'আচ্ছা?' ভুরু সামান্য ওপরের দিকে উঠল রেমো সাহেবের।

'আমরা জানি আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। আমরা আপনার কাছে এসেছি একটি ছেলের জীবন বাঁচানোর অনুরোধ নিয়ে।'

'হুম্। তা হলে তো স্বীকার করতেই হয় ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটা কী শুনি?'

'দীপাঞ্জল রডরিক নামে এক নাছোড়বান্দা ছোঁড়ার কথা মনে পড়ে?' বলে উঠল ছেলেটা। সে এতক্ষণ হাঁ করে হরর সিনেমার পোস্টার দেখছিল। এবারে আলোচনায় অংশ নিল। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'না, মনে পড়ছে না,' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করার ভান করলেন রেমো ডি'সুজা।

'আরে ওই ছেলেটা যার ধারণা তার পড়শী একটা ভ্যাম্পায়ার।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' হেসে ফেললেন ডি'সুজা। 'ও তো একটা পাগল।' চেহারায় পিতৃসুলভ উদ্বেগ ফুটিয়ে তুললেন। 'আশা করি ও তোমাদের বন্ধু নয়।'

'এ মেয়ে তার জন্য পাগল,' হাসল ছেলেটা। মেয়েটির গাল লাল হয়ে গেল লজ্জায়, সঙ্গীকে কনুই দিয়ে জোরে খোঁচা দিল। ছেলেটি আর্তনাদ করে উঠল।

'ওকে বাধা দেয়ার জন্য আপনার সাহায্য দরকার, আংকেল। সে সত্যি বিশ্বাস করে তার পড়শী ভ্যাম্পায়ার। সে পড়শীকে হত্যা করার প্ল্যান করছে।'

'কলজের মধ্যে কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে হত্যা করবে,' যোগ করল ছেলেটা।

ওদের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন রেমো ডি'সুজা।

'তোমরা আমার সঙ্গে মশকরা করছ।' মেয়েটি প্রবল বেগে ডান-বামে মাথা নাড়ল। 'মাই গড, ইয়াং লেডি, তোমার বন্ধুর সাইকোলজিস্ট দরকার, ভ্যাম্পায়ার হাণ্টার নয়।'

'প্লিজ, আংকেল,' অনুনয় করল মেয়েটি।

অন্য কেউ রেমো সাহেবকে এভাবে আংকেল ডাকলে তিনি খুবই রেগে যেতেন। কিন্তু এ মেয়েটির আংকেল ডাকটির মধ্যে অদ্ভুত একটা আন্তরিকতা আছে তাই তাঁর রাগ লাগছে না। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারব না, মাই ডিয়ার। আমি খুব ব্যস্ত। ফারুকির একটি ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছি আমি। এজন্য *মধ্যরাতের আতঙ্ক*-র কাজটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি–'

'আপনি ঠাট্টা করছেন!' চেঁচিয়ে বলল ছেলেটা। তাকে খুবই হতাশ দেখাল। তার হতাশ চেহারা খুশি করে তুলল রেমো ডি'সুজাকে।

'সত্যি বলছি। কেন? তুমি কি আমার শো দেখ নাকি?'

'প্রথম দিন থেকে,' দুঃখী দুঃখী গলায় জবাব দিল ছেলেটা।

'ওহ্, মাই গুডনেস,' বললেন ডি'সুজা। 'তা হলে তো তোমাকে একটা অটোগ্রাফ দিতেই হয়, কী বলো?' তিনি টেবিলের স্তূপীকৃত কাগজপত্রের মধ্যে কলম খুঁজতে লাগলেন।

'মি. ডি'সুজা, প্লিজ,' মেয়েটির কণ্ঠ হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণ শোনাল যে তিনি চমকে গিয়ে ওর দিকে তাকালেন।

'আমি আপনাকে ভাড়া করতে চাই,' বলল সে। 'আমি আপনাকে এজন্য টাকা দেব।'

'কত টাকা?' দ্রুত জানতে চাইলেন রেমো ডি'সুজা।

'আপনিই বলুন কত দিতে হবে?'

একটু ভেবে তিনি বললেন, 'চল্লিশ হাজার।'

শুনে মুখ শুকিয়ে গেল মারিয়ার। অস্ফুটে বলল, 'এত টাকা!'

রেমো ডি'সুজা বললেন, 'তোমরা ছোট বলেই এত কম টাকা চাইলাম। নইলে ভ্যাম্পায়ার সংক্রান্ত কোনও কাজে আমি এক লাখের নিচে বিছানা থেকেই নামি না। হুম্!'

মারিয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কিন্তু এত টাকা তো আমরা দিতে পারব না, আংকেল।'

'তা হলে তোমরা আসতে পারো,' রুক্ষ গলায় বললেন রেমো ডি'সুজা। তিনি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হরর হাবলুও উঠল। কিন্তু মারিয়া বসে রইল। সে কী যেন ভাবছে। তারপর রেমো সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, প্লিজ। বসুন। আমি একসঙ্গে আপনাকে এতগুলো টাকা হয়তো দিতে পারব না। অ্যাডভান্স হিসেবে আপাতত বিশ হাজার দেব। বাকিটা কাজ সারার পরে।'

দ্রুত চিন্তা করলেন রেমো। ফাঁকতালে বিশ হাজার টাকাই বা মন্দ কী? এ দিয়ে তিনি তিন মাসের ভাড়া শোধ করতে

পারবেন। বাড়িঅলা তিন মাসের ভাড়া পেলেও কিছুদিন চুপ থাকবে। রেমো বলবেন কয়েক দিনের মধ্যে বাকি টাকা দিয়ে দেবেন। বিশ হাজার টাকায় তিন মাসের বাড়ি ভাড়া দেয়ার পরেও কিছু টাকা বেঁচে যাবে। তা দিয়ে তিনি ক'টা দিন চালিয়ে নিতে পারবেন। একটা চ্যানেলের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হচ্ছে। তারা তাঁকে দিয়ে একটা রিয়েলিটি শো করাতে আগ্রহ দেখিয়েছে। রেমো সাহেব চেষ্টা করবেন কাজটি পেতে।

'তোমাদের বন্ধুটিকে তার ভ্রম থেকে আমরা কীভাবে উদ্ধার করব শুনি?' হাসিমুখে জানতে চাইলেন রেমো ডি'সুজা।

'আমি একটা প্ল্যান করেছি,' বলল হাবলু। 'আমরা ওর পড়শীর বাড়িতে যাব এবং তার ওপরে একটা ভ্যাম্পায়ার টেস্ট করব। আপনার *প্রেতপুরী* সিরিজের মত।'

'ও, আচ্ছা,' ডি'সুজার চেহারা এখন উজ্জ্বল। 'বললে বিশ্বাস করবে না আমার কাছে এখনও প্রপটা রয়ে গেছে।' তিনি তাঁর জ্যাকেটের ভেস্ট পকেট থেকে রুপোর একটি সিগারেট কেস বের করলেন। বোতামে চাপ দিতেই খুলে গেল কেস, ভেতরে সাজানো বেনসনের ফিল্টার চিপস এবং ঢাকনার ভেতরে একটি আয়না।

মারিয়াকে আয়নাটা দেখালেন রেমো ডি'সুজা। 'বেশিরভাগ ভ্যাম্পায়ারের বাড়িতে আয়না থাকে না। আয়নায় যদি তোমার চেহারা দেখা না যায় তা হলে ব্যাপারটা আমার জন্য খুবই অস্বস্তিকর হবে।' খিকখিক হাসলেন তিনি, বোতাম টিপে বন্ধ করলেন সিগারেট কেস। আবার রেখে দিলেন পকেট। ফিরলেন ছেলেটার দিকে। 'আমার যেতে আপত্তি নেই কিন্তু প্রতিবেশী তাঁর বাড়িতে ঢুকতে দেবেন তো?'

হাসল হাবলু। 'আমি সে ব্যবস্থা করছি। উমম...আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করা যায়?'

সাগ্রহে ওকে ফোন ব্যবহার করতে দিলেন রেমো ডি'সুজা। কারণ তাঁর কানে এখনও কোরাস সঙ্গীতের মত বাজছে জাদুর শব্দ তিনটি– *চল্লিশ হাজার টাকা! চল্লিশ হাজার টাকা!*

বাইশ

একসঙ্গে বাজতে শুরু করল সব ক'টা ঘড়ি। গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক, অ্যান্টিক ওয়াল ঘড়ি এবং ডেস্ক মডেল, সবগুলো একত্রে সুরেলা আওয়াজ তুলে বেজে উঠল।

কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা বাজে।

রান্নাঘরের টেবিলে বসে শেষ টোস্টটা চিবুচ্ছে জুলিয়ান গনজালভেজ, চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ট্রের ওপর সুন্দরভাবে ভাঁজ করে রাখল খবরের কাগজখানা। হেড লাইনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে:

বরিশালে আবার খুনীর হামলা

কলেজ ছাত্রীকে জবাই করে হত্যা

জনি ট্রে হাতে নিয়ে সিঙ্কের দিকে রওনা হলো। খুনের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে:

...মেয়েটির নাম ছিল সোনিয়া, সত্যি কলেজে পড়ত সে (অন্তত তাই বলেছিল মেয়েটি), এসব কাজে সে অভ্যস্ত নয়। তবে অনার্সে ভর্তি হতে তার নাকি কিছু টাকা পয়সা দরকার হয়ে পড়েছিল...মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দরী, জনি যখন মেয়েটির মাথায় ব্যাগ গলিয়ে দিয়েছিল, ভরাট বুক জোড়া চাপ খাচ্ছিল নগ্ন বাহুমূলে। তারপর জনি তাকে গড়িয়ে নিয়ে জিপে তোলে...মেয়েটি তখনও বেঁচে ছিল, তবে প্রাণবায়ু যায় যায় অবস্থা, তবে তাতে ওদের কিছু আসে যায়নি। যেখানে লাশ

ফেলার কথা জায়গাটা অনেক দূরে ছিল। তা ছাড়া জনি ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল মেয়েটির গা এবং তারপর...

...তারপর তাকে নিয়ে মজা করেছে ও...

রান্নাঘরে একবার নজর বুলিয়ে নিল জনি। লুসিয়ানো বলেছে কিচেন সবসময় সাফ সুতরো রাখতে। তবে রান্নাঘর মোটামুটি পরিষ্কারই রয়েছে বলা যায়।

ছ'টা দশ মিনিটে বেজে উঠল মোবাইল। তখন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জনি ফোন তুলে বলল, 'হ্যালো?'

এক মুহূর্ত বাদে বেসমেন্টের সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো লুসিয়ানো। দেখলেই বোঝা যায় পূর্ণ বিশ্রাম নেয়া সতেজ একজন মানুষ। তাকে বরাবরের মতই নিখুঁত লাগছে।

'আপনার ফোন,' বলল জনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে রুমে ঢুকল লুসিয়ানো। মেঝের ওপর দিয়ে যেন ভেসে এল। জনি যদিও জানে এটা সম্ভব নয়। আসলে ওরা অমন অবিশ্বাস্য মসৃণ গতিতে হাঁটাচলা করতে পারে। এক মুহূর্তের জন্য প্রভুকে ঈর্ষা হলো তার, পরক্ষণে চিন্তাটা দূর করে দিল মাথা থেকে। তার ভূমিকা ভিন্ন। ওদের মত শক্তি এবং ক্ষমতার অধিকারী কোনওদিনই হতে পারবে না সে।

আর প্রভুর শক্তি তো অতুলনীয়।

তার হাতে মোবাইল তুলে দিল জনি। 'হ্যালো?' লুসিয়ানো উৎফুল্ল ভাব ফোটাল কণ্ঠে। কদম পিছিয়ে গেল জনি, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

প্রভু মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, কোনও বিষয়ে সম্মতি প্রদানের ভঙ্গিতে কথা বলছেন। ত্রিশ সেকেণ্ড এরকম চলল। তারপর লুসিয়ানো কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'আই সী, ইয়েস, অফকোর্স। আমি সবসময়ই তরুণদেরকে সাহায্য করতে

চাই...তোমরা কাল সন্ধ্যায় আসতে পারো। তোমার আর মি. ডি'সুজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমার ভালোই লাগবে...ও হ্যাঁ, ওই ছেলেটা আর তার গার্লফ্রেণ্ডকেও নিয়ে এসো সঙ্গে। ...ওহ্, ওরা তোমার বন্ধু বুঝি?

'হ্যাঁ...সঙ্গে মন্ত্র পড়া পানি নিয়ে এসো। কোনও সমস্যা নেই।'

প্রভুর কথা শুনে মুচকি হাসছে জনি। লুসিয়ানো ইশারায় জনিকে মানা করল হাসতে। কিন্তু দেখে মনে হলো প্রভুর নিজেরও হাসি থামাতে রীতিমত কসরত করতে হচ্ছে।

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...চমৎকার। সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যেই চলে এসো, কেমন?'

...আচ্ছা ভালো কথা, আমার মোবাইল নম্বর পেলে কোথায়? তোমার বন্ধু দিয়েছে?

...না, না, ঠিক আছে। বাই।'

ফোন রেখে দিল লুসিয়ানো, অন্ধকার লিভিংরুমে ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল।

'একটা কথা কি জানো, জনি?' অবশেষে বলল ভ্যাম্পায়ার। 'মাঝে মাঝে মনে হয় ওপরের কেউ একজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন,' সে লম্বা, পাখির থাবার মত একটা আঙুল তুলে ওপরের দিকে ইঙ্গিত করল।

ওরা একসঙ্গে হেসে উঠল, হাসতে লাগল এবং হাসতেই থাকল।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' পরদিন দুপুরে আবার ডি'সুজার বাসায় মারিয়াকে নিয়ে হাজির হলো হরর হাবলু। 'এখন ছোঁড়াটাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেই হয়।'

'সে ব্যবস্থা আমি করব,' ঘোষণার সুরে বলল মারিয়া। রেমো

ডি'সুজার দিকে শীতল চোখে তাকাল। 'আপনার টাকা বুঝে পেয়েছেন তো?' সে নগদ বিশ হাজার টাকার একটা খাম ধরিয়ে দিয়েছে রেমো ডি'সুজার হাতে। টাকাটা জোগাড় করতে ওর জান ছুটে গেছে। নিজের কিছু জমানো ছিল, আগামী ছয় মাসের বেতন এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ফি একসঙ্গে কলেজে জমা দিতে হবে বলে ওর মায়ের কাছ থেকে হাজার আটেক নিয়েছে, বাকিটা বরিশালে ওর এক বড়লোক খালার কাছ থেকে ধার করেছে ওর এক গরীব ক্লাসমেট খুব বিপদে পড়েছে, তাকে অর্থ সাহায্য করতে হবে এই মিথ্যেটা বলে।

'নিশ্চয়,' বললেন ডি'সুজা। তাঁর মনটা খুশি হয়ে আছে ফাঁকতালে বিশ হাজার টাকা পেয়ে গেছেন বলে। কিন্তু তাঁর ধারণাতেও নেই কী ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

তেইশ

'রাত আটটা বাজে,' বলল দীপ। 'উনি তোমাদেরকে বলেছেন সাড়ে সাতটার মধ্যে চলে আসবেন, তাই না? তা হলে এখনও আসছেন না কেন?'

'উনি যখন বলেছেন আসবেন, আসবেন,' বলল হরর হাবলু। জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল। 'মারিয়া টাকা দিয়েছে। না এসে যাবে কোথায়, বাছাধন?'

মারিয়া লাথি কষাল হাবলুর পায়ে। দীপ অবশ্য ওদিকে ফিরেও তাকাল না। সে ডুবে আছে নিজের চিন্তায়।

'উনি আসবেন,' বয়ফ্রেণ্ডের কাঁধ আলতো হাতে স্পর্শ করল মারিয়া। 'না আসার কোনও কারণ নেই। হয়তো কোনও

ঝামেলায় আটকে গেছেন বলে দেরি হচ্ছে।'

দীপ সন্দেহের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল নড়বড়ে ভক্সওয়াগনকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে। 'উনি এসে পড়েছেন!' চেঁচিয়ে উঠল ও, ছুটে গেল গাড়ির দিকে। মারিয়া এবং হাবলু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওর পিছু নিল।

'ওটা ওঁর গাড়ি!' রেমো ডি'সুজার ভাঙাচোরা গাড়ি দেখে ভয়ানক হতাশ হরর হাবলু। সে কল্পনাও করেনি জনপ্রিয় একটি শো'র অভিনেতা এমন মান্ধাতা আমলের গাড়ি চালান।

ভক্সওয়াগন কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে পড়ল। খুশির চোটে লম্ফঝম্প শুরু হয়ে গেছে দীপের। বারবার বলছে, 'মি. ডি'সুজা, আপনি সত্যি আসবেন কল্পনাও করিনি।' গতকাল রাতটা ওর খুব ভয়ে কেটেছে। তবে যে কোনও কারণেই হোক ওর ওপর আর হামলা করেনি ভ্যাম্পায়ার। আজকেও সারাদিন ঘর থেকে বেরোয়নি দীপ। কিন্তু মারিয়া যখন নিশ্চিত করল ডি'সুজা আসবেন তখন...

রেমো ডি'সুজা নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ভ্যাম্পায়ার শিকারীর সেই বিখ্যাত সাজে সেজে এসেছেন: ভিক্টোরিয়ান হ্যারিস ট্যুইড সুট, পূর্ণতা পেয়েছে ম্যাকিনটশ এবং ক্যাপসহ। দীপের বাড়ানো হাতটা আন্তরিকতার সঙ্গে চেপে ধরলেন তিনি। 'গতকালের ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, দীপ। তোমাকে বললে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে এরকম আবদার রক্ষা করার অনুরোধ হামেশাই পেয়ে থাকি আমি। আর সেসব আবদার প্রায় সবই ভুয়া, তোমারটার মত নিখুঁত ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই একটিরও। আর হ্যাঁ, আমাকে আংকেল বলে ডেকো। তোমার বান্ধবীটির আংকেল ডাকটি খুব পছন্দ হয়েছে আমার।' তিনি মারিয়ার দিকে তাকালেন। হাসল মারিয়া।

'তবে তোমার বন্ধুরা যখন তোমার দুর্দশার কথা আমার কাছে

সবিস্তারে বর্ণনা করল, বুঝতে পারলাম আমার আসলে কী করা উচিত। তো,' খটাশ করে দু'পায়ের গোড়ালি একত্র করলেন তিনি, কুর্নিশের ভঙ্গিতে যোগ করলেন, 'গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলার রেমো ডি'সুজা তোমার সেবায় নিয়োজিত।

'এখন কাজের কথায় আসা যাক। নিশাচর এই সন্দেহভাজন প্রাণীটির আবাস কোথায়?'

ভীত ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলে দেখাল দীপ, 'ওই যে ওখানে।'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে একশ' গজ দূরের ভুতুড়ে চেহারার বাড়িটি পরখ করলেন রেমো ডি'সুজা। 'হুম্। তুমি যা সন্দেহ করছ সেরকম কিছু একটা ওখানে বাস করতেও পারে।'

গাড়ির কাছে গেলেন তিনি, চামড়ার ছোট একটা বটুয়া তুলে নিলেন। গাড়ির হুডের ওপরে বটুয়া রেখে খুলে ফেললেন। বের করে আনলেন স্বচ্ছ তরল বোঝাই ক্রিস্টালের একটি শিশি। বটুয়া যথাস্থানে রেখে ওদের দিকে ফিরলেন তিনি। কাঁধ উঁচু করে বললেন, 'এখন কি আমরা রওনা হব?'

হরর হাবলু বলল, 'আপনার গোঁজ [illegible] তুড়ি কই?'

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে হাবলুর আপাদমস্তক দেখলেন ডি'সুজা। 'ওগুলো গাড়িতে।'

'ওগুলো ছাড়া যাওয়া যাবে না।' আতঙ্কিত দীপ। 'ওগুলো ছাড়া যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা।'

'সে সত্যি ভ্যাম্পায়ার কি না নিশ্চিত না হয়ে তো তাকে হত্যা করতে পারি না, দীপ।'

'কিন্তু আমি জানি সে ভ্যাম্পায়ার।'

'কিন্তু আমি জানি না!' ডি'সুজা দীপের দিকে স্নেহমাখা চোখে তাকালেন। 'আমার ওপর ভরসা রাখো, দীপ। এসব কাজ বহুদিন ধরে করে আসছি আমি। আমি আমাদের কারও জীবন বিপন্ন হতে

দেব না।'

মি. রেমো ডি'সুজা স্ফটিকের শিশিটা গাড়ির হেড লাইটের আলোয় তুলে ধরলেন। 'এর মধ্যে রয়েছে হলি ওয়াটার। মন্ত্রপূত পবিত্র পানি। এ পানি স্পর্শ করামাত্র ও লোকের হাতে ফোস্কা পড়ে যাবে। আমি তাকে বলব পানিটা গিলে খেতে।'

'সে পানি খেতে মোটেই রাজি হবে না! সে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে!' গুঙিয়ে উঠল দীপ। তাকাল বাকি তিনজনের দিকে।

হরর হাবলু বলল, 'সে এ পানি খেতে রাজি হয়ে গেছে, গর্দভ।'

দীপ তাকাল রেমো ডি'সুজার দিকে। 'রাজি হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকালেন ডি'সুজা। 'হ্যাঁ, আমরা কি এখন রওনা হতে পারি?'

দোটানায় ভুগছে দীপ। 'কিন্তু...' বিড়বিড় করল। চেপে ধরল ডি'সুজার হাত।

মারিয়া বলল, 'আংকেল, দীপের কথা যদি সত্যি হয় এবং আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন ওই লোক ভ্যাম্পায়ার, তা হলে কি আমাদের বিপদ হওয়ার আশঙ্কা আছে?'

'একদমই নেই, মাই ডিয়ার। ভ্যাম্পায়াররা খুব ধূর্ত স্বভাবের হয়, আর আমাদেরকে সে হত্যা করবে না। কারণ এতগুলো লাশ লুকিয়ে রাখবে কোথায়?' দীপের দিকে ফিরলেন তিনি। 'না, আজ রাতে আমাদের বিপদের আশঙ্কা শূন্য। আর দিনের বেলা এসে তাকে হত্যা করার সুযোগ তো রয়েই গেল।'

'তা ছাড়া,' চোখ টিপলেন তিনি, 'অবসরপ্রাপ্ত হলেও আমি হলাম গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলার রেমো ডি'সুজা। আমাকে সহজে ঘাঁটানোর সাহস পাবে না কোনও ভ্যাম্পায়ার।'

তিনি লম্বা পা ফেলে এগুতে লাগলেন। দীপ তাকাল মারিয়ার

দিকে। মারিয়া চাইল হরর হাবলুর দিকে। হাসল হাবলু।

‘এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়...’

অন্ধকারের চাদরে মোড়া কিং স্ট্রিট ধরে ওরা একসঙ্গে পা বাড়াল ভ্যাম্পায়ারের বাড়িতে।

চব্বিশ

রেমো ডি’সুজার হাত দরজার কড়ায় পৌঁছার আগেই ক্যাঁআআচ শব্দে খুলে গেল ভারী সেগুন কাঠের দরজা। তিনি একটু চমকে গেলেন, তাঁর সঙ্গে হাবলু এবং মারিয়াও। আর দীপের তো হার্ট অ্যাটাক হবার জোগাড়। দরজার পেছন থেকে ভেজা স্পঞ্জ হাতে জুলিয়ান গনজালভেজকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চওড়া হাসি ফুটল জনির মুখে, স্পঞ্জটা একটা ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে জিনসের প্যান্টে হাতটা মুছে নিল।

‘আশা করি আপনাদেরকে চমকে দিইনি।’ ঝুড়ির দিকে ইঙ্গিত করল। ‘আপনাদের আসতে দেরি দেখে ঘরদোর পরিষ্কার করছিলাম। আমি জুলিয়ান গনজালভেজ’ আন্তরিকতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল সে। ‘আপনি নিশ্চয়...’

‘রেমো ডি’সুজা। ভ্যাম্পা–’ দ্রুত ব্রেক কষলেন। ‘আমি রেমো ডি’সুজা। অভিনেতা। ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। সরি।’

‘না, না, ঠিক আছে। মি. ডি’সুজা, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। লুসিয়ানো আপনার কথা বলেছে আমাকে।’ উদার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। ‘প্লিজ, আপনারা সবাই ভেতরে আসুন।’

পিছিয়ে দাঁড়াল জনি, ওরা ঘরে ঢুকল। দীপ এমন সতর্কভাবে পা ফেলছে আর ইতিউতি তাকাচ্ছে যেন কেউ হাউ করে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে বিব্রত বোধ করল মারিয়া।

বিশাল হলঘরে ওদেরকে নিয়ে এল জনি। সাদা-কালো চেককাটা টাইলসের মেঝে। সামনে প্রকাণ্ড সিঁড়ি। ওদের বামে ফ্রন্ট পার্লার। দেয়াল ভর্তি ঘড়িগুলো নানান সুরে বেজে চলেছে। অবিকল বিদেশী সিনেমায় দেখা বাড়ির মত।

'ঘরদোর এখনও গুছিয়ে উঠতে পারিনি,' কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল জনি। 'মাত্র তো এলাম।' সিঁড়ির দিকে ফিরে হাঁক ছাড়ল। 'অ্যাই, লুসিয়ানো! বাড়িতে মেহমান এসেছে।'

মগ্ন নীরবতার মাঝে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। পেরিয়ে গেল অনেকগুলো সেকেণ্ড।

'উনি বোধহয় আপনার কথা শুনতে পাননি,' বললেন রেমো ডি'সুজা। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছেন। মেয়েটার টাকাটা আসলে নেয়া উচিত হয়নি। নিজেকে বেকুব মনে হচ্ছে তাঁর। নির্বোধের মত একটা হাস্যকর খেলায় অংশ নিয়েছেন তিনি। গোল্লায় যাক ওই ছোকরা আর তার সুইট হার্ট। তাঁর একটা সম্মান আছে। আগামীতে তিনি জন্মদিনের পার্টিতে হোস্টের দায়িত্ব পালন করতে যেতে রাজি আছেন কিন্তু এসব কাজে আর নয়।

জনি গনজালভেজ মুখে লণ্ঠনের আলোর হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আরে না, ও ঠিকই শুনেছে আমার কথা!'

অন্ধকার সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ বেয়ে নেমে আসছে লুসিয়ানো মানুচ্চি। চেহারায় ফুটিয়ে রেখেছে হাসিখুশি ভাব। তার গোটা অবয়ব থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আভিজাত্য। তার পায়ের জুতো হাতে গড়া এবং অত্যন্ত দামী, পরনের পোশাক (উলের সোয়েটার এবং স্ল্যাক্স কম্বো) ক্যাজুয়াল হলেও চোখে পড়ার মত। তার

আচরণে রয়েছে উচ্ছ্বাস, যেন কোনও দুশ্চিন্তার সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে। তবে তার সদাশয় চেহারা দীপকে করে তুলল ভীত এবং মুগ্ধ করল মারিয়াকে।

সবার চোখ লুসিয়ানোর ওপর, সে সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এসেছে। মুখে রহস্যময় হাসি এনে রেমো ডি'সুজার দিকে ফিরল সে। 'আহ্, মি. ডি'সুজা, আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি। আপনার সবগুলো ছবি আমি দেখেছি এবং আমার কাছে দারুণ লেগেছে।' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

তার সঙ্গে হাত মেলালেন রেমো ডি'সুজা, হতবিহ্বল চেহারা। জীবনে এই প্রথম এ বয়সী কেউ তাঁকে বলল সে তাঁর সবগুলো ছবি দেখেছে এবং ভালোও লেগেছে। 'আ, ইয়ে ধন্যবাদ...' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'...আর এই অপূর্ব তরুণী এবং তার সঙ্গীটি কে?'

হাসলেন ডি'সুজা। 'এ হলো হাবলু হালদার আর ও মারিয়া রোজারিও।'

লুসিয়ানো মাথা নিচু করে মারিয়ার হাতে চুম্বন করল। 'সুন্দরীতমা,' সুর করে বলল সে। লজ্জায় সাথে সাথে লাল মারিয়া। লুসিয়ানো মুখ তুলে চাইল দীপের দিকে, চোখ টিপল ঠোঁটে দুষ্টু হাসি ফুটিয়ে। 'একজন ভ্যাম্পায়ারের তো এরকমই করার কথা, তাই না, দীপ?'

গোটা ঘর বিস্ফোরিত হলো হাসিতে। মারিয়াও না হেসে পারল না। দীপের গা জ্বলে গেল রাগে। সে কটমট করে তাকিয়ে রইল লুসিয়ানোর দিকে। কিছু বলল না।

লুসিয়ানো হাসিমুখে ফ্রন্ট পার্লারের দিকে ইঙ্গিত করল। 'প্লিজ, আসুন। আরাম করুন।' ডি'সুজাকে নিয়ে সে লিভিংরুমে ঢুকল। পেছন পেছন জনি। হাসছে। ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল মারিয়া এবং হাবলু।

'গড, লোকটা কী হ্যাণ্ডসাম!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মারিয়া। দীপের কথা বেমালুম ভুলে হাওয়ায় ভেসে যেন লিভিংরুমে ঢুকে পড়ল ও। হরর হাবলু বিতৃষ্ণা নিয়ে দেখল দীপকে।

'ওই লোক ভ্যাম্পায়ার, দীপ?' ঠোঁট ওল্টাল সে। তারপর যোগ দিতে চলল অন্যদের সঙ্গে।

দীপের কাছে যদি এ মুহূর্তে একটা বোমা থাকত ও সেটা নির্ঘাত এখানে ফাটিয়ে দিত। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে ইচ্ছে করছে ওর। ওরা সবাই ভ্যাম্পায়ারটার দলে ভিড়ে যাচ্ছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে দীপ। হেরে যাচ্ছে সে। কিন্তু ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিল। ভ্যাম্পায়ারটাকে অসতর্ক কোনও মুহূর্তে পেলেই হলো, তার মুখোশটা চট করে খুলে দেবে দীপ।

পার্লারে ঢুকল ও। চেহারা প্যাঁচার মত করে রেখেছে। তবে কেউ ওর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল না। ওরা লুসিয়ানোর সঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে কথা বলছে।

পার্লারটি প্রশস্ত, হাওয়ার প্রাচুর্যও রয়েছে। তবে এর মেঝেতে ডাঁই করে রাখা বাক্স এবং কার্টন। সবগুলো ভারী কাপড় দিয়ে মোড়ানো। লুসিয়ানো বাক্সগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল, 'অগোছালো ঘর দেখে কিছু মনে করবেন না। আমরা এখনও গুছিয়ে উঠতে পারিনি।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন রেমো ডি'সুজা। লুসিয়ানোর মিষ্টি মিষ্টি কথা মোটেই সহ্য হচ্ছিল না দীপের। সে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল, 'আপনার কফিনটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? নাকি কফিন একটা নয় অনেকগুলো?'

'দীপ...' দাঁত কিড়মিড় করলেন ডি'সুজা, ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করছেন।

অবিচলিত রইল লুসিয়ানো। 'ইট'স অলরাইট, মি. ডি'সুজা। আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন আমি অ্যান্টিকের পূজারী।' ঘরের চারপাশে হাত নেড়ে দেখাল। 'সত্যি বলতে কী, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর রসকষহীন চাকরির চেয়ে অ্যান্টিক সংগ্রহ করেই আমি বেশি মজা পাই। তেমন সমঝদার খদ্দের পেলে দু'একটা বিক্রি করি। ভালোই পয়সা পাওয়া যায়।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'যে "কফিন" নিয়ে এত কিছু হৈ চৈ ওটা আসলে ষোড়শ শতকের একটি বাভারিয়ান সিন্দুক। ওই জিনিসটাই আমাকে আর জনিকে বহন করতে দেখেছে দীপ।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল জনি। 'লুসিয়ানো অ্যান্টিক খুঁজে বের করে, আমি ওগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করি। আমরা দু'জনে পার্টনার।'

'মিথ্যা কথা,' বলল দীপ। 'ডাহা মিথ্যা কথা। ওটা সিন্দুক নয়, কফিন ছিল! আর এ তোমার পার্টনার নয়, তোমার প্রভু। তুমি এ লোকের চাকর। আমি তোমাকে দেখেছি হাঁটু গেড়ে–'

'দীপ!' হুংকার ছাড়লেন ডি'সুজা। *আমার ধারণাই ঠিক এ ছোকরা আসলেই পাগল।*

'ঠিক আছে, মি. ডি'সুজা,' বলল লুসিয়ানো। 'এসব এখন আর আমাকে স্পর্শ করে না। আপনারা জানেন কি না জানি না, দীপ আমার বাসায় পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছিল। রহস্যময় ঘটনাগুলো ঘটছে বরিশালে অথচ সে কি না আমাকে সন্দেহ করছে।'

চোখ কুঁচকে গেল রেমো ডি'সুজার। যথেষ্ট হয়েছে। এবারে এ দৃশ্যপট থেকে তিনি বিদায় নেবেন। ছোকরা তার মা কিংবা মনোবিজ্ঞানী যে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারত। তাই বলে পুলিশ?

সবাই ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দীপের দিকে। 'কিন্তু তোমাদের মত পুলিশও আমার কথা বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করবে

কেন? প্রমাণ পেলে তো! এ লোক এ শহরে বসে খুন করে লাশ ফেলে আসে বরিশালে যাতে কেউ তাকে সন্দেহ করতে না পারে। ভয়ানক ধড়িবাজ!' মারিয়ার দিকে তাকাল সে, তারপর দৃষ্টি ঘুরে গেল ডি'সুজার দিকে, 'কিন্তু আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন, আংকেল। ওকে হলি ওয়াটার খেতে দিন।'

'দীপ, তুমি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছ,' দাঁতে দাঁত ঘষলেন মি. ডি'সুজা যদিও মুখটা রাখলেন হাসি হাসি।

'না, মি. ডি'সুজা, ও যা বলছে করুন। আমাকে হলি ওয়াটার খাইয়ে দিন। কোথায় সেই মন্ত্র পড়া পানি?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রিস্টালের শিশিটি বের করলেন রেমো সাহেব। ঝিকিয়ে উঠল হাবলুর চোখ। 'আপনি কি নিশ্চিত এটা হলি ওয়াটার, আংকেল?'

হাসলেন ডি'সুজা, আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন।

'একশ' বার। আমার গুপ্তভাণ্ডার থেকে এ জিনিস নিয়ে এসেছি। সেইন্ট মেরী চার্চের ফাদার স্বয়ং এ পানি পড়ে দিয়েছেন।' তিনি শিশিটি তুলে দিলেন লুসিয়ানোর হাতে।

লুসিয়ানো ডি'সুজার চোখে কী যেন খুঁজছে। বুড়োটা বোধহয় পাগলাটে গোছের। এটা কি সত্যি মন্ত্র পড়া পানি? যদি তা-ই হয়, এ পানি ঠোঁটে ছোঁয়ানো মাত্র প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আগুন ধরে যাবে লুসিয়ানোর শরীরে।

শিশির ছিপি খুলল সে, গন্ধ শুঁকল। সবগুলো চোখ আঠার মত লেগে রয়েছে তার গায়ে। জনি নিঃশব্দে পিছিয়ে গেল, আটকে দাঁড়াল পোর্টিকোর দরজা। প্রচণ্ড একটা শঙ্কা যেন নিরেট কাঠামো হয়ে বিরাজ করছে ঘরে, বাতাস স্থির দারুণ টেনশনে।

দীপ এগিয়ে গেল মারিয়ার দিকে, একই সঙ্গে পকেট থেকে বের করে আনল ক্রুশ। 'দৌড়াবার জন্য রেডি থাকো,' ফিসফিস করল সে। 'আমি এটা দিয়ে তোমাকে রক্ষা করব।'

হাসল লুসিয়ানো. কাঁধ ঝাঁকিয়ে শিশি উপুড় করে ধরল মুখে। এক ঢোকে গিলে ফেলল ভেতরের তরলটুকু। চোখ টিপল সে। বো করল।

তারপর নরক ভেঙে পড়ল ঘরে।

পঁচিশ

অত্যন্ত দ্রুত ঘটল ঘটনা। অকস্মাৎ ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল লুসিয়ানো, হাঁপানি রোগীর মত ঘরঘর শব্দ বেরুচ্ছে মুখ থেকে। মারিয়া, রেমো ডি'সুজা এবং হাবলু ছুট দিল। দীপ বিজয় উল্লাসে ক্রুশটা মাথার ওপর এক পাক ঘুরিয়ে নিল। সে কিছু বলার আগেই সবল একটি মুঠো চেপে ধরল তার হাত এবং পরক্ষণে এক চাপে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল সস্তা ক্রুশ। কে ক্রুশ ভেঙেছে দেখতে ঘুরল দীপ। জনি। হাসিমুখে ডানে-বামে মাথা নাড়ছে।

লুসিয়ানো হো হো করে হাসতে হাসতে সিধে হলো। তার মেহমানরা বিস্মিত, বিভ্রান্ত এবং একই সঙ্গে স্বস্তিও ফিরে এসেছে তাদের মাঝে। জনি হাসতে হাসতে দীপের পিঠে চাপড়ে দিল।

'হলি ওয়াটার পেটে গেলে ভ্যাম্পায়াররা তো এরকমই করত, তাই না, দীপ?' বলল লুসিয়ানো।

রেমো ডি'সুজা ফিরলেন দীপের দিকে, লুসিয়ানো তাঁকে বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে বলে লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছেন। 'নিজের চোখেই তো দেখলে, দীপ। এখন বুঝতে পারছ তো যে মি. মানুচ্চি ভ্যাম্পায়ার নন?'

বিস্ফোরিত হলো দীপ, 'এটা চাতুরী! এ স্রেফ চাতুরী।

পানিটা ঠিকমত মন্ত্র পড়া হয়নি কিংবা ওটা আদৌ হলি ওয়াটার ছিল না।'

'তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলছ, ছোকরা?' রাগে গরগর করে উঠলেন রেমো ডি'সুজা। 'ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে যে তুমি কত বড় একটা নির্বোধ। তোমার ভুলের কোনও ক্ষমা নেই।'

'হ্যাঁ, দীপ,' বলল লুসিয়ানো। 'তোমার কারণে তোমার বন্ধুদের খুব পেরেশানি হলো। নিশ্চয় চাও না তোমার জন্য ওরা আরও বিব্রত হোক?'

মুখ নিচু করল দীপ। মনে মনে বলল *হারামজাদা আমাকে বাগে পেয়ে একহাত নিচ্ছে। আমার কথা ওরা আর বিশ্বাস করবে না।*

'না, চাই না,' পরাজিত কণ্ঠে বলল ও।

'চমৎকার,' হাসল লুসিয়ানো। ঘরে আর সেই টেনশনের আবহটা নেই। 'আমি খুশি এজন্য যে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে।' দু'হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে সে ওদেরকে দরজা অভিমুখে নিয়ে চলল।

দোরগোড়ায় পৌঁছে লুসিয়ানো ঘুরল মারিয়া এবং হাবলুর দিকে। রেমো সাহেব পকেটে হাত ঢোকালেন সিগারেট বের করার জন্য, এ মুহূর্তে বেশ হালকা লাগছে নিজেকে।

'তোমাদের দু'জনের সঙ্গে কথা বলে বেশ লাগল,' বলল লুসিয়ানো। 'তোমাদের জন্য আমার বাড়ির দ্বার উন্মুক্ত।' মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো পরের কথাটা। সামান্য জ্বলে উঠল চোখ। 'তুমি কিন্তু অবশ্যই আমার বাড়িতে বেড়াতে আসবে।'

এক মুহূর্তের জন্য মারিয়ার চোখে ছায়া ঘনাল।

'ধন্যবাদ,' বলল মারিয়া। কেমন ফাঁকা চাউনি তার চোখে। 'নিশ্চয় আসব, স্যর...'

'প্লিজ, আমাকে শুধু লুসিয়ানো বলে ডাকবে।' সে ফিরল হাবলুর দিকে। 'আর তুমি...'

রেমো ডি'সুজা তাঁর সিগারেট কেসের ভেতরের আয়নায় টোকা দিলেন সিগারেট বের করার জন্য। খানিকটা তামাক ছড়িয়ে পড়ল আয়নায়। ফুঁ দিয়ে তামাক উড়িয়ে দিতে সামান্য সামনে ঝুঁকলেন তিনি।

এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিরায় জমাট বেঁধে গেল রক্ত।

যা দেখছেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ওরা ওখানে আছে: দীপ, প্যাঁচার মত গম্ভীর করে রেখেছে মুখ এবং অধৈর্য; মারিয়ার স্বপ্নালু দৃষ্টি শূন্যে...

এবং হাবলু, বাতাসের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছে।

মুখ তুলে চাইলেন ডি'সুজা। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে লুসিয়ানো, সমস্ত অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আভিজাত্য।

আয়নায় তাকালেন তিনি। দেখা যাচ্ছে না লুসিয়ানোকে।

পেছন ফিরে তাকালেন। ওই তো লুসিয়ানো।

আয়নায় তাকালেন। অদৃশ্য লুসিয়ানো।

সর্বনাশ!

রেমো ডি'সুজা, গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলার, ভয়ে নীল হয়ে গেলেন। তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল সিগারেট কেস, ঠুন্ শব্দে ভাঙল কাচ। হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি, পাঁজরের গায়ে দ্রিম দ্রিম বাড়ি খাচ্ছে কলজে, ভাঙা কাচগুলো দ্রুত তুলে নিতে লাগলেন।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তাঁর দিকে। কেউ সিগারেট কেস দেখার আগেই ওটা তুলে নিয়ে পকেটে চালান করে দিলেন ডি'সুজা।

'কোনও সমস্যা, মি. ডি'সুজা?' মিষ্টি গলায় জানতে চাইল লুসিয়ানো।

'না, না। হঠাৎ মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল,' বিড়বিড় করলেন ডি'সুজা। আশা করলেন তাঁর শরীরের কাঁপুনি কেউ লক্ষ করছে না। 'মারিয়া, হাবলু, দীপ, অনেক সময় নষ্ট হলো। এবারে চলো।'

লুসিয়ানো দেখল বুড়ো তড়িঘড়ি পা বাড়িয়েছেন দরজায়। মুখ ছাইয়ের মত সাদা, কাঁপছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত লাগছে তাঁকে। লোকটার না হার্ট অ্যাটাক ফ্যাটাক হয়ে যায়, ভাবল লুসিয়ানো। ডি'সুজা সাহেব ফিরলেন ওর দিকে। বিস্ফারিত চোখ, আড়ষ্ট হাসি।

'আরও একবার ধন্যবাদ, মি. লুসিয়ানো এবং মি. গনজালভেজ।'

ওরা জবাবে বিনীত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল।

রেমো ডি'সুজা দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি যেন ছিটকে গেলেন দরজার ওপাশে। তাঁকে অনুসরণ করল তাঁর সঙ্গীরা। দীপ শেষবারের মত ঘৃণাভরে ঘরের চারপাশটা একবার দেখে নিল। জনি ঠোঁটে মৃদু হাসি ধরে রেখে ওর পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

'ব্রাভো,' বলল সে, 'দারুণ দেখিয়েছেন।'

লুসিয়ানো হলঘর ধরে যাচ্ছে, চোখে কী একটা ঝিক করে উঠতে দাঁড়িয়ে গেল। চকচকে একটা জিনিস। মাটি থেকে ওটা তুলে নিল সে, জনির দিকে বাড়িয়ে ধরল ওকে দেখতে দেয়ার জন্য। ভাঙা এক টুকরো কাচ। আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। আঁধার ঘনাল লুসিয়ানোর চোখে।

'না, দেখাতে পারিনি,' ঘোষণার সুরে বলল সে।

রেকর্ড করার গতিতে নিজের গাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দিয়েছেন রেমো ডি'সুজা। দৌড় দেয়াটা অশোভন দেখাবে বলে সরু সরু ঠ্যাঙে যতটা দ্রুত পা ফেলা সম্ভব, সেই স্পিডে হাঁটছেন।

রেমো সাহেবের আচরণ বিমূঢ় করে তুলেছে দীপকে।

লুসিয়ানোর মত সে-ও ভাবল যেভাবে ছুটছেন বুড়ো, এর তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। 'আপনার কী হয়েছে?' তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেল দীপ। হাবলু এবং মারিয়া অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে অত জোরে হাঁটতে না পেরে।

'কিছু হয়নি। আমাকে বিরক্ত কোরো না।' ডি'সুজা নিজের গাড়িতে পৌঁছে গেলেন, হেলান দিলেন দরজায়, চাবি খুঁজছেন। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

'কিছু হয়নি তো আপনার হাত কাঁপছে কেন?'

'কাঁপছে না। বললাম না আমাকে একটু একা থাকতে দাও।' হাত থেকে ঝপাং করে পড়ে গেল চাবির গোছা।

'ওখানে কিছু একটা দেখেছেন আপনি, তাই না?' অনুযোগের সুরে বলল দীপ। বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

ডি'সুজা জ্বলন্ত চোখে তাকালেন দীপের দিকে। 'আমি কিছু দেখিনি,' বললেন তিনি। 'কিছু না।' মাটি থেকে চাবি তুলে নিয়ে স্লটে ঢোকালেন, খুলে গেল তালা, এক ঝটকায় দরজা খুলে হুইলের পেছনে পিছলে গিয়ে বসলেন।

'অবশ্যই আপনি কিছু দেখেছেন,' বলল দীপ। 'আপনি এমন কিছু দেখেছেন যাতে বুঝতে পেরেছেন ও একটা ভ্যাম্পায়ার, ঠিক না?'

'না!' ডি'সুজা গাড়িতে গিয়ার দিলেন, চাপ দিলেন ক্লাচে।

'দেখেননি?'

'ভাগো!'

রাস্তায় ঘুরন্ত টায়ার বিশ্রী শব্দ তুলল, বিখ্যাত ভ্যাম্পায়ার

কিলার রেমো ডি'সুজা ইঞ্জিনের আওয়াজ তুলে হারিয়ে গেলেন রাতের আঁধারে।

সেদিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল দীপ।

ছাব্বিশ

দীপ বড্ড ঘাবড়ে গেছে, ভাবছে মারিয়া। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসা তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। দীপের এখনও বদ্ধমূল ধারণা লুসিয়ানো মানুচ্চি একটা ভ্যাম্পায়ার। হরর হাবলুর সঙ্গে এ নিয়ে তার এক চোট তর্ক হয়ে গেছে। রিক্সা না পেয়ে ওরা পদব্রজেই রওনা হয়েছে। মারিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তবে গত পনেরো মিনিট ধরে ভ্যাম্পায়ার বিষয়টা নিয়ে দু'জনের মধ্যে চলছে তীব্র বাদানুবাদ।

দীপের কথা যদি সত্যি হয়? হাঁটতে হাঁটতে ভাবল মারিয়া। তবে ভাবনাটা হাসির উদ্রেক করল না। লুসিয়ানো যখন ওর দিকে তাকিয়েছিল তখন কী রকম যেন একটা অনুভূতি হয়েছিল। অদ্ভুত একটা কিছু আছে ওই লোকটার চাউনিতে।

অদ্ভুত হলেও মন্দ নয়।

ওরা আধ মাইলখানেক রাস্তা পাড়ি দিয়েছে, দ্রুত পদক্ষেপে চলেছে মন্দির রোডের দিকে। ওখানেই মারিয়ার বাসা। ওদের সামনে অন্ধকার একটা গলি। হরর হাবলুর কাজই হলো গলি-ঘুপচির মধ্যে সেঁধুনো। সে বলল, 'চলো, এ রাস্তা দিয়ে শর্টকাট মেরে দিই।'

'উঁহুঁ, যাওয়া যাবে না। আমরা বরং মানুষজন এবং আলোর মধ্যে নিরাপদ থাকব!' বলল দীপ।

‘তোমরা গেলে যাবে না গেলে নাই,’ বলল হাবলু। ‘আমি গেলাম।’ সে অন্ধকার গলিমুখে পা বাড়াল।

‘হাবলু, প্লিজ,’ অনুনয় করল দীপ। ‘যেয়ো না।’

‘ভাগো তো! মারিয়া, আমি দুঃখিত, তোমার বয়ফ্রেণ্ডটা আসলে একটা পাগল। সারাক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। এর সঙ্গে চলাফেরা করাই মুশকিল।’ সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মারিয়ার হাত ধরল দীপ। ‘ওর কথা বাদ দাও। ওকে লুসিয়ানোর দরকার নেই। বড়জোর ওর রক্ত দূষিত করবে, এর বেশি কিছু নয়।’

এমন সময় ভেসে এল ভয়াবহ চিৎকার।

ভয়ঙ্কর চিৎকারে মারিয়ার শরীরের সবগুলো লোম খাড়া হয়ে গেল। মনে হলো ১১০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে। ও ভয়ের চোটে দীপের কাঁধ চেপে ধরল।

আবার শোনা গেল চিৎকার। এবারে আগের চেয়ে জোরাল এবং আরও বিকট। যেন কাউকে জবাই করা হচ্ছে, কাটা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘরঘরে মৃত্যু-চিৎকার। হরর হাবলু–নিশ্চয় হাবলু বিপদে পড়েছে...

গলির দিকে ছুটতে লাগল ওরা, পেভমেন্টে জুতোর শব্দ উঠল। গলির মাঝামাঝি এসেছে, রাস্তায় একটা আবর্জনার ড্রাম চোখে পড়ল। উল্টে আছে। ভেতরের নোংরা ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়।

ওটার পেছনে, দেয়ালের নিচে দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে একটি ছায়ামূর্তি, নড়াচড়া করছে না। মারিয়া খামচে ধরল দীপের হাত, ওকে থামিয়ে দিল, কাঁপা একটা আঙুল তুলে ছায়াটাকে দেখাচ্ছে।

‘ওহ, গড,’ ফিসফিস করল দীপ। ‘ওহ, গড, হাবলু, না...’

শরীরটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল ওরা। স্থির হাবলু। শ্বাস

নিচ্ছে না। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মারিয়ার। মাথাটা কেমন ফাঁকাফাঁকা ঠেকছে, ঘোলাটে চারপাশ।

এ হতে পারে না, এ হতে পারে না, ওর ভেতর থেকে কে যেন বলছে। দীপ হাত বাড়িয়ে ওটার কাঁধ স্পর্শ করল...

...আর তখন ঝট করে ঘুরে গেল ওটা, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল জান্তব হুংকার, থাবা মারল দীপের গলা লক্ষ্য করে।

প্রাণঘাতী আর্তনাদ করে এক লাফে পিছিয়ে এল মারিয়া। দীপও চিৎকার দিল, পিছু হঠতে গিয়ে কীসে যেন পা বেধে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। লাশটা ঝাঁপ দিল দীপের গায়ে, ওর গলার শিরা চেপে ধরল, 'আররররর!' গর্জন ছাড়ল ওটা। 'এবার তোমাকে পেয়েছি!'

পরক্ষণে একটা গড়ান দিয়ে দীপের পাশে শুয়ে পড়ল ওটা, অট্টহাসি দিল। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'কী?' কিচকিচ করে উঠল মারিয়া। আবার বলার চেষ্টা করল, 'কী?' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। ভয়ের চোটে রা হারিয়ে ফেলেছে ও।

দীপ ততক্ষণে সিধে হয়েছে। চিৎকার করছে। 'হারামজাদা! শালা হারামী!' ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে গালিগালাজ করে চলল সে। হরর হাবলু তখনও ফুটপাতের ওপর গড়িয়ে চলেছে, গলা দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ করছে, হাঁসফাঁস করছে বাতাসের জন্য।

হাসতে শুরু করল মারিয়া।

'এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়!' গর্জে উঠল দীপ।

'তুমি...তুমি আয়নায় যদি নিজের মুখটা একবার দেখতে,' হি হি হা হা হাসির মাঝ দিয়ে স্থির হলো হরর হাবলু।

'তোমাকে দেখাচ্ছিল...তোমাকে দেখাচ্ছিল...' হাসির দমকে ওর কথা বন্ধ হয়ে এল।

মারিয়াও হাসি থামাতে পারছে না। হাসির চোটে হেঁচকি উঠে গেছে।

'তোমার কপালে খারাবি আছে দেখো, হরর!' খেঁকিয়ে উঠল দীপ। সে মারিয়ার কাঁধ চেপে ধরল শক্ত হাতে। হিস্টিরিয়া রোগীর মত হাসতে থাকা মারিয়াকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল বড় রাস্তায়।

'হো হো হো!' ফুটপাতে শুয়ে হরর হাবলু তখনও হেসে চলেছে। 'হো হো হো!' কিছুতেই থামাতে পারছে না হাসি। এমন মজা সে জীবনেও পায়নি। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। হাসি থামাতে চাইছে কিন্তু দীপের সেই ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসা চোখ, হাঁ হয়ে যাওয়া মুখটার কথা মনে পড়তে কিছুতেই সংবরণ করা যাচ্ছে না হাসি।

আরও অনেকক্ষণ হাসির পরে একটু সুস্থির হলো হরর হাবলু। হাতে ভর করে সিধে হলো। তাকাল গলিমুখে।

ফাঁকা।

হরর হাবলু কোটের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে যাচ্ছে, থেমে গেল ঘাড়ে শীতল একটি হাতের স্পর্শ পেয়ে।

'তোমার হাসি দেখে ভালোই লাগল,' ওর পেছন থেকে বলল কণ্ঠটি। উষ্ণ একটি কণ্ঠ। সুরেলা।

পাঁই করে ঘুরল হাবলু। হাঁ হয়ে গেল সামনের মানুষটাকে দেখে।

লুসিয়ানো মানুচ্চি।

'হাই, হাবলু,' বলল ভ্যাম্পায়ার। শরীর অবশ করা হাসি ঠোঁটে। 'গুড টু সি ইউ।' কনুই দিয়ে মৃদু ঠেলা দিল সে হাবলুকে।

দেয়ালের দিকে এক পা পিছিয়ে গেল হরর হাবলু।

'কামন। ভয় পেয়ো না,' মিনতির সুরে বলল ভ্যাম্পায়ার। 'তুমি কীসের ভয় পাচ্ছ? ব্যাপারটা তোমার খারাপ লাগবে না।'

পুরো অবশ হয়ে গেছে হাবলুর শরীর। প্রচণ্ড একটা ভয় গ্রাস করেছে ওকে। মজা করার কথা ভুলে গেছে বেমালুম।

'আমি জানি তুমি কী হতে চাও,' বলল লুসিয়ানো। 'সবার থেকে আলাদা। আমিও বহুদিন ধরে সবার থেকে আলাদা।' হাসল সে। এই প্রথমবারের মত দাঁত দেখাল। লম্বা দাঁত। ভীষণ লম্বা দাঁত। 'আমি জানি কাউকে ভুল বুঝলে তার কেমন লাগে, বুঝতে পারি কাউকে একঘরে করে রাখলে, তাকে নিয়ে সারাক্ষণ ঠাট্টা-তামাশা করলে, তার সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করলে তার কেমন লাগে।'

সামনে এগিয়ে এল ভ্যাম্পায়ার। তার মুখটা ক্রমে কাছিয়ে আসছে। গুটিয়ে উঠল হরর হাবলু।

'কিন্তু এখন থেকে সবকিছু বদলে যাবে। ওয়েট অ্যাণ্ড সি। ওরা আর তোমাকে নিয়ে তামাশা করার সাহস পাবে না। নিশ্চয়তা দিচ্ছি। ওরা আর পার পাবে না। কক্ষনো না।'

মুখটি আরও কাছিয়ে এল। আরও অনেক কাছে।

লম্বা লম্বা দাঁত। ভীষণ লম্বা দাঁত।

আর খুব...খুব...

ধারাল।

'বিদায় বলো, হাবলু,' গানের সুরে বলে উঠল ভ্যাম্পায়ার। 'বলো শুভরাত্রি। যখন ঘুম ভাঙবে তোমার, নিজেকে আবিষ্কার করবে চমৎকার একটি জায়গায়। আর জায়গাটি তোমার পছন্দ হবে।'

হরর হাবলুর ঘাড় লক্ষ্য করে নেমে এল ভ্যাম্পায়ারের লম্বা এবং ধারাল দুই শ্বদন্ত।

সাতাশ

ভ্যাম্পায়ার যখন হরর হাবলুকে নিয়ে ব্যস্ত ওই সময় গ্রীন রোডের মাথায় চলে এসেছে দীপ এবং মারিয়া। রাস্তায় শুধু ওদের জুতোর শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। আর ওদের ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ।

দীপের অবচেতন মনে বুদ্বুদের মত মৃদু তরঙ্গ তুলল চিন্তাটা। শব্দ বা ছবি নয়, কোনও ডায়াগ্রাম অথবা ব্যাখ্যাও নয়। ওর হঠাৎ মনে হলো মারা যাচ্ছে হরর হাবলু।

যে মুহূর্তে হাবলুর চোখ থেকে মুছে গেল আলো, শুরু হলো মৃদু তরঙ্গ। যেন নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার কারণে ছোট ছোট ঢেউ তৈরি হয়েছে। ভয়ের একটার পর একটা ঢেউ এসে ধাক্কা খেল দীপের মস্তিষ্কে। ও বুঝতে পারছে না কেন এমন ভয় লাগছে, বগলের নিচটা শিরশির করছে, শিরদাঁড়া যেন শুকনো বরফ। জানে না এরকম অনুভূতির মানে কী।

ও শুধু জানে গ্রীন রোড আর নিরাপদ নয়। এর প্রতিটি মোড়, প্রতিটি দোরগোড়া, প্রতিটি দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে আছে আতঙ্ক, প্রতিটি ছায়ার মাঝে ঘটছে পরিবর্তন এবং ওগুলো মৃত্যুর সমন নিয়ে হাজিরা দিচ্ছে।

তবে এ মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়। এ হলো জ্যান্ত মৃত্যু। এ মৃত্যু গ্রাস করবে তোমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের।

'মারিয়া?' দীপ ডাকল বান্ধবীকে, হাঁটতে হাঁটতে ফিরে দেখল।

একই রকম অনুভূতি হচ্ছিল মারিয়ারও। সে জবাবে শুধু

মাথা ঝাঁকাল। তার চোখ দেখেই দীপ বুঝতে পারল কী ভাবছে মারিয়া।

ওদের হাঁটার গতি দ্রুততর হলো। মারিয়ার ডান হাত আপনা থেকে এগিয়ে গেল দীপের দিকে। দীপ বাম হাতে ধরল ওর হাত। দুটি হাত পরস্পরকে চেপে ধরে থাকল। দু'জনের হাতের তালুর শীতল ঘাম মিলেমিশে এক হয়ে গেল।

দীপ মস্তিষ্ককে নির্দেশ দিল অন্য কিছু চিন্তা করার জন্য। তার মনের একটা অংশ ভাবছে কীভাবে দ্রুততম সময়ে মারিয়াকে ওর বাড়ি পৌঁছে দেয়া যায়। অপর অংশটি ধাপ্পাবাজির কোনও রাস্তা খুঁজছে। এমন কোনও রাস্তা দিয়ে দীপ মারিয়ার বাসায় পৌঁছাতে চায় যে রাস্তা লুসিয়ানো চিনবে না। তবে কোন্‌দিক দিয়ে যাবে তা-ই বুঝতে পারছে না দীপ।

চিন্তাভাবনা করার জন্য পনেরো সেকেণ্ডও সময় পেল না দীপ।

হঠাৎ গ্রীন রোডের প্রতিটি বাতি দপ করে নিভে গেল। লোডশেডিং?

যেন বিরাট এক কালো পর্দা গোটা এলাকাটি ঢেকে দিল। যদ্দূর চোখ যায় রাস্তার দু'পাশের একটি স্ট্রিট লাইটও জ্বলছে না। বাড়ির জানালাগুলোরও তথৈবচ অবস্থা। চাঁদের আলো ছাড়া অন্য কোনও আলো নেই।

আর চাঁদের আলোটা বড্ড শীতল।

মারিয়া হঠাৎ হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করে দীপের হাত ধরে টান মারল। দীপ ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাম দিকের ভবনের ওপরে তাকাল। ভবনের সবচেয়ে ওপরতলার দুটি ফ্লোর চাঁদের আলোয় ভাসছে।

আর জোসনা মাখা ভবনের ইটের গায়ে প্রকাণ্ড, কালো একটা ছায়া পড়েছে।

ওদের মাথার ওপর থেকে ভেসে এল ডানা ঝাপটানোর অশুভ, পতপত আওয়াজ...

'ভাগো!' চিৎকার দিল দীপ, তারপরই দে ছুট। দীপের গলা দিয়ে চিৎকারটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিয়েছে মারিয়া। প্রথম কুড়ি গজ শক্ত করে হাতে হাত ধরে ছুটল ওরা, তারপর দলছুট হয়ে গেল। দৌড়ের তালে হাত দুলছে, শরীরের প্রতিটি আউন্স খরচ করে গতি বাড়িয়ে চলল ওরা।

বামে ওয়াপদা রোডে মোড় নিল দু'জনে, সহজাত প্রবৃত্তিতে শহরের এদিকে ছুটছে। শহরের এ অংশ এখন মধ্যরাতেও জেগে থাকে। কারণ বছরের এ সময়টিতে প্রায় প্রতিবারই জাঁকজমক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। পাদ্রিশিবপুরবাসী বলে 'এক্সিবিশন'। এই এক্সিবিশনে সার্কাস থাকে, যাত্রাপালা দেখানো হয়, সারারাত জুড়ে চলে প্রদর্শনীর সবচেয়ে জনপ্রিয় 'হাউজি' খেলা। এটি আসলে একধরনের বৈধ জুয়োখেলা। ছেলেবুড়ো সবাই এতে অংশ নেয়। বিশাল প্যাণ্ডেল টাঙিয়ে হাউজি খেলা চলে। হাউজি প্যাণ্ডেল থেকে শ' দুয়েক গজ দূরে আছে ডিস্কো নাচের বন্দোবস্ত— হটস্টার। শহরের দোতলা এ ভবনে তরুণরাই বেশি ভিড় করে। বরিশালের প্রভাবশালী সংসদ সদস্য এর আয়োজক বলে পুলিশ তরুণদের হুল্লোড়, বিয়ার পান ইত্যাদি দেখেও না দেখার ভান করে। আর হাউজি থেকে তারা প্রতিদিনই বখরা পায় বলে ওখানেও চোখ বুজে থাকে।

হটস্টার, দীপ ছুটতে ছুটতে চিন্তা করছে। ওখানে মানুষজন থাকবে, থাকবে আলো। এক ঝলক দেখল মারিয়াকে, হয়তো ও-ও একই কথা ভাবছে। সামনে বুলাচ্ছে দৃষ্টি।

এমন সময় উদ্‌ঘাটিত হলো আকস্মিক বিদ্যুৎ চলে যাবার রহস্য।

ওয়াপদা রোডেও বাতি নেই, ফলে পরিষ্কার করে কিছু ঠাহর

হয় না। দীপ ওর বাম দিকে বিদ্যুতের একটা খাম্বা দেখতে পেল, ওটার পাশে একটা পাওয়ার বক্স। বক্সটা টান মেরে ছুটিয়ে আনা হয়েছে কজা থেকে, ছেঁড়া তারগুলো নাড়িভুঁড়ির মত ঝুলছে।

ও, মাই গড, নীরবে চিৎকার দিল দীপ। কতটা অমানুষিক শক্তি থাকলে কেউ হাই ভোল্টেজের তারসহ পাওয়ার বক্স কজা থেকে টান মেরে ছুটিয়ে আনতে পারে। ওই একই শক্তির অধিকারী দীপের জানালায় পুঁতে রাখা পেরেকগুলো ছুটিয়ে ফেলেছিল।

ওই একই শক্তি ওকে হুমকি দিয়েছে, ওকে ওই শক্তির ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন যদি না সে দ্রুত এর কবল থেকে মুক্তি পায়।

লুসিয়ানো এ শহরে নতুন এসেছে। তাই রাস্তাঘাট তার ভালো চেনার কথা নয়। এ বিশ্বাসের ওপর ভরসা রেখে সে ডানে, বাজার রোডে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সেঁটে রয়েছে মারিয়া। রাস্তার শেষ মাথায় আলো ঝলমলে হটস্টার। বিদ্যুৎ বিপর্যয় এত দূরে এসে থাবা মারতে পারেনি।

মাঝামাঝি এসেছে ওরা, হঠাৎ দেখতে পেল লুসিয়ানো মানুচ্চিকে।

'হেই, ইউ লিটল লাভবার্ডস!' দাঁত বের করে হাসল ভ্যাম্পায়ার। 'এসো, আমার সঙ্গে ড্রিইইংক করবে?'

ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপ এবং মারিয়া। বাজার রোডের কুড়ি ফুট রাস্তাও যায়নি ওরা, ওই জায়গাটুকু উন্মাদের মত পিছু হঠে পার হলো, তারপর পাঁই করে ঘুরে বাতাসের বেগে আবার ছুটল ওয়াপদা অভিমুখে।

'ধ্যাত! ধ্যাত! ধ্যাত!' পা ফেলার তালে গোঙাচ্ছে দীপ। ওদের সামনে খান মজলিস রোড গ্রীন রোডের চেয়েও বেশি

অন্ধকার এবং অশুভ লাগল। ঝট করে বাম হাতটা বাড়িয়ে মারিয়ার জামার আস্তিন খামচে ধরল দীপ। মারিয়া উন্মাদের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। 'এই পথে,' হিসিয়ে উঠল দীপ, এক পাক ঘুরিয়ে দিল মারিয়াকে। সম্মতির ভঙ্গিতে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে ওর সঙ্গে দৌড়াতে লাগল মারিয়া।

বাজার রোডে আবার ফিরে এল ওরা। নাহ্, লুসিয়ানো এখানে নেই। লুসিয়ানো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটা পার হবার সময় দীপ রাস্তার দু'ধারে এবং আকাশে চোখ বুলিয়ে নিল কোনও ছায়া-টায়া দেখা যায় কি না।

লুসিয়ানোর কোনও পাত্তাও নেই। দুই-তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিয়েছে, হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে আত্মা উড়ে গেল দীপের। না, ভয় পাবার কিছু নেই। ওটা একটা বেড়াল। রাস্তায় পড়ে থাকা খবরের কাগজে খাবার-টাবার খুঁজছে। গাড়ি চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে অদূরে। তবে লুসিয়ানোকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

আটাশ

বিপদ থেকে রক্ষা পেতে যাচ্ছি! উল্লসিত নীরব চিৎকার দিল দীপ। এই প্রথম হাসি ফুটল ঠোঁটে। রাস্তার মোড় আর পাঁচ গজ দূরেও নেই, দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব। রাস্তায় চলছে গাড়ি ঘোড়া, জানালা দিয়ে টিনেজরা তাকিয়ে আছে, তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার মত কাছাকাছি চলে এসেছে দীপ এবং মারিয়া, রাস্তায় ছেলেরা কোরাসে গান গাইছে, শিস দিচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া দীপের নাকে এসে ঢুকল। গন্ধটা ওর কাছে মিষ্টি লাগল।

'আমরা পেরেছি!' চেঁচাল দীপ, মারিয়ার কাঁধে বাড়িয়ে দিল হাত। দৌড়াতে দৌড়াতে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল মারিয়া। বেদম হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। ওরা তীর বেগে মোড় ঘুরল...

...এবং সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল ছেঁড়া জিনস পরা চোয়াড়ে চেহারার কতগুলো লোকের গায়ে। দলনেতা টেকো, চর্বিবহুল শরীর। মুখটা সরু কুড়োলের মত, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে সিগারেট। দীপ সরাসরি বাড়ি খেয়েছে এ লোকের গায়ে, ধাক্কার চোটে তার মুখ থেকে সিগারেটটা ছিটকে গিয়ে ডানা মেলল আকাশে।

'ওই ব্যাডা, চউক্ষের মাথা খাইছস, দ্যাহোস না!' খেঁকিয়ে উঠল টেকো। দীপ তাকে শান্ত হওয়ার অনুরোধের ভঙ্গি করে পিছলে বেরিয়ে গেল পাশ কেটে। ওকে অনুসরণ করল মারিয়া। তিন ষণ্ডা যুবক ধীরগতিতে ঘুরে দেখল ওরা চলে যাচ্ছে। ওদেরকে ধরে একটা ধোলাই দেবে কি না তা নিয়ে তর্ক করতে যাচ্ছে।

তবে সে সুযোগ ষণ্ডারা পেল না।

কারণ মারিয়া এবং দীপ ঘুরতেই দেখল ওদের কাছ থেকে মাত্র দু'হাত দূরে, একটা লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে আছে লুসিয়ানো। ওদের আতঙ্কে জমে যাওয়া ভয়ার্ত চেহারার অভিব্যক্তি সানন্দে উপভোগ করল সে।

'আশা করি তোমরা পরস্পরের সঙ্গ বেশ উপভোগ করছ,' বলল সে। 'উপভোগ না করতে পারলে বুঝব খামোকাই সময় নষ্ট করছ তোমরা...'

লুসিয়ানোর বকোয়াস শোনার অপেক্ষা করল না ওরা, লাফ মেরে পিছিয়ে গেল যেন বোলতার হুলের দংশন খেয়েছে; বিদ্যুৎগতিতে ঘুরেই হটস্টারের অন্য গলি ধরে ছুটল। গলিটা পার হতেই উল্টো দিকে ডান্স ক্লাব হটস্টার। ক্লাবের সামনের

সারিটা তেমন দীর্ঘ নয়, মাত্র তিন-চারজন লোক, তবে ডজনেরও বেশি মানুষ দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে লাইনে সামিল হতে। দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে ওরা একে অপরের হাত চেপে ধরল শক্ত মুঠিতে।

প্লিজ, গড, লোকগুলো যেন ভেতরে ঢুকতে পারে, নীরব আকুতি জানাল দীপ। *প্লিজ, গড, ওদের দরজা দিয়ে ঢুকতে দাও।* ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনটা দেখে নিল ও। অলস ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে লুসিয়ানো, শিকার তার হাতের নাগালে তাই তাড়াহুড়ো করছে না। ভয়ানক মুষড়ে পড়ল দীপ। দৌড়ের গতি শ্লথ হয়ে গেছিল। ওকে টেনে নিয়ে চলল মারিয়া।

আবার দৌড়াতে লাগল ওরা। ডজন মানুষের কাফেলাটা হাত দশেক দূরে, ওদের সামনের লোকটা দরজায় দাঁড়ানো গেটম্যানকে পঞ্চাশ টাকা দিল। দীপের মনে পড়ল ওর কাছে কোনও টাকা নেই; প্লাস্টিকের ক্রুশ কিনতে গিয়ে শেষ পাইপয়সাটি পর্যন্ত খরচ করে ফেলেছে।

'ওহ, গড...' গুঙিয়ে উঠল দীপ।

মারিয়া কনুই দিয়ে খোঁচা লাগাল। ওর দিকে তাকাল দীপ, পিটপিট করছে, হাসি দু'কানে গিয়ে ঠেকল ওর ডান হাতে মারিয়া একশ' টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়েছে দেখে। গেটম্যান ওদের দিকে তাকাতে তাকে নোটটা দিল দীপ। বারোজনের দলটা ওদের ঠিক পেছনে।

'ধন্যবাদ,' বলল দীপ। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল আবার। সারির শেষ তিনটা লোককে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে লুসিয়ানো। কালো চোখের তারায় ধকধক জ্বলছে আগুন। মুখ ঘুরিয়ে নিল দীপ। ঢোক গিলল। পিছু নিল মারিয়ার।

ওরা একেকবারে লাফ মেরে চারটে করে সিঁড়ি বাইতে লাগল।

এমন সময় ভীমের মত একটা হাত খপ করে চেপে ধরল দীপের কাঁধ, সজোর খামচি লাগল। ব্যথায় চোখে সর্ষেফুল ফুটল। পরশু রাতে মৃত্যুকে খুব কাছাকাছি দেখেছে দীপ। ভাগ্যগুণে রক্ষাও পেয়েছে। তবে এবারে বুঝি আর জানে বাঁচতে পারল না ও।

তবে পেছন থেকে যে কণ্ঠটা গমগমে স্বরে কথা বলে উঠল ওই গলাটা শুনতে পাবে বলে আশা করেনি দীপ; *ছুটে পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই* এ হুমকি দেয়ার পরিবর্তে বলল, 'এক সেকেণ্ড, খোকা। তোমার আইডি কই?'

গেটম্যান পাহাড়ের মত উঁচু, ঠোঁটে হিটলারি গোঁফ, কামানো মাথা, দুই বাহু যেন বট গাছের গুঁড়ি, প্রথম দর্শনে তাকে মোটা বলে ভ্রম হলেও আসলে সে তা নয়। প্রায় ছয় ফুট লম্বা দানবটার হাতে কিলবিল করছে পেশী। গায়ের রঙ আবলুশ কালো। দীপের জানার কথা নয় এ লোক বরিশাল ব্যায়ামাগারের ট্রেনার। মাসব্যাপী চলা এক্সিবিশনের *হটস্টার* ক্লাবের ম্যানেজার মারকুটে স্বভাবের এ লোককে উচ্চ মূল্যে ভাড়া করে এনেছে ডান্স ক্লাবে কেউ বিয়ার খেয়ে মাতলামি করলে কিংবা মাস্তানির চেষ্টা করলে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলানোর শক্তি ও সাহস দুটোই সে রাখে।

সাধারণ পরিস্থিতিতে এরকম কিছু ঘটলে গেটম্যানকে দেখেই হয়তো হিসু করে দিত দীপ। তবে এটা সাধারণ কোনও পরিস্থিতি নয়। লুসিয়ানো দ্য লুসিফারের শক্তির সঙ্গে কালুয়া গেটম্যানের কোনও তুলনাই হতে পারে না তা সে যতই বিশালদেহী হোক না কেন।

লুসিয়ানো লঘু তবে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। তার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীপ।

'আমার কথা কানে গেছে?' জিজ্ঞেস করল গেটম্যান। দীপের কাঁধ ধরে প্রবল নাড়া দিল।

'আ-বুব্বা,' বলল দীপ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে যোগ করল, 'বিশ্বাস করুন, আমার বয়স আঠারো। ভুলে বাড়িতে কলেজের আইডি ফেলে এসেছি। আমি সেন্ট আলফ্রেডে পড়ি। আমার–' নিজের নামটা আর উচ্চারণ করতে পারল না।

লুসিয়ানোকে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দোরগোড়া থেকে তিন হাত দূরেও নেই। লাইন না মেনে সামনে চলে আসার জন্য কে যেন তাকে কঠিন কথা শুনিয়ে দিল। 'লাইনে গিয়া দাঁড়ান, মিয়া!' চেঁচাল মোটা লোকটা, থলথলে একটা হাত লুসিয়ানোর কাঁধ কামচে ধরল।

দীপ দেখল ঝড়ের গতিতে ঘুরে গেছে ভ্যাম্পায়ার। লুসিয়ানোর চাউনিতে মোটু কী দেখেছে কে জানে, তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, দৃষ্টিতে নির্জলা আতঙ্ক।

পুরো ঘটনা ঘটল পাঁচ সেকেণ্ডেরও কম সময়ে।

আর একদম শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল দীপ।

'ভাগো!' ঘাউ করে উঠল সে, মারিয়ার হাত ধরে দিল টান। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দীপ গেটম্যানের মুঠি থেকে ঝট করে মুক্ত করল নিজেকে, তারপর ছুট। ক্লাবের ভেতরে নয়, বাইরে। তার পিছু নিল মারিয়া।

'অ্যাই!' পেছন থেকে চেঁচাল গেটম্যান। 'তোমাদের টাকা?'

'লাগবে না!' চেঁচাল দীপ। মারিয়াকে নিয়ে ছুটছে। ওদের পেছনে, লোকের ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করছে লুসিয়ানো।

ধাতবের গায়ে ধাতব লাগার শব্দ হলো। দীপ দেখল

হটস্টারের কিচেনের সাদা অ্যাপ্রন পরা এক লোক আবর্জনার ড্রামে আলু-পেঁয়াজের খোসা ফেলছে। অন্ধকার গলিতে হরর হাবলুর চেহারাটা এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে গেল দীপের।

মাত্র হাত পাঁচেক দূরে ডিস্কো ক্লাবের কিচেনের দরজা খোলা। ঝড়ো গতিতে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল দীপ এবং মারিয়া।

বাবুর্চি ওদের দেখে মুখ তুলে তাকাল। চেঁচাল, 'অ্যাই, ওদিকে যাওয়া নিষেধ! অ্যাই!'

'দুঃখিত!' মারিয়াও চেঁচাল। দীপ চুপ হয়ে রইল। ক্লাবে ঢোকার দরজা দিয়ে তীর বেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

আলোর বন্যা ধাঁধিয়ে দিল চোখ। মিউজিকের তীব্র নিনাদ বধির করে দিল কান।

হটস্টার ক্লাবের ডান্স ফ্লোরটা প্রকাণ্ড। এবং পূর্ণ। চারটে দানবাকৃতির পর্দায় মাইকেল জ্যাকসনের মিউজিক ভিডিও 'থ্রিলার' চলছে, বাজনার তালে নাচছে ছেলেরা। কয়েকটি মেয়েও আছে। নিশ্চয় কলেজে পড়ে। তবে তারা জোট বেঁধে এসেছে। এবং আলাদাভাবে নাচছে।

পর্দায় জিন্দালাশরা উঠে পড়েছে কবর ছেড়ে। দর্শক জিন্দালাশের ধামাকা নৃত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোমর দোলাচ্ছে, চিৎকার করছে। অন্য সময় হলে দীপও নেচে কুঁদে অস্থির হত। কিন্তু ওদেরকে সত্যিকারের জিন্দালাশ তাড়া করেছে। এখন এর কবল থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে সে চিন্তায় নাভিশ্বাস অবস্থা দীপের।

ঘরের দূরপ্রান্তে, বাম দিকের ছোট একটি প্লাস্টিক সাইন বোর্ড নজর কাড়ল ওর। অনুমানের ওপর নির্ভর করে ওদিকে এগুল দীপ। মারিয়া রইল পাশে।

সাইন বোর্ডের পেছনে একটা করিডর। করিডরের পরে

রেস্টরুম। 'ঠিক হ্যায়?' চিৎকার করে বলল দীপ, স্পীকারের তারস্বর আওয়াজে অস্পষ্ট শোনাল। 'চলো!'

রেস্টরুমের সামনে এসে দাঁড়াল দীপ। মারিয়া ওর নাম ধরে কী যেন বলল, বিকট মিউজিক খেয়ে ফেলল শব্দগুলো, ঠিক বোঝা গেল না।

'কী?' পকেট থেকে মোবাইল বের করল দীপ।

'তুমি হলি ওয়াটার সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলে,' গলার সবগুলো রগ ফোলাল মারিয়া। 'ওটা মোটেই মন্ত্রপূত পানি ছিল না। ভুয়া হলি ওয়াটার ছিল।'

'জানি আমি,' নাম্বার টিপছে দীপ।

'তোমার কথা আমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল।'

'ঠিক আছে, এজন্য আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না,' মারিয়ার দিকে ফিরে বলল দীপ।

ওই প্রান্তে বেজে উঠল ফোন।

'হ্যালো? ওসমান দারোগাকে চাইছি, প্লিজ,' বলল ও। 'খুব জরুরি দরকার।'

উনত্রিশ

ঘর পুরো অন্ধকার করে বসে আছেন রেমো ডিসুজা। নড়াচড়া করতেও ভয় পাচ্ছেন। দরজার তালা এবং ছিটকিনি সব শক্তভাবে বন্ধ। প্রতিটি জানালায় রেখেছেন পানি ভরা পাত্র। সে সঙ্গে নানান আকার এবং আকৃতির ক্রুশ ঝুলছে হাতের নাগালের মধ্যে।

এসব জিনিস সামান্যই স্বস্তি দিতে পেরেছে গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলারকে। তিনি নিজের প্রিয় কেদারায় বসে রসুন চিবুচ্ছেন

এবং প্রচণ্ডরকম আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগছেন।

তিনি আশা করছেন জেগে উঠে দেখবেন পুরো ব্যাপারটাই আসলে একটা সাইকোটিক এপিসোড।

কিন্তু তাঁর ভাগ্য তাঁকে এ সহায়তাটুকু করল না।

কলিংবেলের কর্কশ শব্দ বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে বাড়ি মারল রেমো সাহেবের কানে, রাতের নৈঃশব্দ ছিন্ন করে দিল। তাঁর দুটো হার্টবিট পরপর মিস করল। তিনি ঢোক গিললেন। ভয়ানক ইচ্ছে করল হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচে ঢুকে কানে হাত চাপা দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। সাড়া দেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে বেশ অনেকক্ষণ সময় লাগল মি. ডি'সুজার।

'কে?'

আবছা, চোরা গলায় ভেসে এল জবাব। 'আংকেল, দরজা খুলুন। আমি হাবলু।'

রেমো সাহেব চেয়ার ছেড়ে নড়লেন না। সাড়াও দিলেন না। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। কিছু মাথায় আসছে না। তাঁর মনটা যেন একটা জ্বলন্ত চাকা, গড়াতে গড়াতে নেমে যাচ্ছে নিচে।

দরজার বাইরে পাহাড়সমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে অপেক্ষা করছে হরর হাবলু। সে তার শার্টের কলার গলার ওপর টেনে দিয়ে ঘাড়ের কাছে সদ্য তৈরি হওয়া গর্ত জোড়া আড়াল করল। *তাড়াতাড়ি দরজা খোল, ব্যাটা*, মনে মনে বলছে হাবলু। *আমি ক্ষুধার্ত।*

'প্লিইইইজ, আংকেল। আমাকে ভেতরে আসতে দিন।'

রেমো ডি'সুজা হাতের ক্রুশটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলেন। ছেলেটার গলার স্বর কেমন যেন অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর কিছু একটা আছে ওতে, শিরশিরানি এনে দেয় গায়ে। পেটের ভেতরটা সুড়সুড় করে উঠল রেমো সাহেবের। চেয়ারে পিঠ খাড়া করলেন

তিনি, গলার স্বরে কর্তৃত্বময় ব্যঞ্জনা ফোটানোর চেষ্টা করলেন। যদিও তেমন ফুটল না।

'হ্যাঁ– হ্যাঁ– হাবলু। কী ব্যাপার?'

'প্লিজ, আংকেল, একটা ভ্যাম্পায়ার তাড়া করেছে আমাকে। দয়া করে ভেতরে ঢুকতে দিন।'

কিছুক্ষণ আগে মারিয়া এবং দীপকে ভ্যাম্পায়ার সেজে দারুণ ভড়কে দিয়েছিল সে। কথাটা মনে পড়তে মুচকি হাসল হরর হাবলু।

হঠাৎ ঝড়াং করে খুলে গেল দরজা। হরর হাবলুকে টান মেরে ঘরে ঢোকালেন রেমো ডি'সুজা। এক ঝলক দেখে নিয়েছেন সিঁড়ি, ওখানে কেউ অতর্কিত হামলার জন্য ঘাপটি মেরে আছে কি না। না, কেউ নেই। কাঁধ কুঁজো করে ঘরে ঢুকেছে হাবলু। রেমো দ্রুত বন্ধ করে দিলেন দরজা। শেষ ছিটকিনিটা লাগিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ঘুরলেন তাঁর দর্শনার্থীর দিকে।

'বলো, হাবলু,' বললেন তিনি। 'আমরা এখন কী করছি?'

ঘুরল হাবলু। হাসল। 'আমরা, কথাটার মানে কী, আংকেল?'

ওর হাসি দেখে শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে গেল রেমো সাহেবের। ঠোঁটের দু'কোণ দিয়ে দুটো শ্বদন্ত বেরিয়ে পড়েছে। তীক্ষ্ণ, লম্বা এবং ধারাল। হরর হাবলুর গায়ের কালো কোটটি খোলা, ঘাড়ের কাছের লালচে দুটো ক্ষত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, রক্ত লেগে আছে জামায়।

বড় বড় হয়ে গেল রেমো ডি'সুজার চোখ। তিনি বুঝে গেছেন ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হয়েছে হরর হাবলু।

মাথাটা একদিকে কাত করল হরর হাবলু, যেন ডি'সুজার চিন্তাটা পড়তে পারছে। 'বদলটা খুব দ্রুত হয়েছে, তাই না?

আপনি নিশ্চয় কল্পনাও করেননি একজন মানুষের মধ্যে এত দ্রুত পরিবর্তন আসতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ...আমি বাজি ধরে বলতে পারি আরও অনেক কিছু আছে যা আপনি কল্পনা করতে পারেন না কিংবা জানেন না।' দু'জনের মধ্যেকার দূরত্ব ধীর গতিতে কমিয়ে আনছে সে। 'তবে সেটা এখন জানতে পারবেন।'

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে, ঝটিতি ঘুরলেন রেমো ডি'সুজা, ঝাঁপিয়ে পড়লেন দরজার ওপর। তাঁর এক হাতে ক্রুশ, আরেক ত্রস্ত হাতে ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করলেন। কী বিপদ! জ্যাম ধরে গেছে ছিটকিনি। খুলছে না।

হাবলু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলার দরজার ছিটকিনি খোলার জন্য কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। হাসিটা আর চেপে রাখতে পারল না সে। থুতু ছিটিয়ে অট্টহাসি দিল হরর হাবলু। 'ওওওও! ওওওও! রেমো ডি'সুজা পালাতে চাইছেন। আমি তা হলে শেষ।' সে ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে মুখ ঢাকল। 'আমাকে বাঁচান, ডি'সুজা, আমাকে বাঁচান! ওওও! ওওওও!'

হরর হাবলুর বিদ্রূপ বোলতার দংশন হয়ে বিঁধল রেমো সাহেবের গায়ে। এতদিনকার ফ্যান্টাসি অকস্মাৎ রূপ নিয়েছে বাস্তবতায়, তাও আবার তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে!

'আপনার প্রতি একসময় আমার ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল,' অবজ্ঞার সুরে বলল হাবলু। 'তবে যখন দেখলাম আপনি একটা ভুয়া, আপনার প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা আমার লোপ পেয়েছে।'

লাফ দিল সে। এক লাফে রেমো ডি'সুজার পিঠে। হাত বাড়িয়ে দিল মুখে, চোখ খুঁজছে আঙুল, গেলে দেবে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন বর্ষীয়ান অভিনেতাটি, ঝট করে ঘুরলেন। দরজায় বাড়ি খেল হাবলু। লাথি ছুঁড়ল সে, থাবা বাড়িয়ে খামচে

ধরল রেমোর কোটের ল্যাপেল, ঝুঁকে এল কাঁধের ওপর। ভ্যাম্পায়ারটার নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত এবং শীতল, নরম চামড়ায় চেপে বসল দাঁত। ঘরঘরে শব্দ আর গোঙানি মিলে অমানুষিক একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল ওটার গলা দিয়ে, রেমোর কানের পর্দা যেন ছিঁড়ে দিল। তিনি প্রচণ্ড ভয়ে আবার চিৎকার দিলেন।

এবং একই সঙ্গে, নিজের অজান্তেই ক্রুশটা উঠে এসে চেপে বসল হরর হাবলুর মুখে।

এটা আসলে একটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন। ডজনবার, ডজনখানেক ছবিতে এ কাজটা করেছেন তিনি। এতে ব্যবহার করা হয়েছে স্পেশাল ইফেক্ট, টিউব এবং দুধের মত তরল ঘন নির্যাস দিয়ে কাজ করেছে টেকনিশিয়ানরা।

কিন্তু এ মুহূর্তে যে পোড়া গন্ধটা তাঁর নাকে ধাক্কা মেরেছে তা খুব বেশি বাস্তব। ধোঁয়া উঠল ক্রুশটিকে ঘিরে, মাংস পোড়ার হিসহিস শব্দ হলো। বেয়নেট দিয়ে বিদ্ধ হয়েছে যেন হাবলু, প্রাণঘাতী একটা চিৎকার দিয়ে মেঝেয় ছিটকে পড়ল, হাত দিয়ে চেপে ধরেছে কপাল। 'আপনি আমার কী করেছেন?' হাহাকার বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল সে। তার ভৌতিক সুরের কান্না রেমোর শরীরের রোম খাড়া করে দিল।

হঠাৎ থেমে গেল কান্না। মুখ তুলে চাইল হরর হাবলু। রেমো সাহেবের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। তারপর আঙুলের ডগা দিয়ে হালকাভাবে স্পর্শ করল ক্ষত। শিউরে উঠল।

কপালে ফুটে উঠেছে ক্রুশের চিহ্ন।

'না...' ককিয়ে উঠল হাবলু, 'নাআআআ...' লাফ মেরে খাড়া হলো, ছুটে গেল আয়নার সামনে, কী দেখতে পাবে ভেবে ভীত।

কিন্তু কিছু দেখতে পেল না সে। কারণ আয়নায় তার কোনও প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠেনি।

'ইউ বাস্টার্ড,' হিসিয়ে উঠল হরর হাবলু। 'আমি তোকে খুন করব...' ভীতিকর একটা ভঙ্গি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

রেমো ডি'সুজা ক্রুশটা ঝট করে বাগিয়ে ধরলেন সামনে।

'ভাগো!'

নিজের জায়গায় জমে গেল হাবলু। পিটপিট করল চোখ, ক্রুশটার দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। 'ধ্যাত!' বিড়বিড় করল সে। অন্ধকার, তবু ক্রুশটিকে দেখামাত্র তার বমিবমি ভাব হচ্ছে। সে ওটাকে পাশ কাটাতে চাইল কিন্তু রেমো সেই সুযোগ দিলেন না।

'ভাগো, নরকের অভিশপ্ত সন্তান!' ক্রুশটাকে সামনে বাগিয়ে ধরে কদম বাড়ালেন তিনি। 'ভাগো বলছি!

ক্রুশ দিয়ে কপাল না পুড়লে দৃশ্যটা দেখে হয়তো হেসে ফেলত হাবলু। রেমো ডি'সুজাকে সার্কাসের ক্লাউনের মত লাগছে। কিন্তু তার হাসি এল না। বরং সভয়ে পিছিয়ে গেল।

ঘরের চারপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল হাবলু। সর্বত্র ক্রুশ আর ক্রুশ, ওর পালাবার পথ বন্ধ। তবে শুধু একটা জায়গা আছে।

জানালা।

রেমো ডি'সুজা বিস্ময় এবং আতঙ্ক নিয়ে দেখলেন মুখ দিয়ে ফাঁদে পড়া শ্বাপদের মত হিসহিস শব্দ করতে করতে জানালার দিকে ছুটে গেছে হাবলু। লাফ মারল। বিস্ফোরিত হলো জানালা। শতশত কাচের টুকরো আর কাঠ ছিটকে পড়ল নিচের রাস্তায়।

ত্রিশ ফুট নিচে।

চোখ গোল গোল করে গর্তটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন

ডি'সুজা যেটা কিছুক্ষণ আগেও ছিল একটা জানালা। রাতের বাতাসে পর্দা উড়ছে। নিচের রাস্তা নীরব। কোনও চিৎকার নেই।।

স্রেফ নীরবতা।

যেন রাত ওকে গিলে খেয়েছে।

এক লাফে জানালার সামনে চলে এলেন রেমো ডি'সুজা। উঁকি দিলেন। জনশূন্য রাস্তা। কেউ জানালা ভাঙার শব্দ শুনতে পেলেও এ নিয়ে বোধহয় কৌতূহল দেখাচ্ছে না।

জানালা থেকে সরে এলেন ডি'সুজা। ক্রুশটা এখনও মুঠোয় বন্দি।. এসে বসলেন চেয়ারে। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভাবছেন।

ফুটপাত দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে হাবলু। যন্ত্রণায় বিষ শরীর। কপালে ঘাম। ওখানকার ক্ষতটা ক্রমে আঠালো হয়ে উঠছে। ঘাস চিবিয়ে রস মেখে দিয়েছে হাবলু। ভীষণ জ্বলছে জায়গাটা। ওর চিকিৎসা দরকার। দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন।

কুচকুচে কালো রঙের একটা জিপ উদয় হলো রাস্তার মোড়ে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদিকে পা বাড়াল হাবলু। ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ি থেকে নেমে এল জনি। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দেখল হাবলুকে। 'কী হয়েছে?'

হরর হাবলু দাঁড়াল জনির সামনে, হাঁপাচ্ছে, 'ও...ওর কাছে একটা ক্রুশ ছিল। ওটা দিয়ে আমাকে মেরেছে–'

জনি হাবলুর গাল খামচে ধরল। 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তুমি ওকে মারতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল হাবলু। ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল জনি, হাবলুর কোটের কলার ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। 'তোমার কপালে খারাবি আছে,' ফিসফিসিয়ে বলল সে। ছুঁড়ে ফেলে দিল

গাড়িতে।

গাড়ির আসনের গায়ে প্রচণ্ড বাড়ি খেল হাবলু। ড্রাইভারের সিটে লাফ মেরে উঠে বসল জনি, তারপর ছেড়ে দিল গাড়ি।

ত্রিশ

লুসিয়ানো ইতিমধ্যে জেনে গেছে সব গুবলেট করে ফেলেছে হরর হাবলু। চারশ' বছর ধরে বেঁচে থাকা লুসিয়ানোর এটুকু ক্ষমতা আছে যে সে তার শিষ্যরা কী করছে না করছে তা বহু দূর থেকেও টের পেয়ে যায়। হটস্টার ক্লাবে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময়ই সে বুঝে গেছে বেঁচে আছেন রেমো ডি'সুজা। এঁকে নিয়ে এখনও খেলা করতে পারবে সে।

সে রেমো ডি'সুজার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। তীব্র খিদেয় অস্থির হয়ে উঠবেন গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলার। লুসিয়ানো বৃদ্ধের শারীরিক পরিবর্তন নিজের চোখে উপভোগ করতে চায়। নিজের হাতে সে খুন করবে রেমো ডি'সুজাকে। তবে এজন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কৌশলে পাকড়াও করতে হবে লোকটাকে। তবে এ মুহূর্তে সে মনোযোগ দিচ্ছে ওই স্বল্প বুদ্ধি ছোকরা আর তার কুমারী বান্ধবীটির প্রতি। ওরা তার অনেক সময় নষ্ট করেছে।

এবারে ওরা লুসিয়ানোর ইচ্ছেয় খেলা করবে।

ওদেরকে নিয়ে যে প্ল্যানটা করেছে সে তা বেশ চিত্তাকর্ষক। প্ল্যানটার কথা ভাবতেই রোমাঞ্চ জাগল শরীরে।

হটস্টার তারুণ্যের নেশায় উদ্দীপ্ত। ডান্স ফ্লোরে অনেকেই নাচে মশগুল। লুসিয়ানো মানুষজনকে আনন্দ উপভোগ করতে দেখলে নিজেও আনন্দিত হয়।

কতদিন ধরে সে সাধারণ মানুষের বেশে লোকজনের সাথে মিশছে? শেষ কবে সে সূর্য দেখেছে? চার শতকের বেশি তো হবেই।

হত্যা করার জন্য তার জন্ম হয়েছে। হত্যা করতে সে ভালোবাসে, সুখ পায়। তবে কেউ যদি তার আসল চেহারাটা জেনে যায় তা হলে আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তাকে সে হত্যা করতে বাধ্য। কাজেই দীপ রডরিকের বেঁচে থাকার কোনওই আশা নেই। তবে সে দীপ আর তার সুইটহার্টকে নিয়ে যে পরিকল্পনাটি করেছে তা যদি জানত দীপ তা হলে আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে করত।

ডান্স ফ্লোরে উঠে পড়ল লুসিয়ানো, হাঙরের মত ভেতরে ঢুকে গেল ঢেউটাকে দু'ভাগ করে। কুচকুচে কালো চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রতিটি মুখের ওপর, খুঁজছে। কিন্তু প্রত্যাশিত মানুষকে পেল না। ওরা এ ভিড়ের মধ্যে নেই। যদিও লুসিয়ানো আশা করেছিল এখানেই পাবে দু'জনকে।

কিন্তু ওরা এখানে আছে, ভাবছে সে। *অবশ্যই আছে।*

রাত কাবার হওয়ার আগেই ওরা চলে আসবে আমার কব্জায়।

ওসমান দারোগাকে পাওয়া গেল না। তার এক সহকর্মী জানাল সে ডাক্তার দেখাতে গেছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। হতাশায় দীপের মুখ বিকৃত দেখাল।

প্লাস্টিকের সস্তা ফার্ন গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। লুসিয়ানোর ভয়ে শুকনো মুখ। তাই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে পিশাচটাকে কোথাও দেখা যায় কি না। বাথরুম আকারের খুদে একটা প্রকোষ্ঠে আটকা পড়েছে ওরা। কোথাও লুকাবার জায়গা নেই। আর এ ব্যাপারটাই ভীত করে তুলছে মারিয়াকে। তবে

দীপ বান্ধবীর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বলে। নইলে ফোনে মনোযোগ দিতেই পারত না। ও প্রান্তে বিরামহীন রিং বেজেই চলেছে। ধরছে না কেউ।

'ফোন ধরেন,' দাঁতে দাঁত চাপল দীপ। 'সাড়া দিন।' সে মারিয়া এবং হলওয়ের দিকে পেছন ফিরল।

দানবটা যখন ওদেরকে দেখতে পেল, ব্যাপারটা টেরও পেল না দীপ।

ভ্যাম্পায়ারের অবয়ব প্রথমে চোখে পড়ল মারিয়ার, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। দারুণ একটা ব্যক্তিত্ব, দেবতার মত মাধুর্য ঝরে পড়ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। গায়ে পোকা হেঁটে বেড়ানোর শিরশিরে অনুভূতি হলেও লুসিয়ানোর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মারিয়া।

ওহ, গড, মনে মনে বলল মারিয়া, *একজন মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানবের মত হয় কী করে?*

লুসিয়ানো ঘুরতেই চার চোখের মিলন ঘটল।

এক সেকেণ্ড সময়ও লাগল না, সুপার ন্যাচারাল ভ্যাকুয়াম টিউব যেন ঢুকে গেল মারিয়ার মস্তিষ্কের মাঝে, গ্রাস করল তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি, শুষে নিল তাকে। মারিয়া শুধু লুসিয়ানোর চোখ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না। মারিয়া জানেও না কোন্ অমোঘ আকর্ষণে সে পা বাড়িয়েছে ভ্যাম্পায়ারের দিকে।

অবশেষে বন্ধ হলো রিং, এক মুহূর্ত নীরবতা। আকুল হয়ে কানে মোবাইলটা চেপে ধরে থাকল দীপ।

'কে?' অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল কম্পিত একটি কণ্ঠস্বর।

'মি. ডি'সুজা, প্লিজ, আমি দীপ বলছি। আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে।' কোনওরকম বিরতি ছাড়া, এক

নিঃশ্বাসে কথাগুলো বেরিয়ে এল। 'আমরা এ ক্লাবে আটকা পড়ে গেছি। আমাদেরকে বাঁচান।'

'আমি দুঃখিত,' রেমো ডি'সুজার কণ্ঠে নির্জলা আতঙ্ক। 'আমি আসতে পারব না।'

'পারবেন না কেন? আপনার তো গাড়ি আছে। টান মেরে আসতে আধঘণ্টাও লাগবে না।'

'দীপ, প্লিজ। আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করো। তোমার বন্ধু হাবলু এখন ওদের দলে। ও আমাকে হামলা করেছিল–'

'ও, মাই গড,' বমি বমি ভাব হলো দীপের, তীব্র হতাশা গ্রাস করল ওকে। হাবলু। সেই গলিমুখ...

'...কিছুক্ষণ আগে। প্রায় মারা যেতে বসেছিলাম আমি। এখন যদি বাইরে যাই ও আমাকে–'

'আপনি না এলে লুসিয়ানো আমাদেরকে খুন করবে,' চিৎকার দিল দীপ। 'মারিয়াও আছে আমার সঙ্গে। মারিয়ার ওপরও লোকটার নজর পড়েছে...'

দীপ কথা শেষ করতে পারল না, ও প্রান্তের লাইন কেটে দেয়া হলো।

একত্রিশ

...ভ্যাম্পায়ারের বাহু ডোরে বাঁধা পড়ল মারিয়া। মিউজিক দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওর নার্ভাস সিস্টেমে যেন ঢুকে পড়েছে, ওকে তালে তালে নাচতে উদ্দীপ্ত করছে...

...লুসিয়ানো ওকে জড়িয়ে ধরে আছে, ভ্যাম্পায়ারের হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে ওর পিঠ, চুল, অনুভূতিটা অবিশ্বাস্য, উদ্দাম হয়ে

উঠছে মারিয়া, হৃদয় ব্যাকুল হয়ে চাইছে লোকটাকে, লোকটা যে-ই হোক বা ওকে নিয়ে যা খুশি করুক তাতে আপত্তি নেই মারিয়ার। সে শুধু ওকে নিবিড়ভাবে কাছে চাইছে...

কাজটা এত সহজে হয়ে যাবে ভাবেনি লুসিয়ানো দ্য লুসিফার। সে শুধু ওদেরকে চেয়েছে এবং পেয়ে গেছে। মেয়েটা এ মুহূর্তে তার শরীরের সঙ্গে শরীর ঘষছে। স্পর্শটা উপভোগ করছে। তার সুখের অনুভূতিতে হঠাৎ বাগড়া এল।

'কুত্তার বাচ্চা!' ষাঁড়ের মত গর্জন ছাড়ল দীপ। মারিয়ার কাঁধ চেপে ধরে টান মারল নিজের দিকে। মুখ তুলে চাইল লুসিয়ানো। চমকে গেছে। একই সঙ্গে ভীষণভাবে জ্বলে উঠেছে চোখ।

রেমো ডি'সুজা ফোন কেটে দেয়ার পরে দীপের হুঁশ হয় ওর পাশে মারিয়া নেই। পাগলের মত সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল বান্ধবীকে। হঠাৎ দেখতে পায় ওকে। লুসিয়ানোর সঙ্গে। শরীরের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে শরীর। দেখেই বুঝতে পারে মারিয়াকে সম্মোহন করে ফেলেছে ভ্যাম্পায়ার। ওকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে। রাগে, ক্ষোভে ব্রহ্মতালু জ্বলে ওঠে তার, ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসে।

'কুত্তার বাচ্চা!' দ্বিতীয়বার গালি দিল দীপ। ঘুষি তুলল।

কল্পনাতীত গতিতে ভ্যাম্পায়ারের হাত সাপের মত ছোবল মারল, মাঝপথে চেপে ধরল দীপের মুষ্টিবদ্ধ হাত। তীব্র ব্যথার একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল ওর কব্জি এবং বাহুতে, সেখান থেকে নেমে এল শিরদাঁড়ায়।

'হুট করে রেগে যেতে নেই,' হাসিমুখে ভর্ৎসনা করল লুসিয়ানো। 'বড়দের গায়ে হাত তোলা মানা, জানো না?'

আরও জোরে দীপের হাত মুচড়ে দিল ভ্যাম্পায়ার, টান

মারল নিজের দিকে। ব্যথাটা অসহ্য। দীপ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মেঝেয়, গোঙাচ্ছে। 'তুমি এখানে আমাকে খুন করতে পারবে না,' কোনওমতে বলল ও।

'আমি তো তোমাকে এখানে খুন করব বলিনি!' কপট বিস্ময়ে বলল লুসিয়ানো। 'আমি তোমাদেরকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। সঙ্গে থাকবে রেমো ডি'সুজা। তোমাদের তিনজনকে নিয়ে–' মারিয়ার গায়ে অশ্লীলভাবে শরীর ঠেসে ধরল লুসিয়ানো। 'আমার ধারণা আমার সময়টা কাটবে দারুণ।'

'কাজেই এখানে থাকো যদি তোমার বান্ধবীকে জীবিত দেখতে চাও।' বিকট মুখভঙ্গি করল ভ্যাম্পায়ার, প্রচণ্ড এক চাপ দিল দীপের হাতে। মট করে একটা শব্দ হলো, অসম্ভব যন্ত্রণায় হাঁ হয়ে গেল দীপের মুখ, কান ফাটানো মিউজিক ওর চিৎকারটা গিলে নিল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল দীপের।

'কী করবে না করবে সেটা তোমার ব্যাপার, দীপ,' উপসংহার টানল ভ্যাম্পায়ার। 'অবশ্য তোমার হাতে সুযোগ তেমন নেইও তবু তোমার জায়গায় হলে আমি সুবোধ ছেলে সেজে থাকতাম।'

হাত ছেড়ে দিল লুসিয়ানো, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দীপ। খিকখিক হাসল ভ্যাম্পায়ার, মারিয়াকে নিয়ে পা বাড়াল দরজায়।

'বাস্টার্ড!' মনে মনে লুসিয়ানোকে গালি দিল দীপ। তারপর হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করে ওদের পেছনে দৌড়াল।

এমন সময় পেছন থেকে এক জোড়া বলশালী হাত চেপে ধরল ওর কাঁধ।

'অবশেষে পেলাম তোমাকে, খোকা!' গল্প করার সুরে বলল গেটম্যান। 'তোমাদেরকেই এতক্ষণ খুঁজছিলাম।' তার চেহারায়

আমুদে ভাব। 'তা তোমার গার্লফ্রেণ্ডটি কই?'

'আমিও ওকেই খুঁজছি,' চেঁচাল দীপ। **'আমাকে ছাড়ুন!'**

'আমার সঙ্গে ফাজলামো কোরো না, খোকা,' সতর্ক করে দিল পালোয়ান। 'জানোই তো তোমাকে কাগজের মত ছিঁড়ে ফেলতে পারি।'

'কিন্তু...' দীপ চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওদেরকে দেখতে পেল; ডান্স ফ্লোরের কিনারে। দরজা থেকে হাত দশেক দূরে। 'ওই তো!' উন্মাদের মত হাত ছুঁড়ে দেখাল। 'মারিয়াকে ওই ব্যাটা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে বাঁচান!'

'ধরে নিয়ে যাচ্ছে?' অবাক হলো পালোয়ান।

'জি,' বলল দীপ। 'ওই লোকটা একটা শয়তান।'

'ঠিক আছে। এসো আমার সঙ্গে। দেখি কে কাকে ধরে নিয়ে যায়।'

প্রকাণ্ড সামুদ্রিক যন্ত্রের মত ভিড় ঠেলে এগোল সে দীপকে নিয়ে। দ্বিতীয় আরেকজন গেটম্যান, প্রথমজনের তুলনায় খর্বকায় এবং পাতলা, তবে এ-ও কুচকুচে কালো এবং মাথায় অল্প চুল, ওদের দিকে হাত নেড়ে দরজা আটকে দাঁড়াল। কারণ ইতিমধ্যে তাকে পালোয়ান গেটম্যান মারিয়া ও লুসিয়ানোকে দেখিয়ে ইশারায় কিছু একটা বলেছে।

তবে তারপরই ভেঙে পড়ল নরক।

'মাফ করবেন,' বলল রোগা-পাতলা দারোয়ান। সে দরজা ছেড়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে এসেছে। 'আপনার সঙ্গের এই মেয়েটির সাথে দু'একটি কথা বলব আমি।'

'না,' বলল লুসিয়ানো। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাবার মূডে নেই সে এখন। তাকে দোরগোড়ায় থামানো হবে, এটা নিশ্চয় চিত্রনাট্যে লেখা ছিল না। রাগ উঠে গেল তার।

'আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না,' বলল দারোয়ান। 'এ

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতেই হবে। আমাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোকের মত অপেক্ষা করুন নইলে–’

নইলে কী করবে বলার আর সুযোগ পেল না দারোয়ান কারণ ততক্ষণে চেহারা বদলে যেতে শুরু করেছে লুসিয়ানোর। সেদিকে তাকিয়ে জবান বন্ধ হয়ে গেল লোকটার।

প্রথমে বদলে গেল চাউনি। বেড়ালের মত হয়ে উঠল চোখ, মণি দুটো লম্বালম্বিভাবে চেরা এবং অমানুষিক দৃষ্টি সেখানে। ওপরের ঠোঁট মোচড় খেয়ে ওপর দিকে উঠে গেল, ফুলে উঠল নিজের চোয়াল, চামড়া টানটান।

বেরিয়ে এল ভয়াল দুই শ্বদন্ত। তার ত্বক হয়ে উঠল ধূসর, গিরগিটির মত। খুলির সঙ্গে লেপ্টে গেছে আঠালো রুপোর মত চুল।

তার ডান হাতটা ছোবল মারল দারোয়ানের মুখে। এতই দ্রুত, লোকটা একটা ঝলক দেখল শুধু। ক্ষুরের মত ধারাল পাঁচটা নখের থাবা খেল সে গলায়। ছিঁড়ে গেল কারটয়েড ধমনী, ফিনকি দিয়ে বেরুল তাজা খুন। টকটকে লাল রক্ত আশপাশের অন্তত আধডজন মানুষকে রঞ্জিত করে তুলল, সাত ফুট ব্যাসার্ধের মধ্যে সকল নৃত্যরত তরুণদের চোখে এবং হাতের বিয়ারের ক্যানে ছিটকে পড়ল রক্ত।

প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। ডান্স ফ্লোরের লোকজনের ভয়ার্ত চিৎকার এবং ভিডিওতে প্রদর্শিত ভুরানের গানের মিউজিক মিলে মুহূর্তে সৃষ্টি হলো নারকীয় অবস্থা।

লোকটা লাশ হয়ে পড়ে গেছে মেঝেতে, এখনও গরু জবাই করার মত রক্ত বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। তার লাশ দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকজন যেন ছুটে পালাতেও ভুলে গেছে। প্রকাণ্ডদেহী গেটম্যান ছুটে এল, সঙ্গে দীপ। এ লোকের পাশে ওকে ইঁদুরের মত লাগছে। দেখে মজা লাগল লুসিয়ানোর।

দ্যাখো, খোকা, ভালো করে দ্যাখো, মনে মনে বলল সে। *তোমার মরণ এত সহজে এবং সুন্দরভাবে হবে না।*

পালোয়ান ঝাঁপিয়ে পড়ল লুসিয়ানোর ওপর। এতে অবশ্য তার কিছুই হলো না। বিন্দুমাত্র টলল না পর্যন্ত। আস্তে করে মারিয়াকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডান হাতটা আবার তুলল সে।

আবার ছোবল মারল সাপ। তবে থাবাটা গেটম্যানের গলা কাটল না, প্রবল শক্তিতে চেপে ধরল। অবর্ণনীয় ব্যথায় বেলুনের মত ফুলে উঠল পালোয়ানের মুখ, চোখে অবিশ্বাস। হাই তোলার ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট।

ভ্যাম্পায়ারের নখ বসে গেল গেটম্যানের গলায় এবং যেন পাঁচটা ধারাল পেরেক একসঙ্গে খচ করে ঢুকে গেল মাংসের ভেতর।

আবার লাল রক্তের ফোয়ারা ছুটল।

'চমৎকার,' আপন মনে বিড়বিড় করল লুসিয়ানো। মানুষজন এবারে ভয়ার্ত চিৎকার করে ছুটে পালাতে লাগল। গেটম্যানের ঘাড়ের পাঁচটি গর্ত এবং গর্ত থেকে কুলকুল করে বেরিয়ে আসা রক্তপাতের দৃশ্য সন্তুষ্ট করল ভ্যাম্পায়ারকে।

তাকে অবলীলায় শূন্যে তুলতে লাগল লুসিয়ানো। দু'শ' পাউণ্ড ওজনের লাশটাকে এক ঝটকায় মাটি থেকে এক ইঞ্চি উপরে তুলে ফেলল সে। তারপর দুই ইঞ্চি। যখন মাটি থেকে এক হাত ওপরে ঝুলছে নির্জীব শরীরটা, লুসিয়ানো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ডান্স ফ্লোরে।

ওখানে কেউ নাচানাচি করছে না।

ওখানে আর কেউ নেই।

সবাই ছুটে পালাচ্ছে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল দীপ। প্রথম ঝাপটাটা ওর ওপর দিয়ে গেছে। আতঙ্কিত লোকজনের ধাক্কায় মাটিতে ছিটকে পড়েছিল ও। মেঝেতে প্রচণ্ড জোরে ঠুকে গিয়েছিল মাথা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জ্ঞান হারায় ও। কিন্তু সিধে হতে পারছে না দীপ। কাঁধের ওপর কয়েক মণ ওজনের একটা বোঝা। কে যেন উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে ওর ঘাড়ে।

'হঠো! তফাৎ যাও!' চেঁচাল দীপ। ওর ঘাড়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল এক হস্তিনী। সে-ও জ্ঞান হারিয়েছে। হস্তিনীকে ঘাড়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে রীতিমত কসরত করতে হলো দীপকে। চোখ পিটপিট করল ও। সামনের দৃশ্যটা দেখে উড়ে গেল প্রাণ।

রাস্তায়, ফুটপাতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো জিপ গাড়ি। ওটার কালো দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দরজার পাশে লুসিয়ানো। ওর দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসছে। পেছনের জানালা দিয়ে মারিয়ার মাথাটা পরিষ্কার চেনা গেল।

এবং দেখা গেল হরর হাবলুকেও। ওকে এতদিন সবাই ঠাট্টা করে 'হরর হাবলু' বললেও আজ ওকে সত্যি হরর-এর মতই লাগছে। লুসিয়ানো এক লাফে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসেছে, দীপের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত ভঙ্গিতে চোখ টিপল হরর হাবলু। নড়ে উঠল গাড়ি।

'না!' গলা ফাটাল দীপ। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে ছুটল গাড়ির পেছনে। কিন্তু কালো জিপ ততক্ষণে মোড় ঘুরতে শুরু করেছে। দেরি করে ফেলেছে দীপ, অনেক দেরি হয়ে গেছে ওর...

বত্রিশ

দ্রুত হাতে চামড়ার সুটকেসটা গোছাচ্ছেন রেমো ডি'সুজা। প্যান্ট শার্ট ছাড়াও একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিচ্ছেন সঙ্গে। তাঁর ঘরটা প্রায় একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হরর হাবলু ঘুরের যতটা না ক্ষতি করেছে তারচেয়ে বেশি বারোটা বাজিয়েছেন রেমো সাহেব নিজে। ড্রয়ার খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছেন, জানালায় এখনও ক্রুশগুলো ঝুলছে। হিস্টিরিয়া নামের হারিকেন ঝড়ে পর্যুদস্ত রেমো। এ ঘরে আর জীবনেও ফিরছেন না তিনি। বিড়বিড় করে বারবার আউড়ে চলেছেন *আমাকে এখান থেকে বেরুতে হবে, আমাকে এখান থেকে বেরুতে হবে।* প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির রেমো ডি'সুজা। এ ঘরে আর এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই তাঁর। ভাগ্যিস বাড়িঅলা বাড়িতে নেই। নইলে জানালা ভাঙার কৈফিয়ত দিতে তাঁর জান পেরেশান হয়ে যেত। রাতটি কোনও বন্ধুর বাসায় কাটিয়ে কাল সকালের কোচে ঢাকা চলে যাবেন রেমো সাহেব। শীঘ্রি তিনি বরিশালমুখো হচ্ছেন না।

যখন কলিংবেল বাজতে শুরু করল ভয়ে এমন আঁতকে উঠলেন তিনি, হাতের জিনিস ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেয়।

'মি. ডি'সুজা!' ভেসে এল চিৎকার। **'দরজা খুলুন!'**

গায়ের শক্তিতে কেউ বেল টিপে ধরে রেখেছে। প্রচণ্ড জোরে বাজছে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। কিন্তু তিনি দরজা না খুললে এবারে ভয়ানক জোরে ঘুষি মারতে লাগল কপাটে। সে শব্দে দাঁত কপাটি লাগার জোগাড় মি. ডি'সুজার।

কণ্ঠটি কেমন চেনা চেনা ঠেকল, তবে ভয়ে বেসামাল

ডি'সুজা ঠিক বুঝতে পারলেন না কে তাঁর নাম ধরে ডাকছে। ভীরু পায়ে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

'কে?' সরু, কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন মি. ডি'সুজা।

'আমি দীপ। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিন!' ঘুষি মারা বন্ধ হলো, ধপ্ করে একটা শব্দ হলো। দরজার ওপাশে হেলান দিয়ে বসেছে দীপ। রেমো ডোর নবে হাত দিলেন, মোচড় দিয়ে খুলতে গিয়েও খুললেন না।

'কী চাও তুমি?' প্রশ্ন করলেন তিনি। 'আমি খুব ব্যস্ত আছি।'

'ও মারিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে!' হাহাকার করে উঠল দীপ। তার বেদনা ইনজেকশনের সুইয়ের মত বিঁধল ডি'সুজার বুকে। 'ও মারিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে। ওকে আমাদের বাঁচাতে হবে। আপনার সাহায্য দরকার। এবং...ওহ, গড, এই ছাতার দরজাটা খুলুন।'

দরজার এপাশ থেকে রেমো ডি'সুজা শুনতে পেলেন কাঁদছে দীপ। তিনি দরজায় হেলান দিয়ে গভীর দম নিলেন। বুকে খচ করে কাঁটার খোঁচা লাগল। হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ? এক সেকেণ্ডের জন্য আশঙ্কাটা জাগল মনে, পর মুহূর্তে দূর করে দিলেন ভাবনাটা।

আমি পারব না, ভাবলেন তিনি। চিন্তাটা তাঁকে অসুস্থ করে তুলল। কাপুরুষতার জন্য নিজের ওপরে ঘৃণা হলো।

অন্ধকারের ওই অসীম শক্তির কাছে তিনি সম্পূর্ণ অসহায়।

'চলে যাও, দীপ,' শান্ত গলায় বললেন তিনি। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। আমি দুঃখিত-'

দরজায় বিকট আওয়াজ হলো। লাথি মেরেছে দীপ। লাফ মেরে পিছিয়ে এলেন ডি'সুজা, ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

'ইউ বাস্টার্ড!' গর্জন ছাড়ল দীপ। **'অকম্মার ধাড়ি কাপুরুষ**

হারামজাদা!'

দরজা থেকে সরে এসেছেন রেমো ডি'সুজা, লঘু পায়ে এগোলেন বেডরুমে। মাথায় চাদর এবং বালিশ চাপা দেবেন কি না ভাবছেন। তা হলে আর দীপের গালিগালাজ শুনতে হবে না। যে চরম সত্য কথাগুলো দীপ বলেছে তা তিনি না শুনলেই বরং আরাম বোধ করতেন।

'জানেন আমি এখন কী করব? আমি এখন ওখানে যাব। একা একা। লুসিয়ানো আমাকে হত্যা করবে। তারপর কী ঘটবে আপনি ভালোই জানেন, না?'

দীপ কথা বলছে আর ফোঁপাচ্ছে। রেমো সাহেব ক্রমে পিছিয়ে যাচ্ছেন, প্রতিটি পদক্ষেপ আগের চেয়ে ভারী ঠেকছে।

'আমি আপনার কাছে আসব। আমি আপনার কাছে ফিরে আসব কারণ আপনার মত একটা ভীতু, কাপুরুষের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।'

ফোঁপানি থেমে গেল। আবার এক প্রচণ্ড লাথি দরজায়। এরপর দীপের জুতোর শব্দ। ছুটে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে।

রেমো ডি'সুজা, গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলার, হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন, কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। কাঁদছেন তিনি দীপের জন্য, মারিয়ার জন্য, হরর হাবলু এবং নিজের জন্য।

কিন্তু এ কান্নাটা বড় দেরিতে কাঁদলেন তিনি।

তেত্রিশ

অন্ধকার। কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে, ধূসর একটা রঙের দিকে উঠে যাচ্ছে। ওর শরীরের নিচে শক্ত শক্ত কী যেন, মনে হচ্ছে কাঠের একটা ভেলা, স্রোতে বনবন করে ঘুরছে।

দূর থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত একটি মিউজিক, মন উজাড় হওয়া, দেহ মাতাল করা, রক্তে বান ডাকার মত উথাল পাথাল যন্ত্রসঙ্গীত। ওর শরীরের শিরায় শিরায় ঢুকে যাচ্ছে ছন্দ। ওকে জাগিয়ে তুলছে...

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল মারিয়া, ঝিমঝিম করছে মাথা। পিটপিট করে তাকাল চোখ মেলে, দেখল সত্যি চারপাশটা আঁধারে ঢাকা। ওর শরীরের নিচে সত্যি শক্ত কাঠের স্পর্শ, হ্যাঁ, ওটা কাঠের মেঝে, বহু প্রাচীন।

মিউজিকটাও আছে। তবে দূরাগত নয়। কাছেই মৃদুলয়ে বাজছে কোথাও। মিউজিকটা পছন্দ হলো মারিয়ার। অন্ধকার এবং স্বপ্নের মত একটা মিউজিক। মৃদু হেসে ছাদের দিকে তাকাল ও।

'ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল, মাই লিটল প্রেশাস ওয়ান,' নরম মসৃণ একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'তোমাকে আমি পেয়েছি। আমি এজন্য খুবই খুশি।'

'আমি অপেক্ষা করছি।'

আশ্চর্য, কোনও ভয় লাগছে না মারিয়ার! ও জানে না ও কোথায়। কে কথা বলল তাও ধারণা নেই। ওর চিন্তাভাবনাগুলো কেমন জট পাকিয়ে গেছে।

ঘরে মোম জ্বলছে। আলোর একমাত্র উৎস। তবে তাতে আঁধার দূর হয়েছে সামান্যই। *রোমান্টিক*, ভাবল মারিয়া, দেয়াল এবং ছাদে তিরতির করে কাঁপছে ছায়া, দৃশ্যটা উপভোগ করছে সে। *অমনই লাগছে নিজেকে, রোমান্টিক।*

যেন বিশেষ কিছু ঘটতে চলেছে।

অকস্মাৎ বিশেষ একটি ছায়া ঝুঁকল মারিয়ার ওপর, দীর্ঘ, পুরুষালি কাঠামো, অত্যন্ত শক্তিশালী। 'এসো, আমার সঙ্গে নাচো,' বলল সে। আঁধারের লম্বা একটি ফালি প্রসারিত হলো

ওর দিকে।

স্মৃতি ফিরে পেল মারিয়া এবং কেঁপে উঠল ভয়ে।

মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছে। কুমারী মেয়েদের প্রতি সে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে। ওরা জানে না ওরা কী হারাচ্ছে, এদের মধ্যে সুরক্ষিত হয়ে রয়েছে শক্তি। মারিয়ার মধ্যেও আছে। এ শক্তি শুষে নিতে চায় সে। তার আর তর সইছে না। এ মেয়েকে নিয়ে সে অনেক মজা করবে। সে এ শহরে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তাতে বাগড়া দিয়েছে দীপ। এ শহর তার জন্য আর নিরাপদ নয়। যখনই নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দেখে ওখান থেকে কেটে পড়ে লুসিয়ানো। আর নিরাপত্তার খাতিরেই সে কোথাও বেশিদিন থাকে না। ইউরোপ থেকে বাংলাদেশে চলে আসার একমাত্র কারণ তার এই নিরাপত্তার অভাব। ইটালির সিয়েনা শহরের বিখ্যাত ও ধনাঢ্য মানুচ্চি পরিবারের সন্তান সে। সবাই তাকে চিনত। কিন্তু ভ্যাম্পায়ার পরিচয়টা কেউ জানত না। কিন্তু যখন জেনে গেল সাথে সাথে গা ঢাকা দিয়েছে লুসিয়ানো। বিশ্বস্ত ভৃত্য জুলিয়ান গনজালভেজকে নিয়ে চলে এসেছে বাংলাদেশে। তবে তার আগে সে ছিল ভারতে। ইটালি থেকে পালাবার সময়ই ঠিক করে রেখেছিল দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশে, নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে বাস করবে। এজন্য টার্গেট হিসেবে তার প্রথম পছন্দ ছিল জনাকীর্ণ দেশ ভারত। আর দিল্লির ইতিহাস তাকে খুব টানত। এজন্য লুসিয়ানো দিল্লি চলে আসে। ব্রিটিশ এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসায়ীর পরিচয়ে প্রকাণ্ড ওই শহরে বেশ ভালোই ছিল সে। কুকর্মগুলোও চালিয়ে যাচ্ছিল মনের সুখে। কিন্তু *দ্য ডেইলি দিল্লি* পত্রিকার এক অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক যখন তার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং সিবিআইসহ স্থানীয় প্রশাসন

খোঁজ খবর নিতে শুরু করে, ওখানে আর বেশিদিন থাকা সমীচীন মনে করেনি লুসিয়ানো। চাট্টিবাট্টি গুটিয়ে এক রাতে পগারপার হয়েছে দিল্লির ইন্দিরা রোডের নিবাস থেকে। চলে এসেছে ঢাকা। বিশ্বের অষ্টম জনবহুল শহর।

ছদ্মবেশ ধরতে জুড়ি নেই লুসিয়ানোর। ঢাকায় সে নিজেকে অ্যান্টিক ডিলারের পরিচয় দিয়ে গুলশানে সাগরেদ জনিকে নিয়ে বছরখানেক ঝামেলামুক্ত অবস্থাতেই ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ভাষা ইন্সটিটিউটে বাংলা ভাষার ওপর কোর্স করেছে। বাংলাদেশে থাকতে হলে বাংলা ভাষাটা তো ভালো জানতেই হবে। ঢাকায় সে দু'একটা খুনখারাবি যে করেনি তা নয় তবে ওখানে তাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়েছে। কিন্তু ঢাকায় যখন তার পক্ষে আর বাস করা সম্ভব হচ্ছিল না, পরিচয় ভাঁড়িয়ে চলে আসে বরিশালে। সে বুঝতে পারছিল ওই মেগা সিটি আর তার জন্য নিরাপদ নয়। তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয় মফস্বল কোনও শহরে গিয়ে থাকবে। মফস্বল শহরগুলো হয় নিরিবিলি, এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ঢিলেঢালা। নিজের উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করা যায় সহজেই। বরিশালে সে কিছুদিন ছিল, ওখানেও গোপনে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। কিন্তু পরিচয় ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা দেখামাত্র দ্রুত ওখানকার পাততাড়ি গুটিয়েছে লুসিয়ানো।

পাদ্রিশিবপুর শহরটি তার খুবই পছন্দ হয়েছিল। এখানে আরও বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল তার কারণ এখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। দীপ ঠিকই সন্দেহ করেছে। লাশগুলো সে ফেলে দিয়ে আসত বরিশালে যাতে পুলিশের তার ব্যাপারে কিচ্ছুটি সন্দেহ না হয়। কিন্তু তার সমস্ত পরিকল্পনা গুবলেট হতে চলেছে এই দীপ ছোকরার জন্য। আজ রাতে ওর জন্যেই জনসম্মুখে দুটো খুন করতে হয়েছে তাকে।

হত্যাকাণ্ডদুটো না ঘটালেও পারত সে। কিন্তু মেজাজটা কিছুতেই সামলে রাখতে পারেনি। তবে নতুন এসেছে বলে ডিস্কো ক্লাবে কেউ হয়তো তাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু এর কাফফারা লুসিয়ানোকেই দিতে হবে। এ শহর থেকে কালকেই কেটে পড়বে সে। এবং তার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য চরম শাস্তি পেতে হবে চালিয়াত ছোঁড়াটাকে। আর এজন্যই সে দীপের গার্লফ্রেণ্ডকে ধরে এনেছে। এ তার জন্য শুধু আনন্দের উৎসই নয়, হবে একটি অস্ত্রও।

'মারিয়া, আমি তোমাকে চাই,' ঘরঘরে গলায় বলল লুসিয়ানো দ্য লুসিফার।

'এসো আমাকে নাও।'

তারপর সে নাচতে শুরু করল।

বিছানায় শুয়ে আছে মারিয়া। সিঁটিয়ে রয়েছে আতঙ্কে। যা ঘটছে তা অস্বীকার করতে চাইলেও পারছে না। অন্ধকার থেকে একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ওই চোখ...

লুসিয়ানোর সমস্ত শক্তির উৎস ওই চোখ জোড়া, বুঝতে পারছে মারিয়া। অন্য দিকে তাকাতেও পারছে না ও। জ্বলজ্বলে সোনালি একটা আভা আছে চোখের তারায়, দেখে ভয় লাগে না বরং আকর্ষণ করে...

'না,' ফিসফিস করল মারিয়া। এবারো ও সচেতন, ওকে সম্মোহিত করতে পারেনি লুসিয়ানো। কিন্তু ধীরে ধীরে মারিয়াকে নিজের দখলে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

'না,' পুনরাবৃত্তি করল মারিয়া, এবারে আগের চেয়ে জোরে।

এবং জোর করে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অন্য দিকে।

'ওহ, মারিয়া,' ভ্যাম্পায়ারের কণ্ঠ গুনগুন করে উঠল।

'অমন করে না। এই যে আমি। তোমাকে উত্তেজিত করে তুলতে চাইছি আমি...'

'স্টপ ইট!' গুঙিয়ে উঠল মারিয়া, শক্ত করে বুজে আছে চোখ। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছে ভ্যাম্পায়ার এখনও মিউজিকের তালে নাচছে, পা প্রায় স্পর্শ করছে না মেঝে।

'এমন মজার সময়ে ওরকম করে না, লক্ষ্মীটি,' কণ্ঠটি এখন আরও কাছে, যন্ত্রসঙ্গীত ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে।

আতঙ্ক, কামনা এবং মুগ্ধতা যেন সব একসঙ্গে জড়িয়ে নিল মারিয়াকে।

'মারিয়া...' শিসের মত ফিসফিস আওয়াজটা ঠিক ওর মাথার ওপরে।

কাঁদতে শুরু করল মারিয়া, শরীরটাকে বলের মত গোল করে, কুঁকড়ে নিয়ে সরে গেল একপাশে। ওর শীত লাগছে। ভয়ও করছে।

'মারিয়ায়ায়া...' ওর ওপরে ক্রমে ঝুঁকে এল সে, প্রায় বায়বীয় একটা স্পর্শ অনুভূত হলো সুঠাম নিতম্ব রেখায়...

'নাআআআ!' চিৎকার দিল মারিয়া, গড়ান দিল। দেয়ালে বাড়ি খেল পিঠ। ওখানে হেলান দিল সে, হাঁপাচ্ছে, চোখ বেয়ে গড়াচ্ছে জল।

'ওহ্, কামন,' প্ররোচিত করার সুরে বলল ভ্যাম্পায়ার, হাসছে। এই প্রথমবার তার শ্বদন্ত দেখতে পেল মারিয়া। লম্বা, ধারাল দাঁত। আর চোখ জোড়া তার সোনালি আভা হারিয়েছে। লাল কয়লার মত ধকধক জ্বলছে।

'আমাকে বাধা দিয়ো না। বরং নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করো...'

'আমাকে একা থাকতে দাও, গড ড্যাম ইউ! আমি চাই...'

'তোমার মাকে চাইছ?'

‘না, দীপকে চাইছি, শয়তান!’ ফুঁপিয়ে উঠল মারিয়া, মুষ্টিবদ্ধ হাত। চেয়ে আছে ভ্যাম্পায়ারের দিকে, তবে সম্মোহিত না হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ‘আমি দীপকে চাই, তোমাকে নয়।’

‘দীপকে তুমি পাবে,’ হিসিয়ে উঠল সে, কণ্ঠস্বর এখন আর মধুমাখা নয়, ‘তোমার সঙ্গে আমার আগে কাজ শেষ হোক, তারপর।’

‘ইউ বাস–’ বলতে গেল মারিয়া, আর ঠিক সে মুহূর্তে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল লুসিয়ানো দ্য লুসিফার। মারিয়ার ঘাড়ে কামড় বসাল সে।

চৌত্রিশ

রেমো ডি’সুজার বাসায় গিয়ে খামোকা সময় নষ্ট হয়েছে দীপের। হতাশা এবং ক্লান্তিতে ওর হাঁটার গতিও কমে গেছে। রূপাতলী বাস স্টেশনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে ও পকেটে পয়সা নেই বলে। ওখান থেকে পাদ্রিশিবপুরে বাস, টেম্পু এবং মোটর সাইকেল যাতায়াত করে। আসার সময় বরিশাল অভিমুখী একটি মোটর সাইকেল পেয়ে গিয়েছিল বলে রক্ষা। মোটর সাইকেলে আরোহী থাকে দুইজন। চালক এবং যাত্রী। ২৮ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে ৪০ মিনিটও লাগেনি। চালক ঝড়ের গতিতে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে তার বাহন চালিয়েছিল বলে। আসার সময় মারিয়ার কাছ থেকে একশ’ টাকা ধার করেছিল দীপ ভ্যাম্পায়ারটা ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার আগে। তবে এখন কীভাবে বাড়ি ফিরবে ও জানে না। লাস্ট ট্রিপের কোনও টেম্পু অথবা মোটর সাইকেল যদি পেয়ে যায়...মাকে নিয়ে চিন্তা নেই।

মা হাসপাতালে গেছেন নাইট ডিউটিতে। কাল সকাল আটটার আগে ফিরবেন না। তিনি জানেন তাঁর গুণধর পুত্রটি বাসায় বসে এখন ঘুমাচ্ছে অথবা বই পড়ছে। তাঁর কল্পনাতেও নেই কী ভয়ানক বিপদে আছে তাঁর ছেলে। তিনি জানেন না মারিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে পিশাচ লুসিয়ানো। তাঁকে বললেও এ কথা তিনি বিশ্বাস করবেন না কিছুতেই। লুসিয়ানো তো তাঁর চোখে হিরো। সে কি কখনও ভ্যাম্পায়ার হতে পারে? কিন্তু রেমো ডি'সুজা তো মারিয়ার বিপদের কথা জানেন। অথচ দীপের ডাকে একবারও সাড়া দিলেন না।

ব্যাটা জাহান্নামে যাক, রেমো সাহেবকে অভিশাপ দিল দীপ। অমন কাপুরুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সত্যি অধিকার নেই। ব্যাটা লুসিয়ানো দ্য লুসিফারের কবলে পড়লে বুঝত কত ধানে কত চাল।

নিজের চিন্তায় মগ্ন দীপ ভয়ানক চমকে উঠল তার পাশে ক্রিইইইচ শব্দে ব্রেক কষে একটি গাড়ি থামতে। তাকিয়ে দেখে রেমো ডি'সুজা। তাঁর লক্কড় ঝক্কড় ভক্সওয়াগনে বসে আছেন। পরনে *মধ্যরাতের আতঙ্ক*-র ক্ল্যাসিক ভ্যাম্পায়ার কিলারের পোশাক। তিনি গাড়ির দরজা খুলে নেমে এলেন। হাতে চামড়ার অতি পুরানো একটি থলে।

'রেমো ডি'সুজা,' সপ্রতিভ ভঙ্গিতে কুর্নিশ করলেন তিনি, 'তোমার সেবায় নিয়োজিত এবং অন্ধকারের শক্তি সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।'

দীপ বুঝতে পারছে না ও খুশিতে অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি আনন্দে লাফাবে। রেমো ডি'সুজা ওকে সাহায্য করতে স্বয়ং চলে আসবেন, এ ওর কল্পনাতেও ছিল না। কথা বলার চেষ্টা করল, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল অস্পষ্ট আওয়াজ, 'হাহ্!'

'হাঁ করে দেখছ কী?' বললেন তিনি। 'চলো রওনা হই।

এত রাতে গাড়ি ঘোড়া তো কিছুই পাবে না। আমার এই ভক্সওয়াগনই ভরসা।' তিনি ইশারায় ওকে গাড়িতে উঠতে বললেন। দীপ তাঁর জামার আস্তিন চেপে ধরল।

'এক মিনিট,' বলল ও। 'হঠাৎ করে মত বদলালেন কী মনে করে? ঘণ্টাখানেক আগে আপনি দরজা পর্যন্ত খুলতে চাননি। এখন ভ্যাম্পায়ারের মুখোমুখি হতে পরোয়া করছেন না। ঘটনা কী?'

মুখ বিকৃত করলেন ডি'সুজা। 'ঘটনা কিছুই না। স্রেফ বিবেকের তাড়না।' একটু থেমে যোগ করলেন, 'তা ছাড়া ভাবছিলাম আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ছাড়া ভ্যাম্পায়ার হত্যা করতে পারবে না তুমি। তোমার কাছে তো অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই, নেই প্রস্তুতি। তাই...'

চামড়ার থলেটি খুলে দেখালেন তিনি। ভেতরে ভ্যাম্পায়ার হত্যা করার নানান জিনিসপত্র, অনেকগুলো অলংকৃত ক্রুশ, চামড়ার ছোট ছোট খোপে বেশ কয়েকটি ক্রিস্টালের শিশি এবং প্রচুর পরিমাণে কাঠের গোঁজ ও হাতুড়ির মত লম্বা লাঠি।

দীপ সশ্রদ্ধচিত্তে একবার দেখল রেমো সাহেবকে, তারপর একটি বড়সড় ক্রুশ বের করে আনল থলে থেকে। ক্রুশটা এতই বড়, ব্যাডমিন্টন খেলা যাবে। সঙ্গে কতগুলো কাঠের গোঁজ।

'জনির কী হবে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ও তো ভ্যাম্পায়ার নয়, মানুষ। ওকে মারব কীভাবে?'

মুচকি হেসে পকেট থেকে একটি থার্টি এইট ক্যালিবারের রিভলবার বের করলেন তিনি। নিকেল প্লেট বসানো অস্ত্র। ডি'সুজা অস্ত্রটি উঁচিয়ে ধরে মুখ দিয়ে 'গুড়ুম গুড়ুম' শব্দ করলেন। 'এ জিনিস জনির কপালে আঙুর ফল ঢুকে যাওয়ার মত গর্ত তৈরি করে দেবে। তবে রিভলবারেও কাবু না হলে বুঝব ও-ও মানুষ নয়।'

হাসিতে ভরে গেল দীপের মুখ। 'আপনি সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন, না?'

'আশা তো করি,' গাড়ির দিকে ফিরলেন রেমো ডি'সুজা। 'এখন চলো?'

ওরা উঠে পড়ল গাড়িতে।

পটুয়াখালি-বরিশাল মহাসড়ক ধরে সারা শরীর কাঁপিয়ে ঝক্কড় ঝক্কড় শব্দ করতে করতে তাঁর লঝ্ঝর গাড়িটি ছোটালেন রেমো ডি'সুজা। রাত প্রায় দুটো বাজে। একেবারেই সুনসান রাস্তা। হু হু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জ্যাকেটের কলার তুলে দিল দীপ, তাকাল রেমো সাহেবের দিকে।

'আপনি কী করে জানলেন আমাকে এখানে পাবেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মারিয়ার এমন বিপদে তুমি নিশ্চয় বাড়ি ফিরবে ভাবলাম,' জবাব দিলেন মি. ডি'সুজা। 'আর পাদ্রিশিবপুর যেতে হলে রূপাতলী বাসস্ট্যাণ্ড ছাড়া তো গতি নেই।'

'ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন,' বলল দীপ। 'নইলে কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।'

'মনে মনে আমাকে নিশ্চয় অনেক গালাগাল দিচ্ছিলে,' রাস্তায় চোখ রেখে বললেন রেমো ডি'সুজা।

বিব্রত বোধ করল দীপ। 'না, না। গালিগালাজ করব কেন? তবে আপনার ওপর রাগ হচ্ছিল।' দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ও। 'আচ্ছা, রিভলবারটি জোগাড় করলেন কোত্থেকে?'

'ওটা আমার নিজের জিনিস। লাইসেন্স করা। একদম খাঁটি মাল।'

'আর ভ্যাম্পায়ার হত্যার জিনিসগুলো খাঁটি তো?' সংশয় প্রকাশ পেল দীপের কণ্ঠে।

'কর্মক্ষেত্রেই প্রমাণ পাবে খাঁটি না ভেজাল,' গম্ভীর মুখে

বললেন রেমো ডি'সুজা।

রেমো সাহেব মাইণ্ড করেছেন বুঝতে পেরে এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না দীপ। তিনি যখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এসেছেন, ওগুলো নিশ্চয় খাঁটি জিনিসই হবে। সে চুপ হয়ে গেল। তাকাল রাস্তায়। নভেম্বর মাসের শেষাশেষী। বেশ কুয়াশা পড়েছে। হেডলাইটের আলো চিরে দিচ্ছে কুয়াশার পর্দাটাকে। দু'পাশের রাস্তায় অন্ধকারে কালো প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে গাছপালার সারি। সেদিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল দীপের।

রাত তিনটা নাগাদ ওরা পৌঁছে গেল গন্তব্যে। লুসিয়ানোর বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগোল প্রকাণ্ড এবং অশুভ চেহারার বাড়িটির দিকে।

পোর্টিকোয় কাউকে দেখা গেল না। কবরের মত নিস্তব্ধ। শুধু ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ গভীর নীরবতার শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। ওরা সিঁড়ি বাইতে লাগল। আধাআধি উঠে এসেছে, একটা কণ্ঠ ভয়ানক চমকে দিল দু'জনকে।

'স্বাগতম,' বলল কণ্ঠ। 'বাহ্, বাহ্, এত জলদি? ডিনারে অতিথির আগমন ঘটলে আমি খুশিই হই।'

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরুল লুসিয়ানো দ্য লুসিফার, দাঁড়াল সিঁড়ির শেষ মাথায়। পরনে কালো আলখেল্লা। তাকে খুবই ভীতিকর লাগছে।

দারুণ, মনে মনে বললেন রেমো ডি'সুজা। *অবিকল যেন আঁধারের কোনও দেবতা!*

লুসিয়ানো যেন রেমো সাহেবের মনের কথাটি পড়তে পারল। হাসল। 'হ্যাঁ, সত্যি,' বলল সে। 'আসল *মধ্যরাতের আতঙ্কে* আপনাকে সুস্বাগতম। আজ আপনি হবেন আমাদের অতিথি হোস্ট। আর আমাদের এই তরুণ বন্ধুটি হবে দর্শক।'

ভ্যাম্পায়ারের কণ্ঠে ভীতিকর এমন কিছু ছিল, রেমো ডি'সুজার বুক হিম হয়ে গেল। ঢোক গিললেন তিনি। তাঁর সমস্ত আত্মবিশ্বাস এবং সাহস নিমিষে উধাও। কাঁপা হাতে চামড়ার থলের ভেতর থেকে একটি ক্রুশ বের করলেন।

'হঠো, শয়তানের অভিশপ্ত সন্তান!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তবে চিৎকারটা চিঁচিঁ আওয়াজের মত শোনাল।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল লুসিয়ানো। হো হো করে হাসতে থাকল। হাসতে হাসতে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে।

হঠাৎ হাসি থেমে গেল তার। চেহারায় ফুটল তীব্র ব্যঙ্গ। বলল, 'বেশ, আপনার ক্রুশের শক্তি কতখানি দেখা যাক।'

হাত বাড়াল সে, একটানে ডি'সুজার মুঠো থেকে কেড়ে নিল ক্রুশ।

'হুমম,' ক্রুশে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল সে, 'রদ্দি জিনিস। এ মাল দিয়ে কাজ হবে না।'

জোরে চাপ দিল সে ক্রুশে, তার মুঠোর ভেতরে টুকরো হয়ে গেল ওটা। ভাঙা অংশ ছুঁড়ে মারল ডি'সুজার মুখে।

'আমার ধারণা,' বলল ভ্যাম্পায়ার দৃঢ় গলায়, 'আপনার মধ্যে আসল জিনিসটিরই অভাব আছে, মি. ডি'সুজা। আর তা হলো বিশ্বাস।'

বিস্ফারিত এবং বিমূঢ় দৃষ্টিতে লুসিয়ানোর দিকে তাকিয়ে আছেন রেমো ডি'সুজা। পিছিয়ে যেতে লাগলেন। দীপ সভয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ছুট দেবে। ওর মনের ভেতর থেকে কেউ বলে উঠল *না, গর্দভ, এভাবে তুমি পালিয়ে যেতে পার না।*

লুসিয়ানোর দিকে ঘুরল দীপ, নিজের ক্রুশটা ঝট করে বাড়িয়ে দিল ভ্যাম্পায়ারের মুখ লক্ষ্য করে।

'পিছু হঠো,' হিসিয়ে উঠল দীপ।

পিছিয়ে যেতে গিয়ে সিঁড়িতে হোঁচট খেল লুসিয়ানো,

শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল চোখ।

'পিছু হঠো!' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল দীপ, টের পাচ্ছে ওর ভেতরে শক্তির ফল্গুধারা বইতে শুরু করেছে। ভ্যাম্পায়ার ক্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে, দীপের হাতে ধরা ক্রুশের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। 'ওকে নাগালে পেয়েছি, আংকেল!' চেঁচাল দীপ।

কোনও সাড়া নেই।

'আংকেল?'

ঘুরল দীপ রেমো ডি'সুজা কোথায় গেলেন দেখার জন্য। তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর থলেটা পড়ে আছে সিঁড়িতে।

'আংকেল!' শেষবারের মত চিৎকার দিল দীপ, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ভ্যাম্পায়ারের দিকে...

প্রচণ্ড এক ঘুষি খেল মুখে।

দীপ দেখল জনি গনজালভেজ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। ঘুসিটা সে-ই মেরেছে। ঘুসির চোটে গোটা শরীর ঘুরে গেছে দীপের, দড়াম করে পড়ে গেল নিচে, ভয়ানক জোরে মাথাটা ঠুকে গেল সিঁড়িতে। দুঃস্বপ্নের আঁধার গ্রাস করল ওকে।

পঁয়ত্রিশ

জান বাজি রেখে ছুটছেন রেমো ডি'সুজা। পেছনে ফেলে রেখে আসছেন কিং হাউসের হরর। দীপদের আলোকিত বাড়িটিকে মনে হলো বাতিঘর। তিনি এক লাফে ওদের বাড়ির সিঁড়ি টপকালেন, ধাক্কা মারতেই খুলে গেল সদর দরজা। ভেতরটা সুনসান, নীরব। 'মিসেস রডরিক! মিসেস রডরিক!' দরজাটা পেছনে বন্ধ করে হাঁক ছাড়লেন ডি'সুজা।

কেউ সাড়া দিল না।

দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন রেমো সাহেব মিসেস রডরিকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা হাট করে খোলা, ভেতরে মৃদু আলো জ্বলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ওদিকে ছুটলেন তিনি, রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল জুতোর শব্দ।

বিছানায় শুয়ে আছেন মাধুরী রডরিক, ডি'সুজার দিকে পেছন ফেরা, বালিশে ছড়িয়ে রয়েছে দীঘল কালো কেশ। ডি'সুজা দ্রুত কদম বাড়ালেন তাঁর দিকে, স্বস্তি অনুভব করছেন শরীরে।

'থ্যাংক, গড, মিসেস রডরিক!' বললেন তিনি। 'আপনাকে পেয়ে গেলাম। আপনার ছেলে ভয়ানক বিপদে আছে...'

'জানি আমি,' বলে উঠল বিছানায় শোয়া মানুষটা। কণ্ঠটা কেমন অচেনা ঠেকল ডি'সুজার কাছে। এ গলা শোনার আশা করেননি তিনি। মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লেন যন্ত্রচালিতের মত, হৃৎস্পন্দন প্রায় থেমে যাওয়ার জোগাড়।

'খুব মজার না ব্যাপারটা?' বলল কণ্ঠ।

বিছানায় উঠে বসল শরীরটা।

এবং গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে লাগলেন রেমো ডি'সুজা।

ওটা হরর হাবলু এবং সত্যিকারের হাবলু ওটা নয়। মুখের গড়ন ঠিকই আছে, তবে চেনা চেহারাটা এখন একদম অচেনা লাগছে। তার কপালে ক্রুশের ঘা এখনও দগদগ করছে। গোটা অবয়বে দর্শনীয় বলতে শুধু ওটুকুই। বাকিটুকু এক কথায় ভয়ঙ্কর। ওর চেহারা রক্তশূন্য, ধূসর-সাদা। গাল দুটো ঢুকে গেছে ভেতর দিকে, ফলে হনুজোড়া প্রকটভাবে ঠেলে বেরিয়েছে। চোখ নয়, কোটরে জ্বলজ্বল করছে লাল নিয়নের

ছানি। এমন ভয়াল চাউনি, রেমো সাহেবের ঘাড়ের নিচের সবগুলো চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল।

হাবলুর নিচের ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চারটে দাঁত। এর মধ্যে দুটো শ্বদন্ত, বিকট এবং ভয়ানক, বাকি দাঁতদুটো বাঁকা হয়ে আছে। মাথাটা কাত করে চোখ টিপল সে, কপালের ওপর থেকে খসে পড়ে গেল নকল কালো চুল।

'দীপের মা নাইট ডিউটিতে গেছেন,' টেনে টেনে বলল ভ্যাম্পায়ার। টেবিলে একটা বইয়ের ওপর পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া এক টুকরো কাগজ তুলে নিল সে। কর্মজীবী মায়েরা তাঁদের সন্তানদেরকে এ ধরনের চিঠি লিখে রাখেন। 'তিনি বলছেন দীপের ডিনার ওভেনে রেডি আছে। দারুণ না?'

রেমো ডি'সুজার গলা দিয়ে বেড়ালের মত মিউমিউ ধ্বনি বেরিয়ে এল, তিনি পিছিয়ে যেতে শুরু করেছেন।

'আপনি এখনও বেঁচে আছেন কেন?' বলল হরর হাবলু এবং লাফ মারল বিছানা থেকে।

দৌড় দিলেন রেমো ডি'সুজা। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে তাঁর, অন্ধের মত ছুটছেন। সাঁ করে বেরিয়ে এলেন দরজা দিয়ে, দৌড়াচ্ছেন প্যাসেজওয়ে ধরে, সিঁড়ি দেখতেও পেলেন না, যখন দেখলেন ততক্ষণে ঘটে গেছে দুর্ঘটনা।

মাধুরীর শখ প্রাচীন সামগ্রী সংগ্রহ করা। তিনি সিঁড়ির মাথার খালি জায়গায়, মেঝেতে নানান জিনিস সাজিয়ে রেখেছেন। এর মধ্যে একটি টেবিলও আছে। প্রাণভয়ে ছুটতে থাকা রেমো টেবিলটা লক্ষ করেননি। সোজা গিয়ে আছড়ে পড়লেন ওটার গায়ে। টেবিল তো ভাঙলই সে সঙ্গে শখের চিনামাটির কিছু সংগ্রহেরও বারোটা বাজল। রেমো কার্পেটে ঢাকা মেঝেতে পড়ে রইলেন চিৎ হয়ে। তাঁর ডান নিতম্বে ব্যথায় আগুন ধরে গেছে। নড়াচড়া করতে পারছেন না।

এমন সময় দোরগোড়ায় উদয় হলো দানব।

ওটা একটা নেকড়ে, লাল চোখ, বিশাল, গায়ে কুৎসিত ধূসর লোম, চোয়াল বেয়ে ঝরে পড়ছে লালা। দ্রুত এগিয়ে এল দানব, শিকার ধরার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ী।

রেমো ডি'সুজা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। টেবিলের ভাঙা একটা পায়া চোখে পড়ল। মুখটা ভয়ানক চোখা। ডান হাতে ওটা চেপে ধরলেন তিনি, নিয়ে এলেন মুখের সামনে...

...পিঠ কুঁজো করে লাফ দিল নেকড়ে। চোখ বুজে ফেললেন ডি'সুজা, চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে, টেবিলের তীক্ষ্ণধার পায়া বাগিয়ে ধরেছেন সামনে...

...পায়ার মাথায় কী যেন একটা বিঁধল, পড়পড় করে ঢুকে গেল ভেতরে। প্রবল উৎসাহে জিনিসটা আরও সামনের দিকে ঠেসে দিলেন ডি'সুজা, তাকালেন চোখ মেলে...

...আর্তনাদ করে উঠল নেকড়ে-দানব, ডিগবাজি খেয়ে পড়ল রেলিং-এ। ওটার বুকে পুরোপুরি গেঁথে গেছে টেবিলের পায়া। দানবের পতনের চোটে পায়াটা হাত থেকে ছিটকে গেল রেমো সাহেবের। মাধ্যাকর্ষণের টানে, ভারসাম্য হারিয়ে রেলিং-এর ওপর থেকে দশ ফুট নিচে পড়ে গেল নেকড়ে। থ্যাচ করে বিশ্রী একটা শব্দ হলো।

আতঙ্ক কাটিয়ে ধাতস্থ হতে কমপক্ষে দশ সেকেণ্ড সময় লাগল রেমো ডি'সুজার। ভাঙা রেলিং থেকে নিচে তাকালেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছেন মেঝেতে পড়ে থাকা জীবন্ত দুঃস্বপ্নকে।

মেঝেতে রক্তের মধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খাচ্ছে নেকড়ে। বুকে এখনও বিঁধে রয়েছে টেবিলের পায়া।

টলতে টলতে সিধে হলেন ডি'সুজা, ঠেস দিলেন দেয়ালে।

তারপর গায়ে শক্তি জড়ো করে নামতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে। আবার কোনও হামলা হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত ও সতর্ক মন। *এরা নেকড়েতে রূপ নিতে পারে,* ভাবছেন তিনি। *বাদুড়, ইঁদুরসহ যে কোনও বিকট এবং বীভৎস প্রাণীর চেহারায় এরা অনায়াসে ঘটাতে পারে রূপান্তর।*

তবে গোঁজ দিয়ে কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারলে এদের মৃত্যু অনিবার্য, উপসংহার টানলেন তিনি। *যদি তা না হয় তো আমার মরণ অনিবার্য।*

শেষ সিঁড়িতে নেমে এলেন ডি'সুজা। নিজের মনকে আদেশ করলেন এখন তাঁকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। তবে কাজটা সহজ নয়। ভঙ্গুর লাগছে নিজেকে, শয়তানের সঙ্গে লড়াই করে বিধ্বস্ত।

তবু তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং জমে গেলেন।

অদৃশ্য হয়ে গেছে দানব।

ওহ, মাই গড! দ্রুত এক কদম সামনে বাড়লেন। তারপর আরেক পা। 'না, প্লিজ,' গুঙিয়ে উঠলেন ডি'সুজা।

আঠালো রক্তের সরু একটা ধারা দেখা যাচ্ছে কার্পেটে। নেকড়েটা যেখানে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে ধারাটা শুরু হয়ে চলে গেছে সিঁড়ির নিচের অন্ধকারে। ওদিক থেকে আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। অমানুষিক একটা চিৎকার।

মৃত্যু-চিৎকার।

আগের চেয়ে দ্রুত হলো ডি'সুজার পদক্ষেপ, কী দেখতে পাবেন ভেবে ভীত, যদিও নিজের জানের পরোয়া তিনি করছেন না। ওখানে একটা কুঠুরি দেখা গেল, সিঁড়ির মতই গভীর এবং প্রশস্ত। তিনি দূরত্ব অতিক্রম করলেন।

এবং পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দৃশ্যটির দিকে।

কুঠুরির জিনিসটা না নেকড়ে না হরর হাবলু। তবে দুটোর

সমন্বয়ে রোমহর্ষক একটা প্রাণীতে রূপান্তর ঘটেছে তার। ওটার প্রকাণ্ড চোয়াল জোড়া দেখা যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, সুচালো কান এবং কালো নাক সবই ঠিক আছে। তবে মাথায় চুল নেই। দেখাচ্ছে রাস্তার বিশালদেহী ঘেয়ো কুকুরের মত, জায়গায় জায়গায় লোম উঠে গিয়ে কুৎসিত লাগছে। ওটার চোখ বোজা– জানে না ডি'সুজা ওকে লক্ষ করছেন– তোবড়ানো গাল দিয়ে ঝরছে অশ্রু।

তবে সবচেয়ে ভীতিকর ওটার হাত জোড়া। ওগুলো আর মানুষের হাত বলার জো নেই। আঙুলগুলো বাঁকানো এবং ভীষণ লম্বা, বড় বড় নখ আর গাছের ডালের গাঁটের মত হাড্ডিসার গাঁট ফুলে উঠেছে।

টেবিলের পায়াটা দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে আছে না মানুষ না জন্তুটা, সুচালো পায়া ওটার বুকের দেড় ফুট গভীরে ঢুকে গেছে।

হাত জোড়া চেষ্টা করছে পায়াটা বের করে আনতে।

'ঈশ্বর!' বললেন রেমো ডি'সুজা।

আর তখন চোখ মেলে চাইল দানব।

যন্ত্রণায় ওটার চোখ কুঁচকে গেল, পিটপিট করে তাকাচ্ছে সামনে দাঁড়ানো মানুষটির দিকে। টেবিলের পায়া ধরে বেহুদা টানাটানি করছে সে। জানে বুকের ভেতরে গেঁথে থাকা এ জিনিস দুর্বল শরীরে আর বের করে আনা সম্ভব নয়। মারা যাচ্ছে সে, প্রবল যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হচ্ছে তার।

রেমো ডি'সুজার মনে হলো ওটা যেন তাঁকে কী বলতে চাইছে। গলা দিয়ে ঘরঘরে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। তিনি ওটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মনে হলো এতে খুশি হয়েছে না মানুষ না জন্তুটা। ডি'সুজা ভাবলেন এটা হরর হাবলুর

কোনও চাতুরী নয় তো? শেষ মুহূর্তে হয়তো থাবা মেরে তাঁর গলার রগ ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করবে! তবু তিনি ওটার সামনে থেকে সরে গেলেন না। কারণ ওটার চোখে অশুভ সে ছায়াটা আর নেই। বরং যন্ত্রণাকাতর মুখটা দেখে তাঁর মায়াই লাগছে।

'কিছু বলবে তুমি?' ফিসফিস করলেন ডি'সুজা। আরও সামনে এগিয়ে গেলেন। নাকে ঝাপটা মারল ওটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বোটকা গন্ধ। 'বলো। আমি তোমার কথা শুনব।'

হাত বাড়িয়ে দিল দানব।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলেন ডি'সুজা, মস্তিষ্কের কোথাও বেজে উঠল সতর্ক ঘণ্টা। তারপর তিনিও বাড়িয়ে দিলেন হাত, মৃত্যুপথযাত্রী দানবের আঙুলের ডগা থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে রইল তাঁর আঙুল।

শেষবারের মত ঘরঘর করে উঠল দানব।

ও কী বলছে এবারে বুঝতে পারলেন রেমো ডি'সুজা।

আমি দুঃখিত...

মুখে কথাটি বললেন তিনি, নেকড়ে-দানব সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। তারপর আস্তে আস্তে ওটার চোখ থেকে মুছে গেল জীবনের আলো।

দু'জনের আঙুলের ডগা একে অপরকে স্পর্শ করল।

মারা গেল হরর হাবলু।

মারা যাওয়ার পরে, মিনিট-খানেকের মধ্যে আবার মানুষের চেহারা ফিরে পেল হাবলু। তবে ওই দৃশ্যটি দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন না রেমো ডি'সুজা। তিনি আগেই রওনা হয়ে গেছেন দরজার উদ্দেশে।

দীপ ও মারিয়ার সাহায্য দরকার।

রেমো ডি'সুজা মনে মনে প্রার্থনা করলেন ওদেরকেও যেন

তাঁর হত্যা করতে না হয়।

ছত্রিশ

দীপকে কাঁধে ফেলে নিজের বেডরুমে ঢুকল লুসিয়ানো। তারপর ওকে একটা বস্তার মত দড়াম করে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। ব্যথায় চোখে কয়েক সেকেণ্ড লাল নীল তারা দেখল দীপ। লুসিয়ানো ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'এ ঘরটা চেনা চেনা লাগছে, তাই না, দীপ? তোমার অবশ্য এ কামরা চেনা উচিত। এটা আমার বেডরুম। এখানে অনেক মজা করেছি আমি...তবে কী কী মজা করেছি তা নিশ্চয় তোমাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, আছে কি? অবশ্য আমার ঘরের কিছু পরিবর্তনও করেছি।' সে জানালার দিকে হাত তুলে দেখাল। জানালায় কাঠের তক্তা লাগানো হয়েছে।

দীপের বামপাশে কী যেন নড়ে উঠল। ও ঘুরে তাকাল। মারিয়া। শরীর গুটিয়ে একটা বলের আকৃতি পেয়েছে। কাঁপছে থরথর করে। ওর গায়ে জ্যাকেট নেই। শার্ট ছেঁড়া এবং রক্তাক্ত। দেখে মনে হচ্ছে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। দীপের গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল মারিয়ার দিকে।

'তুমি ওকে চেয়েছিলে, ওকে পেয়ে গেছ,' কাঁধ ঝাঁকাল লুসিয়ানো। রোষকষায়িত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল দীপ।

চোখ টিপল লুসিয়ানো। 'এনিথিং ফর ইউ, বেবস।'

দীপ পরম আদরে মারিয়াকে বাহুডোরে বাঁধল। 'মারিয়া...' ফিসফিস করে ডাকল।

মারিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন। সুপার ন্যাচারাল ট্রান্সফরমেশনের

মাঝখানে রয়েছে সে। একটু পর পর কেঁপে উঠছে শরীর। চোখের তারায় কাঁপন, লেন্সপরা মণি জোড়া চকচকে। মুখখানা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত, শিশুর মত নড়ছে, কিছু যেন চুষতে চাইছে। হাতের থাবা বারবার বন্ধ হচ্ছে এবং খুলে যাচ্ছে।

'ইউ বাস্টার্ড!' দীপের চোখে তীব্র ঘৃণা এবং বেদনা। হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠা চুল্লির মত বিস্ফোরিত হলো। চিৎকার করে বলল, **'ইউ বাস্টার্ড! কেন? ওকে কেন?'**

অক্ষিগোলকে চোখের মণি ঘোরাল লুসিয়ানো। 'তুমি আমাকে অনেক জ্বালিয়েছ, দীপ। তাই ভাবলাম তোমার বিশেষ শাস্তি হওয়া উচিত। কাজেই ওর পরিবর্তন স্বচক্ষে উপভোগ করার সুযোগ তোমাকে দেয়া হয়েছে।' শয়তানি হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'তুমি এখন হয় ওকে হত্যা করবে নতুবা ওর প্রথম শিকারে পরিণত হবে। একটি চমৎকার জিনিস বাছাইয়ের জন্য এরচেয়ে স্বাধীনতা আর পাবে কোথায়?'

লাফ দিল দীপ, বুনো জানোয়ারের রাগে অন্ধ হয়ে হামলা চালাল লুসিয়ানোকে। কিন্তু মাছি তাড়ানোর কায়দায় এক থাবড়া মারল লুসিয়ানো ওকে। থাবড়া খেয়ে মেঝেয় ছিটকে পড়ে গেল দীপ।

'ঠিক আছে, আমাকে খুন করো,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল সে। 'আমাকে মেরে তোমার মনের জ্বালা মেটাও। কিন্তু দয়া করে ওকে ছেড়ে দাও।'

হাসল লুসিয়ানো। 'আহ্, কী প্রেম! তোমার কথাই সই। আগে তোমাকে খুন করব আমি। তারপর ওকে ছেড়ে দেব।'

নাটকীয় ভঙ্গিতে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল লুসিয়ানো। তারপর বিছানার পাশের টেবিল থেকে কী একটা তুলে নিয়ে লোকে যেমন তার কুকুরের দিকে বিস্কিট ছুঁড়ে দেয়, সেরকমভাবে দীপের দিকে হাতের জিনিসটা ছুঁড়ে দিল।

‘এটা তোমার দরকার হতে পারে,’ বলল সে। ‘ঠিক ভোর হওয়ার আগে।’

মেঝেয় ঠক করে পড়ল ওটা, গড়িয়ে চলে এল দীপের পায়ের কাছে। দু’ফুট লম্বা, ভয়ঙ্কর দর্শন একটা কাঠের গোঁজ।

‘নাআআআ...’ গুঙিয়ে উঠল দীপ লুসিয়ানো দরজায় তালা মেরে চলে যাচ্ছে দেখে। সে মারিয়ার দিকে টেনে নিয়ে এল শরীর, নিজের জ্যাকেটটি খুলে ওকে পরিয়ে দিল। তারপর ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে রাখল, যেন মারিয়া অসুস্থ একটি শিশু। দীপের নগ্ন বাহু ঘষা খেল মেয়েটির ঠোঁটে, সে জিভ বের করে চামড়া চাটল। জিভ শিরিষ কাগজের মত খসখসে।

‘নাআআআ!’

হলঘরের মাঝামাঝি এসেছে লুসিয়ানো, দীপের হাহাকার তার কানে মধুর সঙ্গীত হয়ে বাজল।

বাইরে দাঁড়িয়ে লুসিয়ানোর বাড়িতে তীক্ষ্ণ নজর বোলাচ্ছেন রেমো ডি’সুজা। বাড়ি তো নয় যেন নির্জলা আতঙ্কের বাসভূমি। প্রতিটি মুহূর্তে অশুভ এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। তিনি নিঃশব্দে এ বাড়িতে প্রবেশ করলেন। হলঘরের শেষ মাথায়, বেসমেন্টের সিঁড়ির দরজাটি ভেজানো। নিচে থেকে অস্পষ্ট কথাবার্তা ভেসে আসছে। ঘুরলেন তিনি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

ল্যাণ্ডিং-এ এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন রেমো। সিঁড়ির সামনে তোরণ-সমান কাচের প্রকাণ্ড এক জানালা। এখন অন্ধকার বলে তোরণের রঙ কালচে দেখাচ্ছে। কিন্তু শীঘ্রি– ঘড়ি দেখলেন তিনি, চারটা বাজে– সূর্য উঠে যাবে এবং রোদ ঢুকবে কাচের মাঝ দিয়ে, রঙের বন্যায় ভেসে উঠবে জানালা।

রেমো আশা করলেন ওই দৃশ্যটি দেখার জন্য ততক্ষণ তিনি বেঁচে থাকবেন।

দোতলার হলওয়েও আঁধারে ঢাকা। শুধু রাস্তার বাতির আলোর ফালি ঢুকছে জানালা দিয়ে। তাতে অন্ধকার দূর হয়েছে সামান্যই। তিনি পা টিপে টিপে এগোলেন, প্রতিটি দরজার নব ধরে নিঃশব্দে মোচড় দিলেন, বুকের পাঁজরে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

চার নম্বর দরজার নব খুলল না। তালা মারা। 'দীপ?' ফিসফিসিয়ে ডাকলেন রেমো, আস্তে নক্ করলেন।

মুখ তুলে চাইল দীপ। 'আংকেল?' মৃদু গলায় সাড়া দিল, 'ডি'সুজা আংকেল এসেছেন?'

'হুঁ,' দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল ভোঁতা গলা।

'আংকেল, মারিয়াকে পেয়েছি। ও আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু ওর সাহায্য দরকার। আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যান।'

এক মুহূর্ত নীরবতা।

'আংকেল?' *মাই গড, ওঁর যদি কিছু হয়ে যায়...*

'দীপ, দরজা ভাঙতে হবে। তুমি যত পারো চেঁচামেচি করো। শব্দ করো, কিছু ভাঙো। যা খুশি করো।'

'আচ্ছা,' সায় দিল দীপ।

নিচতলায়, বেসমেন্টে ব্যস্ত লুসিয়ানো এবং জনি। একটা বাক্স খালি করল ওরা। লুসিয়ানোর কফিন থেকে খানিকটা ধুলো এনে ছড়িয়ে দিল বাক্সে। ধুলোর সঙ্গে মেশাল মাটি। এ শহরের মাটি। মারিয়ার জন্য।

জনি লুসিয়ানোর দিকে তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

'বন্ধু,' বলল লুসিয়ানো, 'ভুলে যেয়ো না মেয়েটা স্থানীয়,' হাসিতে ফেটে পড়ল সে। তার সঙ্গে যোগ দিল জনি।

এমন সময় শোনা গেল চিৎকার।

এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল কাজ। মিষ্টি, হিমশীতল হাসিতে ভরে গেল ভ্যাম্পায়ারের মুখ। ওপরের দিকে মুখ তুলে মাথা ঝাঁকাল।

'কেউ বোধহয় ঘুম থেকে জেগে উঠেছে,' বলল সে।

রেমো ডি'সুজার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে প্রথমবারের চেষ্টাতেই সফল হলেন। কাঁধ দিয়ে সজোর ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। তিনি এক ছুটে ঢুকে গেলেন ঘরে।

মেঝেতে, শরীরটা গোল করে রেখেছে মারিয়া, ঘামে ভিজে সপসপে, থেকে থেকে কাঁপছে।

দীপ কথা বলল, আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর। 'ভ্যাম্পায়ারটা ওকে কামড়ে দিয়েছে, আংকেল। ও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন কী করব?'

রেমো সাহেব মারিয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। চোখের পাতা টেনে দেখলেন। স্ফীত মণির চারপাশটা লাল। বিকট হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেছে পেছন দিকে, ছেদন দন্ত সুচালো হয়ে উঠতে শুরু করেছে। নিঃশ্বাসে পচা পানির গন্ধ, মুখের কোণে দুর্গন্ধযুক্ত লালা গড়াচ্ছে।

আলখেল্লার গোপন পকেট থেকে কাচের একটি শিশি বের করলেন রেমো ডি'সুজা। খুললেন ছিপি। দীপের দিকে তাকালেন।

'ওর মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরো। এ জিনিসটা ওকে খাওয়াতে হবে।'

দীপ সন্দেহের চোখে দেখল শিশি। 'কী ওটা? সেই ভুয়া মন্ত্রপূত পানি নয়তো?'

মাথা নাড়লেন রেমো। 'না, বললাম না এটা খাঁটি জিনিস।

ওকে ধরে রাখো। ধস্তাধস্তি করতে পারে।'

দীপ মারিয়ার মাথা চেপে ধরল দু'হাত দিয়ে। রেমো সাহেব কাচের শিশিটি সাবধানে নিয়ে এলেন মারিয়ার মুখের কাছে। মেয়েটির শরীরের প্রতিটি পেশী শক্ত হয়ে গেল। রেমো শিশিটি উপুড় করে ধরলেন।

অন্ধ-আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেল মারিয়া, পাগলের মত ছুঁড়তে লাগল হাত-পা। দীপ এমন জোরে ঘুষি খেল মুখে, ছিটকে গেল টেবিলের গায়ে। লাফ মেরে পিছিয়ে গেলেন রেমো ডি'সুজা, অল্পের জন্য মারিয়ার একটা থাবা খামচি দিতে পারেনি তাঁর চোখে।

তাঁর হাত থেকে খসে গেছে শিশি।

মন্ত্র পড়া পবিত্র পানি গলগল করে পড়ে ভিজিয়ে দিল কার্পেটি। হাত এবং হাঁটুতে ভর করে বুনো জন্তুর মত ঘুরল মারিয়া, কিছু দেখছে না সে, শ্বাপদের মত হিসহিস করছে।

তার একটা হাত লাগল ভেজা কার্পেটে।

গগনবিদারী চিৎকার দিল মারিয়া, ফোস্কা পড়ে গেছে চামড়ায়। চিৎ হয়ে পড়ে গেল ও, যন্ত্রণায় বিকৃত চেহারা, তীব্র ব্যথায় অন্য সবকিছু বিস্মৃত হয়েছে। তার মন একটা শূন্য জায়গা, থকথকে কাদার অতল গর্ত, শুধু একটা শব্দই সেখানে আবর্তিত হচ্ছে বারবার...

...এবং সে শব্দটি হলো, লুসিয়ানোওওওওওওও...

হাতের বেলচা থেমে গেল, মাথাটা একটু কাত করল লুসিয়ানো দ্য লুসিফার কৌতূহলের ভঙ্গিতে। প্রভুর চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ লক্ষ করে থেমে গেছে জনির কাজও।

'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল সে।

রসিকতার ভঙ্গিতে হাসল লুসিয়ানো। 'আমাদের একজন মেহমান এসেছে।'

সাঁইত্রিশ

মারিয়ার দিকে তাকাল দীপ। একটু শান্ত হয়েছে মেয়েটা। মেঝেতে মাদকাসক্ত রোগীর মত পড়ে আছে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে মৃদু গোঙানির আওয়াজ। দীপ কথা বলল, যেন অনেকদূর থেকে ভেসে এল কণ্ঠ।

'আমাদের কি কিছু করার নেই?' প্রশ্ন করল ও। 'ওকে কি আমরা বাঁচাতে পারব না?' তাকাল রেমো ডি'সুজার দিকে। 'নাকি অনেক দেরি হয়ে গেছে?'

ভারী নিঃশ্বাস ছাড়লেন রেমো। 'জিন্দালাশের শক্তি ভর করেছে ওর ওপর। এ শক্তির কবল থেকে ওকে মুক্ত করতে হবে। আর এ শক্তির উৎস লুসিয়ানো। না, এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি, দীপ। ভোর হওয়ার আগেই ধ্বংস করতে হবে লুসিয়ানোকে, নষ্ট করে দিতে হবে ওর সমস্ত ক্ষমতা।

'ওকে হত্যা করতে হবে, সঙ্গে ওর সহকারীকে। এ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই আমাদের।'

দীপের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'তা হলে আমি করছিটা কী? এখানে কি রঙ্গ করতে এসেছি? যীশাস ক্রাইস্ট! আমি জানি ওই হারামজাদাকে মরতেই হবে! আমি শুরু থেকেই জানি।'

রেমো বললেন, 'কিন্তু আমি জানতাম না। আর এদেরকে যে হত্যা করতে হবে সে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে আমার সময় লেগেছে। আমি শুরুতে ব্যাপারটা বিশ্বাসও করিনি।'

দীপ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রেমো সাহেবের দিকে। এ নিয়ে আর তর্ক করতে সায় দিচ্ছে না মন। গভীর একটা দম

নিল ও। 'এখন বিশ্বাস হলো তো?'

মাথা দোলালেন মি. ডি'সুজা। 'হুঁ। আমাদের অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে কিন্তু সময় খুব কম।'

ঘড়ি দেখলেন তিনি। চারটা পঁয়ত্রিশ।

আশা করলেন এর মধ্যে সেরে ফেলতে পারবেন আসল কাজ।

লুসিয়ানোর রেডরুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা, পা রাখল হলঘরে। রেমো সাহেব আঁধারেও ক্ষিপ্র পায়ে হাঁটছেন। দীপ তাঁর পেছনে, ঘামে ভেজা হাতের মুঠোয় কাঠের গোঁজ। সিঁড়ির দিকে নিঃশব্দে এগোচ্ছে দু'জনে।

ওরা জানে না ওদের পিছু নিয়েছে ভয়াল ছায়া। ক্রমে কাছিয়ে আসছে ছায়াগুলো।

নিতম্বে হাত রেখে সিঁড়ি গোড়ায় ওদের জন্য হাসিমুখে অপেক্ষা করছিল জুলিয়ান গনজালভেজ। বেড়ালের মত হাসি।

'বেশ, বেশ, বেশ,' হাসতে হাসতে বলল সে। 'এখানে কী ঘটছে?'

রেমো দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'এখানে ঘটনার অবসান ঘটছে, মি. গনজালভেজ।' ঝট করে তাঁর হাতে চলে এল পয়েন্ট থার্টি এইট, রিভলবারটি জনির মাথায় তাক করলেন তিনি।

বিন্দুমাত্র ভয় পেল না জনি। 'ঠিকই বলেছেন আপনি,' সে আগে বাড়ল।

রিভলবারের সেফটিক্যাচ অফ করলেন রেমো। 'সাবধান! আমি কিন্তু এটা ব্যবহার করব।'

জনির মুখের হাসি একটুও ম্লান হলো না। সে এগিয়ে আসতেই লাগল। আর মাত্র পাঁচ হাত দূরে।

চার হাত। রেমো হিসিয়ে উঠলেন, 'থামুন বলছি।' তাঁর চুলের মাঝ দিয়ে সরু ঘামের রেখা বেয়ে পড়ছে।

আরেক কদম বাড়ল জনি। হাসছে। সোজা তাকিয়ে আছে রেমো সাহেবের দিকে। আরেক কদম। এত কাছে চলে এসেছে যে হাত বাড়িয়ে তাঁর ঘাড়টা ধরে শুকনো ডালের মত মট করে ভেঙে দিতে পারবে।

'প্লিজ...' অনুনয় করলেন ডি'সুজা জনিকে আর এগিয়ে না আসার জন্য।

শেষ কদম ফেলল জনি, বাড়িয়ে দিল হাত, ডি'সুজার কলার চেপে ধরল।

ট্রিগার টিপে দিলেন রেমো ডি'সুজা।

ওদের পেছনের অন্ধকারে একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হলো।

আটত্রিশ

এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল পুরো ঘটনা। ছোট ঘরে রিভলবারের বিস্ফোরণ কামান গর্জনের বিকট শব্দ তুলল। দীপের ঘাড়ের পেছনের সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে সামনের দৃশ্যটা দেখে।

ওদের পেছনের আঁধার ঘন হলো, নিরেট একটা আকার পেতে যাচ্ছে।

রেমো ডি'সুজা এসব লক্ষ করলেন না। তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। যেন জায়গায় জমে গেছেন জনির অবস্থা দেখে। জনির মাথার একটা পাশ গুলির আঘাতে উড়ে গেছে, খুলির টুকরো মার্বেল পাথরের মেঝেতে পড়ে শব্দ তুলল। অথচ জনি এখনও হাসছে, মাথাটা পরিহাসের ভঙ্গিতে একপাশে কাত করা যেন হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছে, হ্যাঁ, তার সময় ফুরিয়ে এসেছে।

তার চোখ চকচক করে উঠল, হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিঁড়িতে, মাথাটা বাড়ি খেল মেঝেয়, যেন ট্রাকের পেছন থেকে পাকা তরমুজ রাস্তায় পড়ে ফেটে গেল।

প্রচণ্ড রাগে মুখ বিকৃত হয়ে গেল লুসিয়ানোর তার ১১৩ বছরের বিশ্বস্ত ভৃত্যের করুণ পরিণতি দেখে। জনির হলুদ মগজ গলগল করে ভাঙা খুলি থেকে বেরিয়ে পিচ্ছিল করে দিল মেঝে। *আমি ওর মত এমন বিশ্বস্ত লোক আর কোথায় পাব?* ভেতরে ভেতরে চিৎকার করছে লুসিয়ানো। সে কল্পনাও করতে পারেনি ওদের জন্য তার এমন ক্ষতি হয়ে যাবে। ওদেরকে নিয়ে মজা করতে চেয়েছিল লুসিয়ানো। এখন দেখছে খেলাটা দাঁড়িয়ে গেছে জীবন মৃত্যুর প্রশ্নে।

ওদের অথবা তার।

হিসিয়ে উঠল ভ্যাম্পায়ার, টকটকে লাল হয়ে উঠল চোখ। তার শরীরের ভেতরে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এই পোকা দুটোকে পিষে মারার তীব্র আকুলতা অনুভব করছে নিজের মধ্যে।

মোট দশ সেকেণ্ড সময় লাগল তার মাঝে খিদে আর রক্ত তৃষ্ণার প্রবল অনুভূতিটা ফিরে আসতে। তারপর বিকট চিৎকার দিয়ে সে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এবং মুখোমুখি হয়ে গেল দীপের ক্রুশের।

'ভাগ্, হারামজাদা!' ক্রুশটা সামনের দিকে বাগিয়ে ধরেছে দীপ।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ল লুসিয়ানো। তারপর তার মুখে ধীরে ধীরে এক টুকরো হাসি ফুটল। তাকাল সিঁড়ি গোড়ায়। দুমড়ে মুচড়ে ওখানে পড়ে আছে জুলিয়ান গনজালভেজ ওরফে জনি। হঠাৎ লুসিয়ানোর চোখ জ্বলে উঠল ভীষণভাবে।

'ওরা আসছে।'

বলেই ঘুরে দাঁড়াল, দ্রুত উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

দীপ এবং রেমো লুসিয়ানোর গমন পথের দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে আছে। 'কী বলে গেল লোকটা?' জিজ্ঞেস করল দীপ। 'ওরা আসছে মানে? কারা আসছে?'

জবাবটা এল সিঁড়ি গোড়া থেকে। দীপ এবং রেমো স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন মেঝেয় উঠে বসেছে জনি।

ঘুরল।

এগিয়ে আসতে লাগল সিঁড়ির দিকে।

মুখ তুলে চাইল জনি। মরা মানুষের চোখ। ঘোলাটে, স্থির চাউনি। তার ঠোঁটে এখনও সেই বোকা বোকা হাসিটি লেগে রয়েছে। কপালের মাঝখানে আধুলি সাইজের গর্ত, হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বাইছে জনি, প্রতিটি ঝাঁকুনিতে গর্তটা দিয়ে রক্তের সরু একটা ধারা বেরিয়ে জমা হচ্ছে ডান চোখে। সিঁড়ির রেলিং এক হাতে চেপে ধরে উঠে আসছে সে। অন্য হাতটা মুষ্টিবদ্ধ, শূন্যে একটা বৃত্ত আঁকল।

ওদেরকে হত্যা করার ইঙ্গিত দেখাল জনি।

রেমো ডি'সুজা শিউরে উঠলেন। আবার তুললেন রিভলবার। জনি নামের জিন্দালাশের বুকে তাক করলেন।

'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি এবং গুলি ছুঁড়লেন।

প্রথম বুলেটটি জনির কলজে ফুটো করে দিল, বাম দিকের বুক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটি তার ডান পাশের ফুসফুস উড়িয়ে দিল, শোল্ডার ব্লেডসহ। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বুলেট ধ্বংস করল তার বাম ফুসফুস, একটা কিডনি এবং প্লীহা...

কিন্তু এতগুলো গুলি খেয়েও ছিন্নভিন্ন শরীর নিয়ে

অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল পৈশাচিক মূর্তিটা।

ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন রেমো। এ কী করে সম্ভব? এতগুলো বুলেটের আঘাত সয়েও কি কোনও মানুষ বাঁচতে পারে! তীব্র আতঙ্কে জমে গেছেন তিনি, নড়াচড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন আর সে সুযোগটা গ্রহণ করল জনি নামের পিশাচটা, হাত বাড়িয়ে ধরল রেমো সাহেবের গলা, চাপ দিতে লাগল...

নড়ে উঠল দীপ, বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে পিশাচটার বুকে ঘ্যাচাং করে ঢুকিয়ে দিল সুচাল গোঁজ। গোঁজের চার ইঞ্চি তীক্ষ্ণ ফলা ওটার কলজে বিদীর্ণ করল।

পিশাচটার মুঠি আলগা হলো, এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করলেন রেমো, পিছিয়ে গেলেন। গলা দিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ বেরিয়ে এল। নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছেন।

পিশাচটাকে ঝেড়ে লাথি কষাল দীপ। চরকির মত ঘুরে গেল ওটা, উপুড় হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। পতনের চোটে গোঁজ পুরোটাই ঢুকে গেল বুকের মধ্যে।

জনি নামের পিশাচের শরীর পচতে শুরু করল।

মেঝেয় প্রথমে বুদ্বুদ উঠল, মাথাটা সামনে পেছনে ঝাঁকি খাচ্ছে, চাকলা চাকলা মাংস খসে পড়ছে গা থেকে, রক্ত, পুঁজ আর গলিত মাংসের গা ঘিনঘিনে একটা পুকুর তৈরি হচ্ছে।

নব্বুই সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে পিশাচটার গা থেকে সমস্ত মাংস খসে পড়ল। রইল শুধু কংকালটা।

'সিড়ির ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে আছে দীপ এবং ডি'সুজা, বিস্ফারিত দৃষ্টি মেঝের পচা-গলা মাংসে। তারপর সংবিত ফিরে পেল দীপ, রেমো ডি'সুজার কাঁধে হাত রাখল। 'চলুন।'

রেমো তাকালেন দীপের দিকে। বিমূঢ় ভাবটা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল চেহারা থেকে। 'ও মানুষ ছিল না...' কর্কশ,

ফিসফিসে শোনাল তাঁর কণ্ঠ।

দীপ অবিশ্বাসের চোখে দেখল রেমোকে, তারপর মৃদু হেসে সিঁড়িতে পা বাড়াল।

'না, ছিল না,' বলল ও। 'এখন চলুন।'

তখন ঘড়িতে বাজে পাঁচটা পাঁচ।

উনচল্লিশ

দীপ এবং রেমো ডি'সুজা দুই লাফে সিঁড়ির মাথায় উঠে এল, তারপর সতর্ক ভঙ্গিতে পা বাড়াল হলঘরে। ছায়াগুলো যেন জ্যান্ত, অন্ধকারের ওপর আঁধার নিয়ে দোল খাচ্ছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ওদের দিকে। নীরবে পা ফেলছে ওরা, শুধু নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

স্থির নীরবতার মাঝে কাঠ ফাটার মত একটা শব্দ দারুণ চমকে দিল ওদেরকে। তারপরই নারী কণ্ঠের আর্তনাদ।

'ওহ, মাই গড!' চেঁচাল দীপ। 'মারিয়া!'

ছুটল দীপ যেন খ্যাপা মোষ, পাশে রেমো ডি'সুজা। আইইই চিৎকার দিয়ে ক্যারাটে স্টাইলে প্রচণ্ড এক ফ্লাইং কিক বসাল দরজায়। ভেঙে গেল দরজা।

ঘর ফাঁকা। একটা জানালা (এ জানালা দিয়ে দীপের বেডরুম দেখা যায়) ভাঙা। এ জানালা তক্তা মেরে আটকে দেয়া হয়েছিল। তক্তাটা তুলে ফেলা হয়েছে, পড়ে আছে মেঝেয়। এ জানালা দিয়ে নিজের ঘরটিকে দীপের মনে হলো যোজন মাইল দূরে।

লুসিয়ানো এবং মারিয়া কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

রেমো জানালার সামনে গিয়ে উঁকি দিলেন বাইরে।

দীপ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে; হাতের ক্রুশ এবং গোঁজটা দুলিয়ে হুংকার ছাড়ল, **'ইউ বাস্টার্ড! ও কোথায়? তুই ওর কী করেছিস?'**

জবাবটা এল ওপরতলা থেকে, ওখানে কিছু একটা ধপ করে ফেলার শব্দ হলো– ভারী কিছু– প্রতিধ্বনিত হলো আওয়াজ। রেমো তাকালেন দীপের দিকে।

'ও চিলেকোঠায় গেছে,' বললেন তিনি। 'এসো।'

প্রথম দর্শনে চিলেকোঠাটি একদম সাদামাটা লাগল। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে প্রকাণ্ড চাঁদওয়ারি, দেয়াল ঘেঁষে স্তূপ করা অসংখ্য বাক্স এবং ঝুড়ি। মেঝে ইঁদুরের বিষ্ঠায় ভর্তি। ঘরে প্রাচীন, বাসি একটা গন্ধ।

আলখেল্লায় হাত ঢুকিয়ে ছোট এবং শক্তিশালী একটি ফ্ল্যাশলাইট বের করে আনলেন রেমো ডি'সুজা। জ্বালালেন। আলোর একটা ফালি চিরে দিল অন্ধকার। আলো পড়ে চকচক করে উঠল কতগুলো রোমশ শরীর, দুদ্দাড় ছুটল তারা আড়াল নিতে।

ইঁদুর।

চিলেকোঠা বোঝাই ইঁদুর। মোটাসোটা ইঁদুরগুলো কোথায় নেই? ঘরের কোণে, ঝুড়ির ওপরে, ভাঙা জানালার পাশের স্তূপে...

স্তূপ! 'না!' আর্তনাদ করে উঠল দীপ, দৌড় দিল চিলেকোঠার ঘরে। কিচকিচ শব্দে কিনারে গিয়ে লুকাল ইঁদুরের দল।

স্তূপটা মারিয়ার। তালগোল পাকিয়ে শুয়ে আছে বিছানার চাদরে, ওর গায়ে ভাঙা কাচের টুকরো। ইঁদুরগুলো ওর গায়ের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। মারিয়াকে দেখে মনে হলো মারা গেছে।

কিংবা বেঁচে থাকলেও হয়তো মৃত্যু অতি সন্নিকটে।

হিস্টিরিয়া রোগীর মত গোঙাতে গোঙাতে খালি হাতে মারিয়ার গায়ের ওপর থেকে ইঁদুর তাড়াতে লাগল দীপ। পালস পরীক্ষা করল, ডাকল ওর নাম ধরে।

এখনও বেঁচে আছে মারিয়া, ভাবছে দীপ, তবে আয়ু বোধহয় বেশিক্ষণ নেই। ভাঙা জানালায় একবার চোখ বুলিয়ে ফিরল রেমোর দিকে। 'জাহান্নামে যাক ব্যাটা। কোথায় ও?'

হাওয়া নিশানের মত ছাদের ওপর হাঁটাহাঁটি করছে লুসিয়ানো। চোখ বনবন করে ঘুরছে কোটরের মধ্যে। ঠোঁট জোড়া পেছন দিকে বেঁকে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত।

'জেগে ওঠো, মারিয়া! জাগো!' শিসের ধ্বনি বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। 'আমি আদেশ করছি! জাগো!'

নিচে, চিলেকোঠার ঘরে চেঁচিয়ে উঠলেন রেমো ডি'সুজা। 'দীপ, জলদি একবার এদিকে এসো।'

দীপ মারিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল নিজেকে, দ্রুত চলে এল রেমোর পাশে। লক্ষ করল না মারিয়ার চোখের পাতা কেঁপে উঠেছে, ঝট করে খুলে গেল এবার, লাল টকটকে মণি।

আমাকে তুমি কতটা ভালবাস এবারে প্রমাণ করো, মারিয়া।

নিঃশব্দে উঠে বসল মারিয়া।

ওদেরকে খুন করো। হত্যা করো দু'জনকেই।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রেমো ডি'সুজা। তাঁর সামনে প্রকাণ্ড, দামী একটি সিন্দুক। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চকচক করছে পালিশ করা কাঠ এবং পেতলের কারুকাজ। দীপ ডি'সুজার দিকে তাকাল। 'আপনার কি ধারণা ও এখানে ঘুমায়?'

সন্দেহের সুর রেমো ডি'সুজার কণ্ঠে। 'না দেখে বলা

মুশকিল। প্রস্তুত হও। দ্রুত সারতে হবে কাজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিন্দুকের ঢাকনা দু'হাতে ধরল দীপ। গোঁজটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলেন ডি'সুজা, ইশারা করলেন। এক ঝটকায় সিন্দুকের ঢাকনা তুলে ফেলল দীপ এবং ঝট করে গোঁজটা নিচে নামিয়ে আনলেন ডি'সুজা...

...আধডজন বেডশিটের মধ্যে পড়পড় করে ঢুকে গেল ওটা।

'ধ্যাত,' বিড়বিড় করলেন ডি'সুজা। তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইল দীপ...

...এবং দেখতে পেল লুসিয়ানোকে, জানালার বাইরে কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো, লম্বা নখের থাবা মারতে যাচ্ছে। 'আংকেল, আপনার পেছনে!' চিৎকার দিল দীপ।

চোখের পলকে ঘুরে গেলেন ডি'সুজা, ডাইভ দিলেন মেঝেতে। আর ঠিক তখন জানালার কাচ ভেঙে থাবাটা ঢুকে পড়ল ভেতরে। সহজাত প্রবৃত্তিতে পিছিয়ে এল দীপ।

এবং সোজা গিয়ে পড়ল মারিয়ার বাড়ানো হাতের মধ্যে।

'দীইইইপ,' ঘ্যাসঘেসে গলায় বলে উঠল মারিয়া, এমন বীভৎস স্বর, গায়ে কাঁটা দেয়। হাসল সে, বেরিয়ে এল সদ্যোজাত শ্বদন্ত। সাপের মত তার জিভ, মুখ থেকে লকলক করে বেরুচ্ছে আর ভেতরে ঢুকছে। শুকনো, কালো, ফোলা জিভ।

মারিয়া ক্ষুধার্ত। খুব খুব ক্ষুধার্ত।

'অক!' আঁতকে উঠল দীপ। চিৎ হয়ে পড়ে গেল পেছন দিকে, হাত থেকে গোঁজ খসে পড়ল, মারিয়া ওকে তখনও ধরে আছে। মারিয়া ওর গায়ের ওপর উঠে বসল, গলা হাতড়াচ্ছে। চোখ জোড়া জ্বলছে ফগল্যাম্পের মত, কিন্তু দেখছে না যেন কিছুই।

'দীইইইপ...'

মুখ তুলে চাইলেন রেমো ডি'সুজা, বিস্ফারিত চাউনি। লুসিয়ানো আশপাশে কোথাও নেই। তিনি চট করে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলেন গোঁজ, দাঁড়ালেন মারিয়ার পেছনে, এক ধাক্কায় গোঁজ ঢুকিয়ে দেবেন পিঠে।

দীপ চিৎকার দিল, 'আংকেল, না!' সদ্য ভ্যাম্পায়ারে রূপান্তরিত দুর্বল মারিয়া কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ঠোঁট দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল।

আর তখন নিচতলা থেকে ভেসে এল খলখল হাসির শব্দ।

ভীতিকর এবং বিদ্রূপাত্মক গলায় হাসছে কেউ।

কুত্তার বাচ্চা, দাঁতে দাঁত ঘষলেন রেমো ডি'সুজা। গোঁজের গোড়ার দিকটা দিয়ে দুম্ করে বাড়ি মারলেন মারিয়ার খুলিতে।

দীপের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল মারিয়া জ্ঞান হারিয়ে। ওকে গায়ের ওপর থেকে আস্তে ঠেলে সরিয়ে দিল দীপ। মারিয়ার গা থেকে বিশ্রী, পচা গন্ধ আসছে। নাক কুঁচকে গেল দীপের।

রেমো ওকে সিধে হতে সাহায্য করলেন। 'আমার জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ,' বলল দীপ।

'মাই প্লেজার,' মুচকি হাসলেন ডি'সুজা। 'এখন চলো ওই কুত্তার বাচ্চাকে খুঁজে বের করি। শুধু আমরা নই, ওর হাতের সময়ও ফুরিয়ে আসছে।' ঘুরলেন তিনি, পা বাড়ালেন সিঁড়িতে।

দীপ কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল। পাঁচটা পঞ্চাশ। 'ও কোথায় যেতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন রেমো ডি'সুজা। 'নিচতলা ছাড়া আর কোথায় যাবে?'

চল্লিশ

হলওয়েতে পা বাড়ালেন ডি'সুজা, থমকে দাঁড়ালেন চিলেকোঠার দরজার তালা পরীক্ষা করে দেখতে। তেমন শক্ত তালা নয়।

'ও বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকবে না,' বললেন তিনি। 'আর জ্ঞান ফিরে পাবার পরে আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।'

তেতো মুখ করে মাথা ঝাঁকাল দীপ, জিন্দালাশ মারিয়ার চেহারাটা মনে পড়তে শিউরে উঠল। কিন্তু তবু সে কী করে মারিয়ার বুকে গোঁজ ঢোকাবে? এ কাজটা কখনওই পারবে না দীপ। বরং লুসিয়ানোর বুক ফুটো করে দিতে পারবে।

অবশ্য যদি ভ্যাম্পায়ারটাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

ওরা নীরবে পাশাপাশি হাঁটছে। সিঁড়ির মাথা থেকে হাত দশেক দূরে চলে এসেছে, এমন সময় শব্দটা শুনতে পেল।

মৃদু একটা শব্দ।

'কীসের শব্দ ওটা?' থমক দাঁড়ালেন রেমো ডি'সুজা। দীপও ব্রেক কষল, শূন্য দৃষ্টি ডি'সুজার দিকে।

'কীসের শব্দ?'

আবার শোনা গেল শব্দটা, অত্যন্ত মৃদু। কান খাড়া না করে রাখলে শোনা যেত না। কাঠের শব্দ, পেতলের কজায় যেন ঘষা খেয়েছে কাঠ। খুলে গেল কিছু একটা। আবার বন্ধ হলো।

সামনের দরজা থেকে এসেছে শব্দটা।

'কুত্তার বাচ্চা!' গর্জে উঠল দীপ, ঝড়ের গতিতে পাশ কাটাল রেমো ডি'সুজাকে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। এককে বারে তিনটা ধাপ টপকাচ্ছে। ল্যাণ্ডিং থেকে ওটাকে এক ঝলক দেখতে পেল দীপ।

লম্বা, বাঁকানো নখের আঙুলগুলো দেখা গেল কপাটে, ক্লিক শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সিঁড়ি গোড়ায় পড়ে থাকা জনির পচা গলা মাংসের পিচ্ছিল স্তূপটা সাবধানে পার হতে দশ সেকেণ্ড ব্যয় হলো দীপের। আরও তিন সেকেণ্ড লাগল দরজা ভাঙতে। চোখে খুনের নেশা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

কিন্তু ততক্ষণে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'ধ্যাত!' চেঁচিয়ে উঠল দীপ। 'ধ্যাত ধ্যাত ধ্যাত ধ্যাত!'

সিঁড়ি মাথায়, অলিন্দে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেন রেমো ডি'সুজা। 'দীপ,' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'দরজা থেকে সরে এসো! ওটা কোনও ফাঁদ হতে পারে!'

কিন্তু সরল না দীপ। হুংকার ছাড়ল, 'লুসিয়ানো, সাহস থাকে তো সামনে এসে দাঁড়াও!'

ডি'সুজা আবার ডাকলেন, 'দীপ!'

দীপ হাতের ক্রুশটা উঁচিয়ে ধরে হাঁক ছাড়ল, 'লুসিয়ানো! পারলে এসো আমাকে হত্যা করো!'

'দীপ, চলে এসো!' চেঁচালেন ডি'সুজা।

'লুসিয়ানো একটা কাপুরুষ! লুসিয়ানো একটা ভীতুর ডিম! লুসিয়ানো নিজের ছায়াকেই ভয়–'

মাঝপথে থেমে গেল দীপ হঠাৎ লুসিয়ানোর বাড়ির সব ক'টা ঘড়ি একসঙ্গে বেজে উঠেছে শুনে।

ছ'টা বাজে।

দীপ তাকাল রেমো ডি'সুজার দিকে। মুখে হাসি। রেমো সাহেব আবার বলতে যাচ্ছিলেন, *দীপ, এক্ষুণি এখানে চলে এসো...*

...কিন্তু তিনি কথাটা বলার আগেই তাঁর পেছনের বড় কাচের জানালাটা বিকট শব্দে ভেঙে গেল, অসংখ্য কাচের টুকরো

ছড়িয়ে পড়ল গায়ের ওপর। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তাঁর হাত জোড়া উঠে গেল ওপরের দিকে, তিনি উবু হয়ে গেলেন।

'এবারে আর আপনার রক্ষা নেই,' হিসিয়ে উঠল ভ্যাম্পায়ার, রেমো সাহেবের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভয়ে আতঙ্কে রেমো ডি'সুজার চোয়াল ঝুলে পড়ল। বহু কষ্টে গলায় রা ফোটালেন, 'দীপ, যেখানে আছ সেখানেই থাকো। এক পা-ও নড়বে না।'

চোখ টিপল লুসিয়ানো। 'তো,' সুর করে বলল সে, 'লড়াইটা তা হলে শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যে হচ্ছে, না? বেশ বেশ। এতে আমার কোনও আপত্তি নেই,' সে কদম বাড়াল।

রেমো ডি'সুজা হাতে ধরা ক্রুশটা বাগিয়ে ধরলেন সামনে। হো হো করে হাসল লুসিয়ানো। 'আপনাকে আগেও বলেছি ওটার জন্য মনে জোর বিশ্বাস থাকতে হবে, হতভাগা বুড়ো।'

কাছিয়ে এল লুসিয়ানো। একপা একপা করে এগোচ্ছে। ঠোঁটে ভয়াল হাসি। দিশেহারা বোধ করলেন রেমো।

লুসিয়ানো বলল, 'আপনার বোধহয় জানা নেই, মি. ডি'সুজা, আমরা তিনটে কারণে হত্যা করি: খাবার, সন্তান জন্মদান এবং মজা করার জন্য। আর শেষের মৃত্যুটি হয় সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক।'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে ভ্যাম্পায়ার। তার কথাগুলো যেন সম্মোহন করছে রেমো ডি'সুজাকে। তিনি ওর মুখ আর দাঁত ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

তারপর ওটা চোখে পড়ল তাঁর। আর দৃশ্যটা তাঁর মনে সাহস এনে দিল। তিনি কামনা করলেন লুসিয়ানোও যেন ওটা দেখতে পায়।

কপালে ভাঁজ পড়ল লুসিয়ানোর। ক'সেকেণ্ড আগেও

বুড়োকে ভয়ে আধমরা দেখাচ্ছিল। অথচ এখন তাঁর চেহারা থেকে ভীতি অদৃশ্য। শুধু তাই নয়, বুড়ো হাসছেনও!

রেমো ডি'সুজার মুখ শিশুর সরল হাসিতে উদ্ভাসিত। ক্রুশটা হাতে ভারী ঠেকল। তিনি মুঠি সামান্য আলগা করলেন। তারপর কেশে পরিষ্কার করে নিলেন গলা।

'মি. লুসিয়ানো,' বললেন তিনি। 'আজ রাতে বেশ কিছু জ্ঞানার্জন হলো আমার। প্রথমে জানতে পারলাম আপনি আসলে একটা গণ্ডমূর্খ ছাড়া কিছু নন; এবং দ্বিতীয়ত,' চোখ টিপলেন তিনি, 'একজন বুড়োর প্রতিও ভাগ্য কখনও কখনও সদয় হয়ে ওঠে। পেছন ফিরে দেখুন।'

ঘুরল লুসিয়ানো। প্রচণ্ড ভয় নিয়ে দেখল পড়শীর বাড়ির ছাদে উঁকি দিচ্ছে ভোরের প্রথম আলোর গোলাপী আভা। গলা দিয়ে কিচকিচ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার, পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রেমো ডি'সুজার দিকে। ডি'সুজা ক্রুশটা উঁচু করে ধরলেন, আলোর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রশ্মি ক্রুশের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে গরম লোহার সুইয়ের মত ঢুকে গেল লুসিয়ানোর একটা চোখে।

'নাআআআআ...' হিসিয়ে উঠল সে, তারপর দৌড় দিল। সিড়ি বেয়ে ছুটে নামছে, দেখল সিঁড়ির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দীপ, হাতে ক্রুশ নামের আরেকটি দুর্গম বাধা।

'ওকে পেয়েছি!' চেঁচাল দীপ।

এমন সময় কান ফাটানো, বিকট একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা।

চিলেকোঠার ঘর থেকে এসেছে চিৎকারটা।

'মারিয়া...' বলল দীপ, এক সেকেণ্ডের জন্য মনোযোগ সরে গেল ভ্যাম্পায়ারের ওপর থেকে।

আর ওই এক সেকেণ্ডকেই কাজে লাগাল লুসিয়ানো।

লাফ দিল সে দীপকে লক্ষ্য করে।

একচল্লিশ

এ জীবনে বহু হরর ছবি দেখেছে দীপ। সেসব ছবিতে রক্তহিম করা অনেক দৃশ্য ছিল। তবে এ মুহূর্তে সে যা দেখছে তার সঙ্গে কোনও হরর ছবির তুলনা চলে না।

দীপ দেখছে ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে লুসিয়ানো। কিন্তু ওটা কী ধেয়ে আসছে তার দিকে? ডাইভ দিয়েছে লুসিয়ানো, এখনও ভেসে আছে শূন্যে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তার শরীরে শুরু হয়ে গেছে ভাংচুর। তার হাত জোড়া গুটিয়ে গিয়ে চোখের পলকে পরিণত হলো মস্ত দুটো কালো ডানায়, বামন আকার ধারণ করল পা, রূপ নিল বক্র উপাঙ্গে; গোটা শরীর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। এবং তার মুখ...

...সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আকার নিল তার চেহারা। মুখটা বারবার হাঁ করছে এবং বন্ধ হচ্ছে, সে সঙ্গে কুৎসিত কিচকিচ একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে।

একদম শেষ মুহূর্তে ঝুপ করে বসে পড়ল দীপ আর বাদুড়ের মত দেখতে কিম্ভূত প্রাণীটা উড়ে এসে থাবা চালাল ওর চাঁদিতে। তুলে নিল রক্তাক্ত চামড়া। যন্ত্রণায় চিৎকার দিল দীপ, চেপে ধরল মাথা। কুৎসিত বাদুড় উড়তে উড়তে সিলিং-এর দিকে চলে গেল, তারপর আবার পাক খেয়ে নামতে লাগল...

...এবারে ওটা রেমো ডি'সুজার উপর হামলা চালাল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘাড়ের ওপর। নখ, ছোট ছোট থাবা এবং প্রকাণ্ড ডানা ব্যবহার করল সে হামলায়।

বাদুড়ের শক্তিশালী ডানার ধাক্কায় ভারসাম্য হারিয়ে সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নিচে পড়ে গেলেন ডি'সুজা। নিজেকে ছাড়িয়ে

নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, লড়াই করছেন ওটার সঙ্গে। বাদুড়টা তাঁকে থাবা ও দাঁত চালিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চাইছে। দীপ ছুটে গেল ওদিকে, বাদুড়ের আট ফুট লম্বা একটা ডানা চেপে ধরল...

...মুখ হাঁ করে ওর হাতে কামড় বসাল পিশাচ-বাদুড়, এমনভাবে ঝাঁকাতে লাগল যেন হুলো বেড়াল ইঁদুর মুখে নিয়ে ঝাঁকাচ্ছে। তীক্ষ্ণধার দাঁতের কামড়ে দরদর ধারায় রক্ত বেরিয়ে এল হাত থেকে। দীপ আর্তনাদ করে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল, বাদুড়টা মনোযোগ ফেরাল রেমো সাহেবের দিকে, মাথাটা ঝট করে পিছিয়ে নিয়ে খনখনে গলায় হেসে উঠল।

বাদুড় নয় যেন হাসছে কোনও পিশাচ, ওটার ক্ষুদ্র ফুসফুস দিয়ে অমন ভয়ঙ্কর হাসি বেরিয়ে আসছে না দেখলে বিশ্বাস করতেন না রেমো। ওটার চোখ চকচক করছে, রক্ত তৃষ্ণায় অস্থির...

...হাসছে পিশাচ-বাদুড়, সম্পূর্ণ অসচেতন যে ভোরের সূর্যের নরম, উজ্জ্বল একটি আলোক রেখা ইঞ্চি ইঞ্চি করে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে...

...সূর্য নামের মৃত্যু...

দীপ মুখ তুলে তাকাল। ব্যথায় বিকৃত মুখ। দেখল হাল ছেড়ে দিয়েছেন রেমো ডি'সুজা, বাদুড়টাকে আর বাধা দেয়ার চেষ্টা করছেন না। পিশাচ-বাদুড়ের মাথাটা পেছন দিকে হেলে রয়েছে, পৈশাচিক উল্লাসে হাসছে...

...দিনের প্রথম আলো আঘাত হানল ওটার মাথায়।

ওটা তীব্র যন্ত্রণায় গগনবিদারী চিৎকার দিল। ঝট করে একপাশে সরিয়ে নিল মাথা। ছেড়ে দিল রেমো ডি'সুজাকে। একদিকে কাত হয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটল হলওয়ে ধরে বেসমেন্টের দিকে। চলার পথে বাড়ি খেল আসবাবের গায়ে।

কিন্তু একটুও শ্লথ হলো না গতি। বাদুড়টা পেছনে রেখে গেল মাংসপোড়া, কটুগন্ধের ঘন ধোঁয়ার রেখা।

দীপ হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল রেমো ডি'সুজার কাছে। উনি শুয়ে শুয়ে বেদম কাশছেন। 'আংকেল, আপনি ঠিক আছেন তো?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল ও।

মাথা দোলালেন ডি'সুজা। তাঁর শরীরে আঁচড় ও কামড়ের দাগ তবে অলৌকিকভাবে মারাত্মক কোনও আঘাত পাননি।

ওরা চারপাশে চোখ বুলাল। আকস্মিক সুনসান নীরবতা বড্ড অস্বাভাবিক ঠেকছে। ডি'সুজা গুঙিয়ে উঠলেন, 'দীপ, আমাকে ধরে তোলো। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

আহত এবং বিধ্বস্ত দু'জন পা বাড়াল সেলারের দরজায়। জানে না সিঁড়ির অন্ধকার কোণ থেকে একজন এগিয়ে আসছে।

ভয়ঙ্কর কেউ একজন।

এবং প্রচণ্ড খিদেয় সে অস্থির।

বিয়াল্লিশ

বেসমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের গতিতে নেমে এল ওরা। এখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু ডি'সুজা সাহেবের ফ্ল্যাশলাইটের আলোই ভরসা। বাসি, ছাতা ধরা গন্ধের আসবাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সবখানে, ভারী ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। আসবাবের পরে চারটে বড় আকারের জানালা। প্রতিটি জানালা কালো পর্দায় মোড়ানো যাতে বাইরের এক চিলতে আলোও ঘরে ঢোকার সুযোগ না পায়।

আর ইঁদুর! শ'য়ে শ'য়ে ইঁদুর। অ্যান্টিকগুলোর ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওগুলো, বুক শেলফের আড়াল থেকে সুচালো,

গোঁফঅলা মুখ বের করে উঁকি দিচ্ছিল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চকচক করে উঠল তাদের রোমশ দেহ।

তবে বেসমেন্টে কোনও কফিন চোখে পড়ল না। এদিক ওদিক আলো ফেলেও কোনও কফিনের সন্ধান পেলেন না রেমো ডি'সুজা। কিংবা লুসিয়ানোরও হদিশ মিলল না।

অন্ধকারে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে দীপ, খুলিতে চেপে রেখেছে রুমাল। ক্ষতটা তেমন গভীর না হলেও রক্ত গড়াচ্ছে। গালে ইতিমধ্যে ছোট ছোট ফোঁটায় শুকিয়ে গেছে রক্ত।

ওরা দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর কোনও বাক্য বিনিময় না করে আসবাবের ওপর থেকে ধূলি ধূসরিত কাপড়গুলো টেনে সরিয়ে ফেলতে লাগল। অনেকগুলো আয়না চোখে পড়ল (নিঃসন্দেহে ওপরতলার আসবাবের গা থেকে এগুলো খুলে আনা হয়েছে)। একটি চেস্ট অভ ড্রয়ার, ধাতব বর্ম, অস্ত্র ইত্যাদি রাখার একটি আর্মোয়ারসহ নিলামের দোকান থেকে কিনে আনা নানান তৈজসপত্র।

তবে কোনও কফিন নেই।

রেমো ডি'সুজা তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করছিলেন আর্মোয়ারটি। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলেন, আর্মোয়ারের নিচে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন।

তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

'দীপ, এদিকে এসো। এটা সরাতে হবে।' ওরা দু'জনে মিলে আর্মোয়ার ধরে ঠেলতে লাগল...

...আর্মোয়ারের নিচে থেকে বানের জলের মত বেরিয়ে এল শত শত ইঁদুর। কুতকুতে চোখ, রোমশ গা। তবে ইঁদুর নয়, দীপ এবং রেমো বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে আর্মোয়ারের নিচ থেকে আত্মপ্রকাশ করা একটি চোরকুঠুরির দিকে।

চোরকুঠুরি আয়তনে তেমন বড় নয়, দেয়ালগুলো শীতল

এবং ছাতা ধরা। এখানে আরেকটি জানালা তোলা হয়েছে এবং কাজটি করা হয়েছে অতি সম্প্রতি, দেখেই বোঝা যায়।

ওদের চারপাশে শ'য়ে শ'য়ে গিজগিজ করছে ইঁদুর। আগন্তুকদের অনুপ্রবেশে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় কিচকিচ আওয়াজে প্রকাশ করছে বিরক্তি। চোরকুঠুরিতে দুটি কফিন: একটি কারুকাজ করা, ভারী, টেকসই কাঠ দিয়ে তৈরি, চারপাশটা পেতল দিয়ে মোড়া; অপরটি অতি সাধারণ চেহারার, বড় প্যাকিং বাক্সের চেয়ে সামান্য দীর্ঘ আয়তনে। এ কফিনে উঁকি দিলেন রেমো। ভেতরটা মাটি ভর্তি। কফিনের ভেতরে কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। ওটা তুলে আনলেন তিনি। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন। একটা জ্যাকেট। লাল রঙের।

মারিয়ার জ্যাকেট।

জ্যাকেটটি দেখে গুঙিয়ে উঠল দীপ। গত কয়েক মিনিটের উন্মাদনায় মারিয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল ও। ডি'সুজার দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকাল, ফিসফিসিয়ে মারিয়ার নাম ধরে ডাকল।

ওর ডাকে সাড়া দিতেই যেন ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলল সিড়ি। দীপ অন্ধকারে, দরজার দিকে পা বাড়াল। ডি'সুজা ওকে যেতে মানা করার জন্য হাঁক ছাড়লেন।

কিন্তু দীপ তার আগেই মিলিয়ে গেছে আঁধারে। ডি'সুজা সাহেব ছুটে গেলেন কফিনে, কাঁপা হাতে ঢাকনা চেপে ধরলেন। ওপরের দিকে টান মারলেন। কিন্তু খুলল না ঢাকনা। তিনি কফিনের তালা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অন্ধকারে, সতর্ক ভঙ্গিতে এগোচ্ছে দীপ। ভয়ে ঢিবঢিব করছে বুক কী জানি কী দেখতে হয় ভেবে। আঁধারে ক্রমে চোখ সয়ে এল। যন্ত্রণাটা আর সইতে পারছে না দীপ। ওর সাইকেল গেছে, বন্ধুকে হারিয়েছে, ওর প্রেমিকাকে হারাতে চলেছে...সমস্ত

জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

এ সত্যি অসহ্য। এ...

ওটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওর নাম ধরে ডাকছে।

দীইইইইপ...

সাথে সাথে শরীর কুঁকড়ে গেল দীপের। এক লাফে পিছিয়ে এল। দেখে মনে হলো ওর আচরণে কষ্ট পেয়েছে মারিয়া। সে গলার কাছে হাত নিয়ে বেড়ালের মত গরগর করে বলল, 'ভয় পেয়ো না, দীপ। এই তো আমি, মারিয়া...' ওর গলার স্বর ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল।

ধীর পায়ে এগোল মারিয়া। তার চোখ জোড়া লাল টকটকে এবং ভয়ঙ্কর। তবু ও চোখের মাঝে নরম কী যেন আছে, প্রত্যাশা। ও *আমাকে চাইছে,* ভাবল দীপ।

মারিয়া যেন বুঝতে পেরেছে দীপের মনের কথা। হাসল। কথা বলতে বলতে জ্যাকেট খুলে ফেলে শার্টের বোতাম খুলল। তার দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল দীপ। নিচে কিছু পরা নেই মারিয়ার। সে হাত বুলাল আদুল পেটে, ওখান থেকে হাত উঠে এল বুকে। মদির আহ্বান জানাচ্ছে, মদালসা, কামুকী অঙ্গভঙ্গি করছে মারিয়া।

'কী হলো দীপ? তুমি কি আর আমাকে চাও না?'

চায় দীপ।

ইচ্ছে করছে মারিয়ার উষ্ণ বুকে মাখন হয়ে গলে যায়, ওর কামনার আগুনে পুড়িয়ে দেয় নিজেকে। মারিয়ার ভেতরে বিরাট একটা পরিবর্তন লক্ষ করছে দীপ। ও যেন টসটসে পাকা ফল, ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে লোভনীয় ভঙ্গিতে ঝুলছে।

মারিয়া দীপের একটা হাত ধরে মসৃণ পেটে রাখল, কামোত্তেজিত ভঙ্গিতে নিতম্ব দোলাচ্ছে। গুঙিয়ে উঠল দীপ, বাঁধা পড়ল মারিয়ার বাহুডোরে, ওর শরীরে নিজের শরীর দিয়ে

চাপ দিল। এখন অন্য কিছু ভাবতে চায় না দীপ, *দুনিয়ায় এ মুহূর্তে শুধু আমি আর মারিয়া ছাড়া অন্য কেউ বা অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই...*

চোখ মেলল দীপ, তাকাল ভালোবাসার মানুষটির দিকে।

'ওহ, দীপ,' শ্বাস টানল মারিয়া। 'আই লাভ ইউউউউ..'

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল দীপের, ক্রমে আবছা হয়ে যাচ্ছে। তবে হঠাৎ আয়নায় চোখ চলে গেল ওর।

আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে দীপ। কিন্তু দেখছে বাতাসকে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার সামনে কেউ নেই।

বরফ শীতল এক বালতি জল যেন কেউ ঢেলে দিল ওর গায়ে। একটা ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল দীপ। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল মারিয়াকে, সামনে বাগিয়ে ধরল ক্রুশ। জ্বলন্ত কয়লার ছ্যাঁকা খেল মারিয়া, হিসিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল, দু'হাতে ঢাকল মুখ।

'দোষ আমার নয়, দীপ। তুমি কথা দিয়েছিলে ওর কাছ থেকে আমাকে রক্ষা করবে। তুমি কথা দিয়েছিলে...'

কাঁদতে লাগল মারিয়া। অনুশোচনায় ভরে গেল দীপের মন।

'আমি দুঃখিত, মারিয়া,' ফিসফিস করল সে। নামিয়ে নিল ক্রুশ।

ঘূর্ণির গতিতে ঘুরল মারিয়া, বেরিয়ে পড়েছে দাঁত, প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল সে দীপের হাতে। অন্ধকারে বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে ঘরের কোণে রওনা হয়ে গেল ক্রুশ। দীপ বুঝতেই পারল না কীসে তাকে আঘাত করেছে।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত দীপের দিকে এগিয়ে এল মারিয়া। বেরিয়ে পড়েছে শ্বদন্ত। জ্বলজ্বল করছে লাল চোখ।

'আমি জানি,' হাসল মারিয়া। 'কিন্তু এখন আর আফসোস করে লাভ নেই।'

তেতাল্লিশ

শব্দটা শুনতে পেলেন রেমো ডি'সুজা, অনুমান করলেন কী ঘটছে। প্রার্থনা করলেন আর ক'টা মিনিট যেন টিকে থাকতে পারে দীপ, এ ফাঁকে কফিনটা খুলে ফেলবেন তিনি। কয়েক হাত দূরে, মারিয়ার কফিনের দিকে তাকালেন তিনি। এগিয়ে গেলেন ওটার দিকে। হতাশ ভঙ্গিতে লাথি কষালেন। দড়াম করে ওটা মেঝেতে পড়ল, মাটি ছড়িয়ে গেল চারপাশে।

অন্ধকারটাকে ফালাফালা করে চিরে দিল একটা চিৎকার, একটা জন্তু ভয়ে আর রাগে আর্তনাদ করছে।

ভালো, মনে মনে বললেন তিনি।

লুসিয়ানোর কফিনের তালা নিয়ে এতক্ষণ কসরত করছিলেন রেমো। এবারে খুট করে খুলে গেল তালা। ঝট করে ঢাকনা খুললেন তিনি, হাতে প্রস্তুত গোঁজ।

কফিনে শুয়ে আছে লুসিয়ানো, নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, নড়াচড়াও করছে না। তার মুখের বাঁ পাশটা সম্পূর্ণ কুঁচকে গেছে, মাথার চুল পোড়া, রক্ষা পায়নি চোখের পাতাও। কুৎসিত, কদাকার একটা চেহারা। রেমো হাতের গোঁজটা সজোরে নামিয়ে আনলেন নিচের দিকে...

...বিদ্যুৎ খেলে গেল ভ্যাম্পায়ারের শরীরে, সাপের মত ছোবল দিল তার লম্বা একটা হাত, চেপে ধরল বৃদ্ধের গলা। তার একটা চোখ সূর্যের আলো পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে, অপর ভালো চোখটা দিয়ে তাকিয়ে রইল সুজার দিকে। চাউনিতে

প্রবল ঘৃণা। ভ্যাম্পায়ার ঝটিতি উঠে বসেছে কফিনে তাই মিস হলো টার্গেট। সুচালো গোঁজ ঢুকে গেল ওটার কাঁধে। ভ্যাম্পায়ার হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে নিয়েছে রেমো ডি'সুজাকে, পরক্ষণে ছুঁড়ে ফেলে দিল...

জ্বলন্ত খাঁচায় পোরা বেড়ালের মত চিৎকার দিয়ে দীপের গায়ে লাফিয়ে পড়ল মারিয়া। পিছু হঠতে গিয়ে একটা আয়নায় পা বেঁধে গেল দীপের, হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে। ঝনঝন শব্দে ভাঙল আয়না, চারদিকে ছিটকে পড়ল ভাঙা কাচের টুকরো। ভীত দীপ ভাঙা কাচ পরোয়া না করে পিছু হঠতে লাগল, কাচে লেগে কেটে যেতে লাগল তার শরীর...

রেমো ডি'সুজা ছিটকে গিয়ে পড়লেন মারিয়ার কফিনের ওপর। সিধে হলো লুসিয়ানো, যেন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারের দেবতা, অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেয়ার জন্য প্রস্তুত। কাঁধে বিঁধে থাকা গোঁজটা একটানে ছুটিয়ে নিল সে, ডগা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, ওটাকে ছুঁড়ে ফেলল।

দেয়ালের দিকে সরে গেলেন রেমো, কী করা যায় দ্রুত চিন্তা করছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বিকট মুখভঙ্গি করল লুসিয়ানো।

'যথেষ্ট হয়েছে,' থুতু ছুঁড়ল ভ্যাম্পায়ার। 'এবারে আর তোমার রক্ষা নেই, বুড়ো।' রেমোর সামনে এসে দাঁড়াল, ঝুঁকল তাঁকে টেনে তোলার জন্য...

...দীপের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মারিয়া, মেঝেয় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখে লোভাতুর হয়ে উঠল চোখ। দীপের শরীরের রক্ত। জিভ বের করে ঠোঁট চাটল সে, মুখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল লালা।

দীপ পিছু হঠতে হঠতে দেয়ালে ঠেকল পিঠ। দু'দিকে মেলে দিল হাত, যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। মারিয়া 'হাউ' করে ওর পায়ের গোড়ালি খামচে ধরল, মুখ দিয়ে কুৎসিত শব্দ করছে।

দীপের বাম হাত নরম কিছুতে ঠেকল।

নরম এবং মোটা।

ওটা জানালা ঢেকে রাখা কালো পর্দা।

লুসিয়ানো রেমো সাহেবের কোটের কলারের ভাঁজ করা অংশ চেপে ধরল। রেমো পাগলের মত হাত বাড়িয়ে কোনও অস্ত্র খুঁজছেন, সে সঙ্গে প্রার্থনা করে চলেছেন। ...এবং পেয়ে গেলেন ঈপ্সিত জিনিস।

লুসিয়ানো এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নিল রেমো ডি'সুজাকে, প্রকাণ্ড হাঁ করল মুখ, টেনে নিজের দিকে নিয়ে এল...

...এবং রেমো ডি'সুজা, গ্রেট ভ্যাম্পায়ার কিলার, মেঝেয় পড়ে পাওয়া চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা, রুপোর চৌকোনা পাতটি আমূল ঢুকিয়ে দিলেন লুসিয়ানোর বুকে।

মাঝপথে মুখটা হাঁ হয়েই থাকল ভ্যাম্পায়ারের, তার খোলা চোখে ফুটল বিস্ময় এবং যন্ত্রণা। জোরে আরেকটা মোচড় দিলেন রেমো, তীক্ষ্ণধার পাতটা এবারে পুরোপুরি সেঁধিয়ে গেল ওটার বুকে। আড়চোখে দেখলেন ঘরের অপর প্রান্তে কী ঘটছে।

দীপ লাথি মারল মারিয়ার মুখে, একই সঙ্গে ঘুষিও দিল। মারিয়া ছিটকে গেল এবং দীপ পর্দা ধরে মারল টান...

বিশ্রী ফড়ফড় শব্দে ছিঁড়ে এল কালো পর্দা, জানালা দিয়ে আলোর সরু একটা রেখা ঢুকে পড়ল অন্ধকার ঘরে।

সূর্য রশ্মি সরাসরি আঘাত হানল লুসিয়ানোর পিঠে।

যেন একটা মালগাড়ির ধাক্কা খেয়েছে ভ্যাম্পায়ার, ছিটকে

গেল পাথুরে দেয়ালে, ওখানে যেন গেঁথে গেল সে, মাটি থেকে এক ফুট ওপরে উঠে গেছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে পিঠ থেকে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে একটা পোকা যেন মোচড় খাচ্ছে, তার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুতীব্র আর্তনাদ।

'না আ আ আ আ আ!!!'

কর্কশ গলায় চিৎকার দিল মারিয়াও, আতঙ্ক নিয়ে সামনের দৃশ্যটা দেখছে, তার চোখের মণি উল্টে যাচ্ছে ভয়ে। দীপ একটা গড়ান দিয়ে চলে এল মারিয়ার পেছনে, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল আরেকটা পর্দা, একটানে দেয়াল থেকে ছুটিয়ে নিল পুরোটা। পর্দা দিয়ে ঢেকে দিল মারিয়াকে যাতে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা ওকে দেখতে না হয়। পর্দার ভেতরে গুটিসুটি মেরে বসে রইল মারিয়া, ওর গোঙানির আওয়াজ আবছা শোনা গেল।

আলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝের হাজার হাজার ভাঙা কাচের টুকরোতে, আলো এবং রঙের বর্ণালী ছটা তৈরি করে মাকড়সার জালের মত প্রতিফলিত হলো চতুর্দিকে।

'এবারে পেয়েছি তোকে, হারামজাদা!' চিৎকার দিল দীপ, বিজয় উল্লাস নিয়ে তাকিয়ে আছে লুসিয়ানোর দিকে।

ভ্যাম্পায়ার ওর দিকে শেষবারের মত ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল। সে শুধু নিজের মৃত্যু দেখতে পেল।

আর কিছু নয়।

তারপর দীপ এবং রেমো ডি'সুজার চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল লুসিয়ানো।

মশালের মত জ্বলছে লুসিয়ানো দ্য লুসিফার। হলদে-লাল আগুনের মধ্যে সবুজ একটা আভা দেখা গেল। একটা সময় মনে হলো শরীরটা ফেটে যাবে লুসিয়ানোর। ফুলে উঠল ঊর্ধ্বাঙ্গ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো প্রসারিত হলো, আড়ষ্ট হলো তীব্র

যন্ত্রণায়।

তারপর ওর শরীরের প্রতিটি লোমকূপ গ্রাস করে নিল আগুন, লকলকে জিভ বের করছে অগ্নিশিখা, বেসমেন্টের মেঝের অসংখ্য কাচে প্রতিফলিত হলো।

দেখতে দেখতে গলে গেল লুসিয়ানো, পুড়ে কয়লা হলো, তারপর পরিণত হলো ছাইয়ে। পুরো ঘটনাটা ঘটতে এক মিনিট সময়ও লাগল না।

দীপ এবং রেমো ঘরের অপরপ্রান্তে শুয়ে হাঁপাচ্ছে এবং ঘামছে। অবিশ্বাস দু'জনের চোখে। তারপর দু'জনে ফিরল কালো পর্দার বাণ্ডিলটার দিকে। ওদিকে এগিয়ে গেল দীপ। পর্দার নিচে যে জিনিসটা আছে তার দিকে তাকাতে ভয় লাগছে।

তবু সাহস করে ধীরে ধীরে পর্দা তুলল দীপ। রেমো ডি'সুজা ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। দীপ তাকাল রেমো সাহেবের দিকে। চেহারা শুকনো।

'আংকেল,' বলল সে। 'একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন।'

উপসংহার

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। মারিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। উপযুক্ত সেবাশুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে উঠল সে। ভ্যাম্পায়ার তার রক্ত চুষে খেলেও শেষ পর্যন্ত এ মায়ার জাল থেকে রক্ষা পেয়েছে মারিয়া। লুসিয়ানোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্তি পেয়েছে সম্মোহিত অবস্থা থেকে, তার ওপর থেকে কেটে গেছে শয়তানের সমস্ত প্রভাব।

ওই ভয়ঙ্কর ঘটনা এমন ভয়ানক ছাপ ফেলেছিল দীপের

জীবনে, অনেক দিন সে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে গেছে। তবে আস্তে আস্তে সে-ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল।

মি. রেমো ডি'সুজা যোগ দিয়েছেন মাছরাঙা টিভি চ্যানেলে, একটি রিয়েলিটি শো-তে। শো-র নাম *মধ্যরাতের ট্রেন*। এটির তিনি উপস্থাপক। এ শো-তে সেলিব্রিটি এবং সাধারণ মানুষরা নিজেদের জীবনের নানান ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে। শো-টি বেশ দ্রুতই জমে গেল। তবে এ শো-তে দীপ কিংবা মারিয়াকে তিনি কখনও আমন্ত্রণ জানালেন না। কারণ ভ্যাম্পায়ার নিয়ে ওরা যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তা তিনি, ওরা দু'জন এবং আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। ভ্যাম্পায়ার নিয়ে এ অবিশ্বাস্য গল্প কেউ বিশ্বাস করবে কিনা তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ ওদের। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি। কারণ আমি ভূত-প্রেত-ভ্যাম্পায়ারের গল্প লিখি এগুলো বিশ্বাস করি বলেই। দীপ এবং মারিয়া আমাকে যখন গল্পটি বলছিল, বারবার আতঙ্কে শিউরে উঠছিল ওরা। আমি যখন বললাম ওদের এ কাহিনি নিয়ে আমি *মধ্যরাতের আতঙ্ক* নামে সেবায় বই লিখব, ওরা দু'জনেই আমাকে মানা করেছিল। বলেছিল কেউ নাকি এ গল্প বিশ্বাস করবে না। আমার গল্প আমি বললাম। আপনাদের বিশ্বাস না হলে নিজেরাই চলে যেতে পারেন অকুস্থলে। বরিশাল থেকে মাত্র ২৮ মাইল দূরে পাদ্রিশিবপুরে, ভুতুড়ে সেই বাড়িটি এখনও আছে ওখানে...

***